লুকানো রতন

সংকলন ও সম্পাদনা
ড. মীরাতুন নাহার

সুরাহা-সম্প্রীতি
৬৪জি লিন্টন স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৪

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কফি হাউস (তিনতলা)
কলকাতা ৭০০০৭৩

দর্পণে মুক্তমন
২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে
দি প্রিন্টার্স
কলকাতা ৭০০০১৩

বক্তৃতা-সূচী

ভূমিকা

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে 'সুরাহা সম্প্রীতি' কর্তৃক গত কয়েক বছরে আয়োজিত এতগুলি বক্তৃতার সংকলনগ্রন্থের ভূমিকা লিখতে অনুরুদ্ধ হওয়াকে আমি সৌভাগ্য বলেই মনে করছি। দুটি আন্দোলন ঃ নারীর উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করা, আজকের সমাজে এ-দুটি যথার্থভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এ-দুটিরই শুরু করেন রোকেয়া প্রায় একশো বছর আগে।

নিজের জীবনে রোকেয়া পেয়েছিলেন অনেক, আবার পাননিও অনেক কিছু। প্রাচুর্য, শিক্ষালাভের সুযোগ, ইচ্ছামত কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ — এসব তখনকার দিনে দুর্লভ ছিল, অথচ রোকেয়া এ-সবই যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছিলেন। তিনি এ সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি ধনী শৌখিন সামাজিক নারীর মত সাজসজ্জা, সামাজিক আমন্ত্রণসভা, পার্টি, উৎসব, ফূর্তি ইত্যাদিতে সময় কাটাতে পারতেন; তাঁর সমকালীন বহু ধনী গৃহিণীই তা-ই করতেন। কিন্তু রোকেয়ার অন্তরে যে অনির্বাণ দীপশিখাটি জ্বলত, তা ছিল জ্ঞানান্বেষণের এবং জ্ঞানবিতরণের। তাই ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে গৌণ করে তিনি বাল্যে, কৈশোরে কিছু বাধা অতিক্রম করেও প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন; যৌবনে স্বামীর পূর্ণ সাহচর্যে নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করে চিত্তের বিকাশ ঘটান। তাঁর নিজের অন্তরলোক ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

এই সময়েই তিনি অবহিত হন যে, মুসলিম সমাজের সাধারণ নারী জ্ঞানের জগতের সীমানার কতটা বাইরে, শুধুমাত্র ভোগের জীবন যাপন করেন সে বিষয়ে। এর প্রতিকারের জন্য তিনি দুটি অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন — প্রথমত নিজের সমাজে কন্যাদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিকিরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাঁর প্রয়াত স্বামীর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপন করেন। স্কুলটি আজও কলকাতা শহরের উন্নত মানের স্কুলগুলির মধ্যে একটি। ছাত্রীসংখ্যা প্রথমে নগণ্য ছিল, কিন্তু রোকেয়ার আন্তরিক সদিচ্ছা ও নিরন্তর অক্লান্ত পরিশ্রমে ধীরে ধীরে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে বাড়তে এটি ক্রমে একটি

প্রতিষ্ঠাপন্ন স্কুলে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর স্কুলের জন্য তিনি শুধু নিজেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেননি, মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বোধ সৃষ্টি করেন। কিন্তু শুধুমাত্র একাগ্রতা দিয়েই তিনি এ-কাজে অগ্রসর হননি। সমাজে পশ্চাদ্‌মুখীন যে শক্তি ছিল — যা সব সমাজেই থাকে — তার প্রতিকূলতা ও উগ্র বিরুদ্ধতার সামনে রোকেয়া কোনদিন হার মানেননি; কখনো কোনো অন্যায় দাবির সঙ্গে তিলমাত্র আপোস করেননি। সেসময়ে একটি অনুন্নত সমাজের নারীর পক্ষে এটি একটি বিস্ময়কর সাহসিকতা। রোকেয়া বুঝেছিলেন যে, জ্ঞান শুধু চিত্তকে আলোকিত করে তা-ই নয়, বহু যুগের সঞ্চিত কুসংস্কার যা জগদ্দল পাথরের মত সমাজের অগ্রগতির পথ রোধ করে তাকে সরাবার শক্তিও দেয়। এতে যে শুধু সাখাওয়াত স্কুলেরই উন্নতি হয়েছিল তা নয়, মুসলিম নারীসমাজে শিক্ষার জন্য তৃষ্ণা ও আগ্রহ জেগেছিল। এর প্রভাব সুদূর প্রসারিত হয়; ক্রমে ক্রমে গ্রামে ও নগরের উপকণ্ঠে মুসলিম নারী শিক্ষার ছোটবড় প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়। এতে মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার বিস্তার হয়, এবং সেটা পুকুরের জলে ঢিল ফেলার মত তরঙ্গের পর আয়ত -তর তরঙ্গে বিস্তৃত হতে থাকে, ছোট বড় নানা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকে এর বিস্ময়কর সার্থকতা যথার্থভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তখন মুসলিম কিশোরী বা তরুণীর বিদ্যাশিক্ষা সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল; অনুমোদনেরও। রোকেয়া এই জগদ্দল পাথর সরিয়েছিলেন; যদিও আরও কিছু সদিচ্ছাবান্ মানুষ তাঁকে সমর্থন করেন, তবু প্রধান উদ্যোগ এবং একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকা ছিল তাঁরই কাজ। সমস্ত সামাজিক বাধা অতিক্রম করে তিনি একাজে ব্রতী হন। সার্থকও হন।

আর বাধা কি একরকমের? কোরান উদ্ধৃত করে নারীর বিদ্যাশিক্ষা পাপ বলে প্রমাণ করা, পুরুষের অধীন থাকবে যে নারী, শিক্ষা তাকে স্বাধীনতার পথ দেখাবে, সংসারে স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর স্পৃহা চলে যাবে শিক্ষার ফলে, ইত্যাকার, নানা বাধা একে একে দেখা দেয়। রোকেয়া দৃঢ়চিত্তে এগুলির খণ্ডন করেন। তাঁর স্কুলে নারীর শিক্ষা অব্যাহত থাকে। এই অনমনীয় মনোবল তাঁকে প্রবল বিরোধিতার সঙ্গে আপোস করতে দেয়নি।

প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান ছাড়াও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গ্রন্থ রচনা করেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর স্বপ্নকে রূপ দেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল ঃ মতিচূর (দু'খণ্ডে), পদ্মরাগ ও অবরোধবাসিনী। বিখ্যাত সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থটি প্রথমে ইংরেজিতে লিখে পরে বাংলায় অনুবাদ করেন। তেমনই Ideals for

the Modern Indian Girls. নিবন্ধটিও তিনি পরে বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া তেত্রিশটি রচনা আছে যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। আর আছে পত্রাবলী, সেও সংখ্যায় বেশ কটি। সক্রিয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এতগুলি লেখা সত্যিই বিস্ময়কর। লেখাগুলি অবশ্য কর্মকাণ্ডেরই পরিপূরক; তিনি কী ভেবে কাজ করতেন অনেকটা তাই-ই প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু। ছোট ছোট গল্প সাংসারিক; সামাজিক সমস্যা ও সেগুলির যুক্তিসঙ্গত সমাধানই প্রধানত মতিচূরের দু'খণ্ডের গল্পগুলির উপপাদ্য। এগুলির মধ্যে দিয়ে রোকেয়ার সমাজ সচেতন মনটি ধরা পড়ে। সমাজের সমস্যা তিনি শুধু শাস্ত্রবচন দিয়ে সমাধান করবার চেষ্টা করেন নি। সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানবিক বোধ ও যুক্তিবিচার দিয়ে সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে চেয়েছেন। রোকেয়াকে বুঝতে গেলে তৎকালীন পর্দানশীন মুসলিম নারীসমাজ, এ সম্বন্ধে নানা ধর্মীয় ও পারিবারিক বিধিনিষেধকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে, প্রতিকূলতা শুধু পুরুষের থেকেই আসেনি, এসেছিল সংস্কারাচ্ছন্ন নারীদের কাছ থেকেও এবং সম্মুখসমরে না গিয়েও মানবিক আবেদন ও যুক্তির দ্বারা তিনি সমস্যাগুলির সমাধান করেন।

রোকেয়া সর্ব অর্থেই একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর প্রাপ্ত সাহচর্য যতটাই হোক, তিনি সমাজকে দিয়েছেন অনেক বেশি। ঊনবিংশ শতকে নারী আন্দোলনের সূচনাও এই নারীর কৃতিত্ব। সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সমাজচেতনাও রোকেয়া তাঁর রচনাগুলিতে বিকশিত করেন। বেগম রোকেয়ার যুগে খুব কম হিন্দু নারীই সমাজসংস্কারে এমন নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। এ-ও তাঁর এক বৈশিষ্ট্য। যে কোন যুগেই এ-ধরনের একটি শিক্ষিত মন, সম্মুখদৃষ্টি ও সংস্কারমুক্ত মন সমগ্র নারীসমাজের উজ্জ্বলপ্রাপ্তির গৌরব, আর ঊনবিংশ শতকের মুসলমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি পরম গৌরবের বস্তু।

সুরাহা-সম্প্রীতি ১৯৯০ সালে থেকে প্রতিবছর রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা মালার আয়োজন করে দেশের বেশ কিছু বিস্মৃতপ্রায় এবং প্রায়অজ্ঞাত গুণী সন্তানদের অবদান জনসমক্ষে তুলে ধরে একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছে। এই 'লুকানো রতন' পুস্তকখানি পাঠক-সমাজে সমাদর পাবে আশা রাখি।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

২৩৯-এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড
পোঃ নাকতলা
কলকাতা ৭০০ ০৪৭

সুরাহা-সম্প্রীতির আত্মকথা

১৯৮৯ সালে আমার জন্ম কলকাতায় কতিপয় তরুণ-তরুণীর শুভ ইচ্ছায়। তারা একটি সংস্থা গড়ার কথা ভাবছিলেন নিজেদের কথা জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়োজনবোধে। এদের মধ্যে ছিলেন সফিউন্নিসা, আবদুস সামাদ গায়েন, খায়রুল হাসান সেপাই প্রমুখ। এরা পরামর্শ চাইলেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহারের। তিনি তাঁর আকৈশোর লালিত ইচ্ছার কথা জানালেন। এই সংস্থা ভারত-মাতার কন্যারত্ন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শে গড়ে উঠলে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতায় সম্মত। সর্বজনশ্রদ্ধেয়া গৌরী আইয়ুবকে বলা হলো সেকথা। তিনি খুশি। তিনি হলেন পথপ্রদর্শক সভানেত্রী। সম্পাদক হলেন মীরাতুন নাহার। গঠিত হলো একটি সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা। নাম দেওয়া হলো — 'সুরাহা'। নিবন্ধীকরণের সময় আরও একটি শব্দ যুক্ত করতে হলো। জন্ম হলো আমার। আমার নাম হলো 'সুরাহা-সম্প্রীতি'। সেদিন যারা পরিচালন-সমিতির বিভিন্ন পদে ছিলেন তাঁরা হলেন —

সভানেত্রী	ঃ	গৌরী আইয়ুব
সহ-সভাপতি	ঃ	জি. এম. আবু বকর
সম্পাদক	ঃ	মীরাতুন নাহার
সহ-সম্পাদক	ঃ	মঞ্জরী বন্দ্যোপাধ্যায়
,,	ঃ	আলম দেইয়ান
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	দীপঙ্কর বসু

সদস্য ঃ

ইন্দ্রানী বসু, সফিউন্নিসা, আজরা পারভীন, কেশওয়ার জাহান, কাজী আফসার আলি

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সম্মিলিত উদ্যোগ নিয়ে কিছু সামাজিক সমস্যার সমাধানে ব্রতী হবেন — এটিই সংস্থার লক্ষ্য। কিছু নির্দিষ্ট কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করা হলো — মাসিক ও বার্ষিক। সব প্রকল্পই রূপায়িত হলো রোকেয়ার নামে। দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে সদস্যচাঁদা ও সহৃদয় ব্যক্তিদের থেকে সংগৃহীত অর্থের সঞ্চয়ভাণ্ডার থেকে — নাম দেওয়া হলো 'রোকেয়া-বৃত্তি'। 'রোকেয়া-পুরস্কার' দেওয়া হবে প্রতিবছর কঠোর বাস্তবজীবনে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এমন মহিলাকে। দেশের বিস্মৃত-প্রায় বা অকাল-বিস্মৃত কোন রত্ন-সন্তানের অবদানকে সর্বসমক্ষে তুলে

ধরার জন্য 'রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হবে প্রতিবছর। প্রতিবছরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য কোন রচনাকে নাটক, শ্রুতিনাটক, আলেখ্য ইত্যাদি মোড়কে উপস্থাপন করা হবে।

এইসব পরিকল্পনার বাস্তবরূপায়ণে শুরু হলো আমার পথচলা। চলতে চলতে দেখলাম মাঝে মাঝেই সংস্থার দেহে বদল ঘটছে। বিভিন্ন কারণে সদস্যের ছেড়ে যাওয়া ও নতুন আসার মত ঘটনা ঘটছে। তবে তাতে সংস্থার কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ঘটলো না। প্রতিবছর একনিয়মে নির্দিষ্ট কর্ম-রূপায়ণ চলতে থাকলো। প্রতিমাসে বেশ কিছু শিক্ষার্থী অর্থসাহায্য এবং অভিভাবকসুলভ পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হতে থাকলো। বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে তারা আজ সংখ্যায় বহু। তাদের সঙ্গে সংস্থার সদস্যদের সম্পর্ক আত্মীয়-বন্ধুর মতো।

১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর 'রোকেয়া-পুরস্কার' সম্মানে যারা ভূষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বিজ্ঞানী রুকসানা চৌধুরী, জন্মান্ধ শিক্ষিকা অঞ্জলি রায়, কোলাজশিল্পী শাকিলা খাতুন, হিউম্যানিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাত্রী সবজি বিক্রেতা সুবাসিনী মিস্ত্রি, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার জাহানারা বেগম, সমাজ-কর্মী অলকা কাঁড়ার, পর্দানসীন যুক্তিবাদী লেখিকা উম্মে কুলসুম, প্রতিবন্ধী সংগঠন কর্মী সুলতা মণ্ডল, সামাজিক প্রতিকূলতাজয়ী অধ্যাপিকা মকসুদা খাতুন, রোকেয়ার স্কুলের তৎকালীন সময়ের ছাত্রী নুরুন্নেসা বেগম, গ্রাম্য প্রতিকূল পরিবেশের বিপরীত স্রোতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হয়ে ওঠা অসীমা সুফিয়ান, সমাজ আন্দোলনের কর্মী ও লেখিকা আয়েশা খাতুন এবং অসামান্য কাঁথা-শিল্পী আমিনা বেগম।

প্রতিবছর রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতায় যেসব অনন্যসাধারণ জানা ও স্বল্পজানা মানুষের অবদান তুলে ধরা হয়েছে তাঁরা হলেন, স্বয়ং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, শৈলবালা ঘোষজায়া, শামসুন নাহার মাহমুদ, পরিমল রায়, ডা. লুৎফর রহমান, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, ডক্টর হিরন্ময় ঘোষাল, আফসারুন্নেসা, জনার্দন চক্রবর্তী, মুহম্মদ আবদুল হাই ও জ্যোতির্মালা দেবী। প্রতিটি বার্ষিক অনুষ্ঠান দেশের যেসব কৃতী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে মহিমা লাভ করেছে তাঁরা হলেন, প্রয়াত জাস্টিস সাদাত আবুল মাসুদ, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, তপোব্রত ঘোষ, অমলেন্দু দে, সাধন চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন বসু, যশোধরা বাগচী, মীনা চক্রবর্তী, বাণী দত্ত, মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অসিতরঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রতিবেশী বাংলাদেশের যেসব গুণী মানুষদের আন্তরিক সহযোগিতা ও

উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছে আমার বার্ষিক আয়োজন তাঁরা হলেন শামসুল আলম, হাসান আজিজুল হক, শহিদুল ইসলাম, জাহানারা নওশিন ও প্রয়াত সেলিনা বাহার জামান।

বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলিতে ক্রমান্বয়ে পরিবেশিত হয়েছে — রোকেয়ার 'পদ্মরাগ', 'রোকেয়া' — রোকেয়ার জীবন-কথা, লুৎফর রহমানের 'রায়হান', আফসারুন্নেসার 'বুভুক্ষু', (সবকটির শ্রুতিনাট্যরূপ দিয়েছেন কামাল হোসেন), শৈলবালা ঘোষজায়ার 'শেষ আন্দু' (নাট্যরূপ ঃ কুন্তল মুখোপাধ্যায়), পরিমল রায়ের রচনা অবলম্বনে 'লঘুসুরে গভীর কথা' (আলেখ্য), রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' (শ্রুতিনাটক), কাজী আবদুল ওদুদের 'রবীন্দ্রনাথের গান' (আলেখ্য) — [তিনটির রূপদান করেছেন মীরাতুন নাহার], রোকেয়ার জীবনী অবলম্বনে রচিত নাটক 'ছেঁড়াফুল' (রচয়িতা ঃ শীলা চক্রবর্তী) [এটি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অভিনয় করেন]। অন্যগুলি পরিবেশন করেন আমার সদস্যরা। দু'টি অনুষ্ঠানে বেগম রোকেয়া স্মৃতি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পরিবেশন করেন রোকেয়ার জীবন ও কর্ম ভিত্তিক আলেখ্য। শেষ দুটি অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় বাণী দত্ত নির্মিত তথ্যচিত্র 'রোকেয়ার কথা'।

আমার কর্মপন্থা বা কর্মসূচীতে কোন রদ্‌বদল ঘটেনি এ পর্যন্ত। রোকেয়া-চর্চাতে নিবেদিতপ্রাণ আজও আমি। বেশ কিছু মানুষের অর্থানুকূল্য ও সহযোগিতায় আমি সচল থেকেছি এতদিন। তাঁদের মধ্যে আজিজুর রহমান, মিসেস রাবিয়া ওয়ারা, জয়দীপ বসু, রজত রায়চৌধুরী, মীনাক্ষী রায়চৌধুরী, পূর্ণিমা ঘোষ, মিতা গুহ, সুমিত্রা চ্যাটার্জী, যশোধরা বাগচী, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের প্রাক্তনীবৃন্দ, ডা. কামাল হোসেন, নুরুল ইসলাম খান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আমার পরিচালন-সমিতির প্রতিনিধি তালিকায় সময়ের নিয়মে বদল ঘটেছে। এখন যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন ঃ-

সভানেত্রী	ঃ	কেশওয়ার জাহান
সম্পাদক	ঃ	মীরাতুন নাহার
সহ-সম্পাদক	ঃ	ইন্দ্রানী বসু
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্য ঃ লুৎফুন্নেসা রহমান,প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিলকান্তি দাশগুপ্ত, গৌরী পুরকায়স্থ, মনোজ দত্ত, বুলবুল আহমেদ, আসফ আলি, সাহানা বসু, কাজী আফসার আলি ও প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মদ ফজলো কাদের।

আমি আত্মপ্রচার-বিমুখতা নীতিতে বিশ্বাসী। আমাদের একান্ত প্রিয় সভানেত্রী

নীরব কর্মসাধক গৌরী আইয়ুবকে হারিয়ে আমরা তাই শোকে মুহ্যমান হয়েছি। তবু আমরা কর্মপথ থেকে পা সরাইনি। গৌরীদির প্রয়াণের পর কেশওয়ার জাহান ও মুহাম্মদ ফজলে কাদের আমার একান্ত শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অব্যাহত রয়েছে আমার পথচলা। আমি চেয়েছি পশ্চিমবাংলার মানুষ জানুক মহাপ্রাণা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে। তাঁর জ্বেলে যাওয়া শিক্ষাপ্রাণতা, দেশপ্রেম, দেশোন্নতি-ভাবনায় উজ্বল প্রদীপ আলো দিক দেশবাসীর প্রাণে প্রাণে। আমি সফল। আজ এ-বাংলাবাসী অনেকাংশে তাঁকে জেনেছে, চিনেছে। ড. মীরাতুন নাহারের সম্পাদনায় তাঁর রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে কলকাতায় প্রথম। এ দায়িত্ব পালন করেছে বিশ্বকোষ পরিষদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকস্তরে রোকেয়ার 'স্ত্রীজাতির অবনতি' পাঠ্যবিষয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদ তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য 'কিশলয়'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছে রোকেয়ার জীবন-কথা। শ্রী সুনীল পাল, শ্রীমতী ইরা চক্রবর্তী ও শ্রী রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর আন্তরিক উদ্যোগে পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয় চত্বরে স্থাপিত হয়েছে রোকেয়ার সমাধিফলক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে 'বেগম রোকেয়া স্মৃতি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়', কলকাতার সল্টলেকে। শ্রীমতী বাণী দত্ত তৈরি করেছেন 'রোকেয়ার কথা' — একটি অনবদ্য তথ্যচিত্র। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ-এর কার্যালয় রোকেয়ার নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। রোকেয়ার মতো মহান ভারত-সন্তানের প্রতি দেশবাসীর এই প্রকার শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রচেষ্টা দেখে আমি গর্বিত।

এবছর রোকেয়ার ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে মহাসমারোহে কলকাতায় ও জেলাস্তরে। ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সারা বাংলা রোকেয়া ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটি। এই পুস্তকখানি প্রকাশের মাধ্যমে আমিও সে উৎসবে সামিল হতে পেরেছি।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থেকেও স্বহস্তে সুন্দর ভূমিকাটুকু লিখে দিয়ে আমাকে চিরঋণী করেছেন শ্রীযুক্তা সুকুমারী ভট্টাচার্য।

এই প্রকাশ-কর্মে যাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা ও উৎসাহ না থাকলে আমাকে আত্মকথনে নীরব থাকতে হতো তিনি হলেন শ্রী সলিল চক্রবর্তী। পুস্তকটির নাম দেওয়া হয়েছে রোকেয়ারই একটি রচনার নামে। এখন এই পুস্তক যদি পাঠক ও গবেষকদের আনন্দ ও প্রেরণা দিতে পারে তাহলেই আমি সার্থক হবো।

সুরাহা-সম্প্রীতি
দূরভাষ ঃ ২২৮৪-৬৪১৩
৬৪জি লিন্টন স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০১৪

রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা ঃ পটভূমি ও মূল্যায়ন

মুহম্মদ শামসুল আলম

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের কথিত নবজাগরণের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল নারী-পরিস্থিতি। এ দেশের নিগৃহীত অধপতিত নারী জাতির ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেথুন, উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ও স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ দেশী ও বিদেশী মনীষীবৃন্দ।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে নারীর অবস্থা মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। স্ত্রী আর স্ত্রীর সম্পত্তি, দুটোর ওপরই থাকত স্বামীর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুলভ হলেও সামাজিক বা রাজনৈতিক সাম্যের কথা ইংরেজ মহিলারা তখনও ভাবতে পারেন নি।[১] বিবাহিত মহিলার সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক বিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আলোচিত হয় ১৮৭০ সালে আর তা আইনে পরিণত হয় আরও প্রায় বিশ বছর পরে। মার্কিন মহিলারা পুরুষের মতো ভোটাধিকার অর্জন করে ১৯২০ সালে। ইংল্যাণ্ডে ঐ অধিকার স্বীকৃত হয় আরও দেরীতে, ১৯২৮ সালে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সময়ে ইংল্যাণ্ডের প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দ অনুকরণীয় আদর্শের জন্য তাকাতেন ফ্রান্সের দিকে। মূলত ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) মহান আদর্শ, সকল দেশের সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান — থেকেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের মনে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। বিপ্লবের বছরেই ৪ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত কতিপয় অদম্য বিপ্লবীর চেষ্টায় প্যারিস থেকে ভার্সাই পর্যন্ত March of Women অনুষ্ঠিত হয়। নারী জাতির ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার স্থির লক্ষ্যে পরিচালিত তিন দিনের ঐ ঐতিহাসিক মিছিল, নারীর অধিকার বিষয়ে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি করে।[২] এবং পরবর্তী নারী অধিকারবাদী আন্দোলনসমূহকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। বরং বলা যায়, ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ও অনুভূতিতে উজ্জীবিত মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট্ (১৭৫৯-১৭৯৯)-এর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ Vindication of the

Rights of Women (১৭৯২)-এর প্রকাশনা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। মেরি তাঁর গ্রন্থে নারী-স্বাধীনতার ভাবনায় এক নতুনমাত্রা যোগ করেন। অসাধারণ বীরাঙ্গনা আর নিন্দিত পশু — এ দুয়ের মধ্যবর্তী, যুক্তিসিদ্ধ স্বাভাবিক জীবনই নারীর উপযুক্ত বলে মনে করেন গ্রন্থকর্ত্রী।

দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬ - ১৮৭৩) তাঁর The Subjection of Women (১৮৬৯) গ্রন্থে যুক্তিশীলতার সঙ্গে নারী ও পুরুষের সমান সামাজিক অধিকারের দাবী উত্থাপন করেন। মিলের Principles of Political Economy (১৮৪৮) ও Essay on Liberty (১৮৫৯) গ্রন্থ দুটির প্রভাবও এ সূত্রে অবশ্য স্মরণীয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা বিদ্যাসাগর, ব্রাহ্ম বা হিন্দু, বাঙালী সংস্কারকমাত্রই বিশ্বাস করতেন যে, নারী মুক্তির মাধ্যমেই সূচিত হতে পারে বাংলার সংস্কার আন্দোলন। এমন কি, অশিক্ষার নিগড় থেকে নারী জাতির মুক্তি না ঘটলে, সমাজের কোন রূপান্তর বা উন্নতি সাধিত হবে না বলেই বিশ্বাস করতেন নবজাগরণের নেতারা। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত কেশবচন্দ্র সেন তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় এ বিশ্বাসের কথা অব্যাহতভাবে প্রচার করেছেন।

এর সমসাময়িক কালে এদেশে বসবাসকারী ইউরোপীয় মহিলাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর সাংগঠনিক আয়োজনের মাধ্যমে হিন্দু মহিলারা শিক্ষার কিছু সীমাবদ্ধ সুযোগ লাভ করেছিলেন বটে কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বিত মুসলিম নারীদের সামনে বিদ্যাশিক্ষার ক্ষুদ্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে অনেক বিলম্বে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন তো নয়ই, বিদেশী বেথুনও নয়, একজন ছোট খাটো জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মনীষীর আবির্ভাব তখন ঘটেনি বাঙালী মুসলমান সমাজে। আগেই বলা হয়েছে, মিশনারী, ব্রাহ্মসমাজ কিংবা দেশীয় ও ইউরোপীয় মহিলার শিক্ষাদানের সকল প্রয়াসই মুখ্যত সীমাবদ্ধ ছিল হিন্দু বালিকাদের জন্যে। এমনকি বেথুনের বিদ্যালয়ে (১৮৪৯) সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন হিন্দু বালিকারাই কেবল ভর্তি হতে পারত।[৩]

মুসলিম বালিকাদের নিরক্ষরতা মোচনে ও সামাজিক দুর্দশা লাঘবে সম্ভবত প্রথম আলোকপাত করেন নওয়াব আবদুল লতিফ। ১৮৬৭ সালে 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন'-এ পঠিত একটি প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের নারী-পরিস্থিতির বিষয়ে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। সৈয়দ আমির আলীর নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭) ও পরে 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশেন' পশ্চাদপদ মসলমানদের পরিত্রাণে

বিশেষত নারী সমাজের জাগরণে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। সৈয়দ আমির হোসেনের ইংরেজীতে প্রকাশিত, A pamphlet on Mahomedan Education in Bengal (১৮৮০) সরকারী ও বেসরকারী মহলে বিপুল সাড়া জাগায়।

বস্তুতপক্ষে, The Status to which the great majority of Muslim women in India are reduced today is a libel on Islam, a crime for which the Muslim Community as a whole will have to suffer in increasing social degradation, in weak and sickly offsprings, in increasing child mortality, so long as that crime is perpetuated.[৪]

এমনি হতাশাময়, কুসংস্কারপূর্ণ পরিস্থিতিতে রোকেয়ার আবির্ভাব বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তবর্তী রংপুর জিলার মিঠপুকুর উপজিলার পায়রাবন্দ গ্রামে। জীবনে কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি রোকেয়া। একটি জ্ঞান-পিপাসু অনুসন্ধিৎসু, নিত্য সচেতন মানসপ্রকৃতি ছিল রোকেয়ার। অসাধারণ অধ্যবসায় ও নিরলস শ্রমের বিপুল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী রোকেয়া তাঁর ব্যাপক ও বিপুল অধ্যয়ন, সুস্থ ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে আমাদের দেশের নারী-মুক্তির চেতনা ও সংগ্রামকে প্রবলতর করেছেন।

রোকেয়া স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন নানা বিষয়ের বহু গ্রন্থের, দেশী ও বিদেশী বিবিধ পত্র-পত্রিকার। সেকালে দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য অনেক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের পাঠক ছিলেন রোকেয়া। দেশের বহু সংখ্যক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন লেখিকা হিসেবে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে একালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্যিকের রচনার প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি আছে রোকেয়া-রচনাবলীতে প্রচুর।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল রোকেয়ার। ইংরেজীর সার্থক অনুবাদে শুধু নয়, ঐ ভাষাতে চমৎকার রচনাশৈলীর জন্যেও রোকেয়া স্মরণীয়।

রসায়নশাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণে, ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালন বিষয়ে, স্বাস্থ্যবিধি, উদ্যানতত্ত্ব, শারীরবিদ্যা, গার্হস্থ্যঅর্থনীতি ও ইসলামী শ'রিয়া আইনে রোকেয়া চমৎকার ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। সৌর শক্তির বিচিত্র সম্ভাবনার দিকগুলোর প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিল রোকেয়ার সন্ধানী-দৃষ্টি। আল-কুরআন ও হাদিসের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ ও বহু উদ্ধৃতি রয়েছে রোকেয়া-রচনাবলীতে।

> আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেয়ামতের পরদিন দেওয়া হইবে। এখন পড়া তৈরী করিতেছি।[৫]

যিনি নিজেকে নিয়ে পরিহাস-রসিকতায় মেতেছিলেন, সে বিদূষী রোকেয়া স্পষ্টতই তাঁর বিপুল অধ্যয়ন, বিচিত্র কর্মস্পৃহা এবং সৃষ্টিশীল চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মের পটভূমি — তাই স্পষ্টত লক্ষণীয় হয়ে ওঠে যে, রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) সাহিত্য সাধনা এবং তাঁর ব্যক্তিজীবনের বৈশিষ্ট্য অন্য-নিরপেক্ষ নয়। এক কর্মযোগী মানুষের অক্লান্ত সাধনা আর এক মানবপ্রেমিকের কর্মপ্রয়াসের সমন্বিত রূপ রোকেয়ার নাতিদীর্ঘ জীবন। বিশ্বাস করা চলে, তাঁর সাহিত্য সাধনা এবং ব্যক্তিজীবনের নানা সংঘাত, সমাজ সংস্কারের বিচিত্র আয়োজন পরস্পরের পরিপূরক। সন্দেহ নেই, সমাজহিতের ব্রতই রোকেয়াকে প্রধানত সাহিত্য সাধনায় প্রণোদিত করেছিল। তবে ব্রত সাধনার সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁর সে প্রয়াস নিঃশেষিত হয়নি। বুদ্ধির দীপ্তি, যুক্তির সরসতা, বক্তব্যের ঋজুতা ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্যে রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে উঠেছে। বাংলার কথিত নবজাগরণের আংশিক প্রতিষ্ঠা রোকেয়া-রচনাবলীর অক্ষয় বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে।

রোকেয়ার আগে বাংলা সাহিত্য চর্চায় একাধিক মহিলা খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা তাহরন নিসার আবির্ভাব ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। নওয়াব ফয়জুন্নিসার 'রূপজালাল' প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে, রোকেয়ার তখন জন্ম হয়নি।

রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম পরিমাণে বিপুল নয়। তবে তা গভীর তাৎপর্যে মহৎ। কবি আবদুল কাদির কর্তৃক সম্পাদিত 'রোকেয়া-রচনাবলী' ১৯৭৩ একটি স্মরণীয় উদ্যোগের ফল। দীর্ঘ বারো বছর পর বাংলা একাডেমী 'রোকেয়া রচনাবলী'র পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেছেন ১৯৮৪ সালে।

রোকেয়ার মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। 'রোকেয়া রচনাবলী'তে সংকলিত প্রবন্ধের সংখ্যা ১৬। ছোট গল্প ও রস রচনা রূপে নির্দেশিত লেখার সংখ্যা ৬ ও কবিতার সংখ্যা ৭। সম্পাদকের এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত। অনেক লেখার প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্যেও তিনি যথার্থ নন। 'রোকেয়া-রচনাবলী'র সম্পাদকের প্রদত্ত তালিকার বাইরে, বর্তমান নিবন্ধকার কর্তৃক সংগৃহীত রোকেয়ার নিম্নলিখিত রচনার তালিকা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তালিকায় আছে,

ক) "প্রভাতের শশী", "পরিতৃপ্তি", "স্বার্থপরতা", "কাঞ্চনজংঘা" ও "প্রবাসী রবিন ও তাহার জন্মভূমি" নামের পাঁচটি কবিতা।

খ) "কূপমণ্ডুকের হিমালয় দর্শন" নামে একটি তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী।

গ) "Educational Ideals for the Modern Indian Girl" নামক একটি দীর্ঘ অভিভাষণ।

"আশাজ্যোতিঃ" নামক যে প্রবন্ধটি সম্পাদক আবদুল কাদির সংগ্রহ করতে পারেন নি, তাও এই নিবন্ধকার কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে।

রোকেয়ার রচিত গ্রন্থসমূহের নাম 'মতিচুর', 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' ও 'সুলতানাজ ড্রিম' প্রভৃতি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়, অনেকটা উদ্দেশ্যমূলকও।

'মতিচূর' দু'খণ্ডে সংকলিত বিচিত্রধর্মী রচনার সংখ্যা ১৭। প্রথম খণ্ডের (১৯০৫) প্রথম রচনা "পিপাসা : মহরম"-এর প্রকাশ-প্রসঙ্গে বিস্তর ভুলের সমাবেশ ঘটেছে। রচনাবলীর সম্পাদক সে ভুল থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। এই রচনার প্রথম প্রকাশ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত 'নবপ্রভা'র ১৩০৮ সনের ফাল্গুনে (২য় খণ্ড ১ম সংখ্যায়)।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ, রোকেয়ার সর্বাধিক সমালোচিত রচনা। আবদুল কাদির "আমাদের অবনতি" নামে, সৈয়দ এমদাদ আলী'র 'নবনুরে' প্রকাশের যে সূত্র উল্লেখ করেছেন, তা-ও ভ্রান্ত। 'নবনূর' (ভাদ্র, ১৩১১) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি মূলত 'মহিলা' (গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত) ১৩১০ সনের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের সংখ্যায় প্রকাশিত "অলঙ্কার না Badge of Slavery-এর পরিবর্তিত দ্বিতীয় পাঠ। এর অনুচ্ছেদ বিশেষের পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রসঙ্গেও আবদুর কাদিরের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। তিনি প্রবন্ধের প্রথম পাঠ দেখতে পান নি বলেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঠের মধ্যে। "অর্ধাঙ্গী" প্রকাশের যে বিবরণ 'রোকেয়া রচনাবলী'র সম্পাদক দিয়েছেন তাও ভ্রমাত্মক। ১৩১১ সনের আশ্বিন সংখ্যায় 'নবনূরে'র পুনর্মুদ্রণকে তিনি প্রথম প্রকাশ ধরে ভুল করেছেন। ঐ প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশও 'মহিলা'য় — ১৩১০ সনের শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিকে।

সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনার নানা প্রবন্ধেও অনুরূপ বিভ্রান্তি চোখে পড়ে। কেউ রোকেয়ার প্রবন্ধকে পরিচিত করেছেন গ্রন্থরূপে। আবার কেউ প্রবন্ধ পুস্তককে অন্তর্ভুক্ত করেছেন উপন্যাসের তালিকায়। আমরা অন্যত্র এসব ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করেছি।[৬]

আলোচনার সুবিধার জন্য রোকেয়ার রচনার একটা শ্রেণীকরণ হওয়া প্রয়োজন। উপন্যাস ও প্রবন্ধগ্রন্থ স্পষ্টত চিহ্নিত। বাকী রচনাগুলোর শ্রেণীকরণ কেউ কেউ করেছেন, যেমন রচনাবলীর সম্পাদক আবদুল কাদির। এ

শ্রেণীকরণের যাথার্থ্য নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে নতুন শ্রেণীকরণের। রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে উদ্দেশ্যমূলকতা প্রাধান্য পেয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই তাঁর বক্তব্যপ্রধান প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। গল্প মাত্র দু'চারটি, তাতেও স্থান বিশেষে প্রবন্ধের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। কবিতা এ পর্যন্ত বারোটির বেশি সংগৃহীত হয়নি। ইংরেজী ও বাংলায় প্রদত্ত অভিভাষণ চারটি এবং চিঠিপত্র ছাড়া ইংরেজী রচনা মাত্র একটি। Educational Ideals for Modern Indian Girl ১৯৩১ সালে প্রকাশের পর এখনও পুস্তক আকারে অমুদ্রিত।

সাহিত্য সাধনায় রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। সূক্ষ্ম নান্দনিক সৌন্দর্য-সন্ধান নয় -- সামাজিক রূপান্তর সাধন, নারী সমাজের আর মানুষের কল্যাণ সাধনের কাজেই তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত।

রোকেয়া-রচনাবলী বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। স্বদেশহিত, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধাবোধ, স্বাধীনতার জন্যে তীব্র আকুলতা, পরাধীনতার প্রতি ধিক্কার ও আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশিত হয়েছে রোকেয়ার সাহিত্যে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কথিত নবজাগরণে নারীমুক্তির বিষয়টি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল তা বলেছি। এ সূত্রে বিস্তর বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। কোন কোন আলোচক পর্দা আর অবরোধের পার্থক্যটুকু বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে পর্দা আর অবরোধের মধ্যে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছেন। তবে বিভিন্ন সময়ে কতিপয় মুসলমান মনীষীর চেষ্টায় অবরোধের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং ধর্মীয় পর্দার যাথার্থ্য স্বীকৃত হয়। ইসলামে অবরোধ নেই — এই ঋণাত্মক ধারণাটি সব নয়। ইসলামের ধর্মীয় পর্দার আবশ্যকতা মেনে নিয়েও প্রগতি ও কল্যাণের পথে চলা সম্ভব। রোকেয়া পর্দার নামে বাড়াবাড়িকে 'ভারতীয় পর্দা' বা 'সামাজিক পর্দা' বলে বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। অবরোধকে তিনি 'কৃত্রিম পর্দা' বলেও চিহ্নিত করেছেন। অবরোধ যে কত নির্মম ও ভয়ঙ্কর হতে পারে তার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে রোকেয়ার 'অবরোধবাসিনী' নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তকে। মাঝে মাঝে বর্ণনার অতিরঞ্জন দৃষ্টিকটু হলেও কৌতুক, বাস্তবতা, হাস্য ও সহানুভূতির মিশ্রণে অবরোধের বীভৎসতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে ওসব নক্শায়। "বোরকা" নামক একটি পৃথক প্রবন্ধেও রোকেয়া তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকে স্বচ্ছতররূপে প্রকাশ করেছেন।

নারী জাতির প্রতি সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণের প্রতিবাদে রোকেয়া নিঃশঙ্ক। ওসব আচরণের প্রতিকার কামনায় তাঁর লেখার উল্লেখযোগ্য

অংশ নিবেদিত। প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে পুরুষের কথিত শ্রেষ্ঠত্বকে খর্ব করে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন রোকেয়া। পরিণামে শুধু সমাজে ও সংসারে নয় — যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক কৌশলের সুষ্ঠু প্রয়োগে এমন কি, রাষ্ট্র পরিচালনাতেও নারীর বিরল শ্রেষ্ঠত্ব ও অসাধারণ সাফল্য প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর বহু লেখায়।

লক্ষ্যযোগ্য যে, রোকেয়ার দৃষ্টিতে পুরুষের অব্যাহত দাপট ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ক্রমপ্রসার ঘটে নারীর আলস্য, নিরক্ষরতা ও কর্মবিমুখতার কারণে। নারীর প্রতি সমাজের অবহেলার কারণও নারীর পর-নির্ভরশীলতা। রোকেয়া স্পষ্টত লক্ষ্য করেন ঃ

> আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রুপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না।[৭]

ক্ষেত্রবিশেষে পুরুষের সঙ্গে সহাবস্থানে নারীর দুর্বলতার চিত্রও তিনি গোপন করেন না। নিজের লেখা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্যের "নবদম্পতির প্রেমালাপ" কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে রোকেয়া তাঁর সংশ্লিষ্ট বক্তব্যকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করেন। এখানে রোকেয়া তাঁর সামাজিক পটভূমির বর্ণনায় সত্যনির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ এবং যুক্তিশীল আর সাহিত্যিক হিসেবে কল্যাণকামী। নারীর সংকীর্ণ চিত্ততা এবং কুরুচির প্রভাবে প্রবাসী স্বামী যে গৃহসুখে চিরবঞ্চিত থাকেন, তারও বর্ণনা দিয়েছেন রোকেয়া তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে আর 'গৃহ' নামক প্রবন্ধে।

অলঙ্কারের ভারে অবনত নারীর মুক্তিকামনা যে সুদূর পরাহত এমন দ্ব্যর্থহীন উক্তি রোকেয়ার। অলঙ্কারকে রোকেয়া চিহ্নিত করেন দাসত্বের নিগড় বা Badge of Slavery রূপে। রোকেয়ার সমকালীন মানবপ্রেমিক কবি নজরুলও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে বন্দিনী নারীকে সকল বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। রোকেয়ার ধিক্কারের ভাষা আরও তীক্ষ্ণ, আক্রমণ আরও সরাসরি ঃ

> আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি — এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য বর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন **(Originally badge of slavery)** ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের

হাতকড়ি লৌহনির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চুড়ি। বলাবাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না। কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (Dog Collar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে।[৮]

ভারতীয় নারীর মুক্তিকামী মহাত্মা গান্ধীও অলঙ্কারের প্রতি নারীর লোলুপতাকে নিন্দা করেন। গান্ধী মনে করেন, পুরুষের মনোরঞ্জনের ক্ষুদ্র বাসনা ছাড়া অলঙ্কার পরিধানের অন্য কোন মহৎ অভিপ্রায় নারী দেখাতে পারে না। এমন কি, নারী যেসব অলঙ্কার সাধারণত ব্যবহার করে, তাতে কোন নান্দনিক পরিকল্পনা কিংবা ব্যবহারিক উপযোগিতা চোখে পড়েনা। অনেক ক্ষেত্রে ওসব অলঙ্কার স্পষ্টত বোঝা স্বরূপ, বিসদৃশ এবং অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। পরিণামে নানারোগ বিস্তারে সহায়ক হয়।

ঠিক অনুরূপ মন্তব্য রোকেয়ার লেখাতেও ঃ—

যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য বর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন।[৯]

বাস্তবিক পক্ষে, পুঁজিবাদী সমাজে নারীর অলঙ্কারপ্রিয়তা, ব্যয়বহুল সাজসজ্জা আর উচ্চমূল্যের প্রসাধনের মোহ পুরুষকে প্রলুব্ধ করার পরোক্ষ কৌশল মাত্র। নারীদের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীরই একটি উক্তি এখানে স্মরণীয়,

Refuse to decorate yourselves, don't go in for scent or lavender water. If you want to give out proper scent, it must come out of your heart, and then you will captivate not men but humanity.[১০]

অতঃপর আমার মনে হয়, রোকেয়া-রচনাবলীতে নারী মুক্তির যে ধারণা প্রকাশ পায়, তাতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারীর আত্মোপলব্ধি, অর্থনৈতিক মুক্তি, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বোধ এবং ওসবের বাস্তব উপলব্ধির জন্যে যথার্থ শিক্ষা। রোকেয়া ভাল করে জানেন, প্রথমে জেগে ওঠা সহজ নয় — এতে জীবনও বিপন্ন হতে পারে। তবু অচঞ্চল বিশ্বাস ও সুদৃঢ় প্রত্যাশা নিয়েই তিনি লেখেন,

এখন প্রশ্ন হইতে পারে কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস

স্থাপন করিতে হবে।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয় তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টার, লেডী জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পর লেডী Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই? না পা নাই? না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।[১১]

অষ্টপ্রহর গৃহকর্মে নিয়োজিত নারী সকলের পরিচিত, শিক্ষকতায় নিয়োজিত নারীর সংখ্যাও কম নয়, তার সেবিকা মূর্তিও আমাদের চেনা। কিন্তু রোকেয়ার সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা হলো একটি বহুমুখী সেবা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নারীর সাফল্য, টাইপিং ও অন্যান্য কারিগরী শিক্ষায় নারীর দক্ষতা সৃষ্টিতে আর তাঁর অসাধারণত্ব হচ্ছে প্রয়োজনে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশের অবিচলিত ও দৃঢ় বাসনায়। এ দেশে নারীমুক্তি ভাবনার প্রাথমিক পর্যায়ে রোকেয়ার এসব পর্যবেক্ষণ অসাধারণ নিঃসন্দেহে। স্বভাবত রোকেয়া তাঁর ইপ্সিত সুগৃহিনীতে দেখতে চান পুরুষের ন্যায় মর্যাদা ও যোগ্যতার অধিকার। আর সে জন্য তিনি পরামর্শ দেন, রমণী যেন রাঁধুনীরূপে জন্মগ্রহণ করে, মরণে বাবুর্চি-জীবনলীলা সাঙ্গ না করেন, সমাজে তাঁরাও কর্ত্রী ও বিধাত্রীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার চেষ্টায় তৎপর হন। রোকেয়ার উপন্যাস 'পদ্মরাগ' আর কল্পকাহিনী 'সুলতানার স্বপ্ন'তেও নারীর যোগ্যতা ও মর্যাদার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। উপন্যাসের সুবিস্তৃত পরিসরে রাফিয়া, হেলেন, সৌদামিনী, চারুবালা, সাকিনা প্রমুখ সধবা, বিধবা, কুমারী সকল শ্রেণীর মহিলা আত্মপ্রতিষ্ঠার কঠোর সংগ্রামে নিয়োজিত। মিসেস সেনের অধ্যক্ষতায় 'তারিনী ভবন' সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের নারীদের এক মহামিলনস্থল হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে। কুমারী জীবনের অনিশ্চয়তা, বৈধব্যের অসহায়ত্ব আর সামাজিক নিপীড়নের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত বাঙ্গালী

নারীকে, ইংরেজ ডেলিশিয়ার আদর্শেই শুধু নয়, বাঙ্গালী ললনা সিদ্দিকা আর মিসেস সেনের আদর্শে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন উপার্জনক্ষম মানুষে রূপান্তরিত করার প্রত্যাশা বাস্তবায়িত করা হয়েছে 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে ও "ডেলিশিয়া হত্যা" কাহিনীতে। আজকাল কোন অত্যাচারিত বাঙ্গালী নারীর গর্বোন্নত প্রতিবাদ শুনে মনে হয়, রোকেয়ার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। বিশ্বাস হয়, তাঁর সাহিত্য-কর্মের প্রভাব স্থানে ও কালে যথার্থই প্রসারিত হয়েছে। পূর্ণ হয়েছে সাহিত্যিক রোকেয়ার প্রত্যাশা। শুধু দেশের উচ্চতম বিদ্যায়তনসমূহে শিক্ষাগ্রহণে নয়, অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ নির্বাহী পদেও যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন এ দেশের মহিলারা। বাংলাদেশের এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃত্বও গ্রহণ করছেন মহিলারা।

রোকেয়া তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে ঐক্য ও অখণ্ডতা উপলব্ধি করেছেন। উত্থানে-পতনে, সংগ্রামে-সফলতায় তাঁর এই উপলব্ধি খুব একটা বিচলিত হয়নি। নিজেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে পরিচয়দানকারী রোকেয়া অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবেও চিরস্মরণীয় হয়েছেন। রোকেয়ার নিজের ভাষায় ঃ

> আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা খ্রীষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি, আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী — তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।[১২]

ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রোকেয়া প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। মৌলিক ধর্মীয় বিধানকে গ্রহণ করেছেন তিনি। ধর্মের ছদ্মাবরণে সংস্কারের পীড়নকে গ্রাহ্য করেন নি কোনদিন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে "মুসলিম" কথাটি যুক্ত করেও তাতে রোকেয়া নানা ধর্মের বালিকাদের প্রবেশাধিকার রেখেছিলেন বাধাহীন। শিক্ষিকা নিয়োগ করেছিলেন বহু সম্প্রদায় থেকে। তাঁর রচিত সাহিত্যেও রোকেয়া সমাবেশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নরনারীর। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করেও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়ার উত্তম দৃষ্টান্ত রোকেয়ার জীবনে ও কর্মসাধনায় প্রোজ্জ্বল।[১৩] কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেন তিনি এভাবে ঃ

> কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টিয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ

শিক্ষা দিতে হইবে।[১৪]

সংস্কারান্ধ মোল্লাদের সঙ্গে মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন রোকেয়ার পার্থক্য ঐ উদার উপলব্ধিতে এবং তার অকুণ্ঠিত প্রকাশে। প্রায় অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৩-১৮৩২) জীবন ও কর্মসাধনায়।

> রাজা তাঁহার জীবনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে, হিন্দুভাবে, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। তথাচ তিনি অন্য ধর্মের গৌরব সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিতেন। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত তাঁহার হৃদয়কে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই।[১৫]

রোকেয়ার নাতিদীর্ঘ জীবনে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বহু রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে নানা রূপান্তর।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে রোকেয়ার আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। রাজনীতির উত্তপ্ত বিতণ্ডা আর দলাদলির অশোভন কোলাহলে তিনি যে বীতরাগ ছিলেন, তা সুস্পষ্ট। সম্ভবত বিদ্যালয়ের কাজে তাঁর সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা এবং জীবনের শেষের দিকে নিজের শারীরিক অসুস্থতার কারণেও তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হতে চাননি। রাজনীতির চেয়ে মানুষকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাই মানুষের কল্যাণ ছিল রোকেয়ার সাধনার বস্তু। বিদ্যালয়, সভা-সমিতি এবং সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তিনি যুগপৎভাবে একই সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চেয়েছেন। স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী আর সাহসী মানুষের গৌরবগাঁথা হিসেবে অম্লান হয়ে থাকবে রোকেয়ার "প্রবাসী রবিন ও তাঁহার জন্মভূমি", 'আপীল' ও 'নিরুপম বীর' প্রভৃতি কবিতা, "নিরীহ বাঙ্গালী" আর "মুক্তিফল" শীর্ষক গদ্য রচনা। এ সব লেখায় রোকেয়ার মুক্তি পিপাসু মনের পরিচয় বিধৃত। শুধু নারীর নয়, মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে। অনুগ্রহ-প্রত্যাশী, স্বার্থান্ধ ও ভণ্ড নেতৃত্বের প্রতি রোকেয়ার তীব্র ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে — বাংলা ও বিহারের উপাধি -লোভী নেতাদের ওপর তিনি নিক্ষেপ করেছেন বিদ্রূপের সুতীক্ষ্ণ কশা। মেকি দেশপ্রেমিকদের তিনি ক্ষতবিক্ষত করেছেন আক্রমণের তীব্রতায়। রোকেয়া তাঁর সমকালের সরকারের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী আত্মপ্রবঞ্চকদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন "আপীল" নামক বিখ্যাত কবিতায়। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের

অসারতাকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে "মুক্তিফল" শীর্ষক রচনায়। একই সময়ে মাতৃভূমির মুক্তিকামনায় আত্মনিবেদিত তরুণদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রোকেয়া। পরাধীন ভারতে মুক্তিপাগল বাঙ্গালী সন্তানদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী এ দেশবাসী কোনদিন ভুলতে পারেনা। বাঙ্গালীমাত্রেই জানেন, মজফ্ফরপুরের ঘটনাসূত্রে বাংলার দুই কৃতী সন্তান — প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮ - ১৯০৮) ও ক্ষুদিরাম (১৮৮৯ - ১৯০৮) প্রাণদান করে অমরত্ব লাভ করেন। এ সময়ে সরকার নানা অজুহাতে কারারুদ্ধ করেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত প্রমুখ ৩৪ জন অকুতোভয় বাঙ্গালীকে। হুগলীর দুঃসাহসী তরুণ কানাই সুস্থির পরিকল্পনার মাধ্যমে জেলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামের এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করেন। ইংরেজের বিচারে সূর্য-সন্তান কানাই ফাঁসিতে প্রাণ হারান, ১০ নভেম্বর ১৯০৮ সালে। এই বীরত্বপূর্ণ প্রাণদানের ঘটনাকে অবলম্বন করে রোকেয়া রচনা করেন "নিরুপম বীর" নামক কবিতা। বরেণ্য বাঙ্গালীদের স্মরণে রচিত অজস্র গান, কবিতা ও নাটকের সঙ্গে রোকেয়ার এই কবিতাটিও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সমকালীন ইতিহাসের বহু উপাদান রোকেয়া যথার্থ যোগ্যতার সঙ্গেই তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন।

বাংলাদেশের কৃষকদের দুর্দশা-পীড়িত জীবন ও অকিঞ্চিৎকর পেশার প্রতি রোকেয়ার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে দেশের শহরগুলোতে যখন ঐশ্বর্যের উপকরণ উপচে পড়ে দরিদ্র কৃষকের মুখে তখন অন্ন জোটেনা। বিত্তশালী ভূ-স্বামী যখন বিলাসিতার স্রোতে গা ভাষায় পল্লীর সাধারণ মানুস তখন বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। "চাষার দুক্ষু", "এন্ডি শিল্প", "তিন কুঁড়ে" প্রভৃতি রচনায় রোকেয়া এ দেশের কৃষক সমাজ ও কৃষি ব্যবস্থার মর্মন্তুদ চিত্র এঁকেছেন। দেশীয় শিল্প বিশেষ করে কুটির শিল্পের বিপর্যয় এবং এর পুনরুদ্ধারের বিষয়েও ওসব লেখায় রোকেয়া আলোচনা করেছেন। সময়োপযোগী বিষয় নির্বাচনে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিশ্লেষণে রোকেয়া প্রখর যুক্তিশীলতা এবং গভীর তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

পুরুষের বহু বিবাহের প্রতি রোকেয়া কঠোরতম প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহু লেখায়। শিশু ও প্রসূতির অকালমৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি দুর্ঘটনার জন্য রোকেয়া মুখ্যত বাল্য বিবাহকেই দায়ী করেন। সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন, পারিবারিক সুখ-শান্তি বৃদ্ধি, গৃহকর্মে নৈপুণ্য সৃষ্টি এবং সর্বোপরি আর্থিক স্বয়ম্ভরতার জন্যেও তিনি

নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। স্বাস্থ্য ও বংশানুগতির অব্যাহত উৎকর্ষেও নারীর সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য অপরিহার্য বলে সিদ্ধান্ত দেন। রোকেয়ার "বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি", "সুগৃহিনী" "শিশু পালন", ও "বিয়ে পাগলা বুড়ো" প্রভৃতি এখানে প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

পদ্য রচনা রোকেয়ার সাহিত্যকর্মের এক ক্ষুদ্রাংশ। সম্ভবত উচ্ছ্বাসময় কল্পনা ও বিমূর্ত আনন্দের প্রেরণায় তিনি মগ্ন থাকতে চাননি। সামাজিক পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন আর মানবকল্যাণেই তিনি ছিলেন নিবেদিত-চিত্ত। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতা পর্বে এবং নজরুলের সমকালে রচিত রোকেয়ার কয়েকটি কবিতা বহু পাঠকেরই শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

রোকেয়ার সর্বশেষ কবিতা "নিরুপম বীর" রচনার তারিখ আশ্বিন ১৩২৯। মাঘ ১৩১১ থেকে অগ্রহায়ণ ১৩২৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে রোকেয়া কোন কবিতা লেখেন নি। ১৩২৯-১৩৩১, এই দশকেও তাঁর হাত দিয়ে কোন কবিতা বেরোয় নি। তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তিক দশকের এ নীরবতা এবং পূর্ববর্তী সময়ে রচিত কবিতার সংখ্যাল্পতা নিঃসন্দেহে কাব্যচর্চায় তাঁর আগ্রহহীনতার প্রমাণ বলে মনে হয়। রোকেয়ার মানস-গঠনের তাৎপর্য এবং সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যমূলকতা ও বৈশিষ্ট্যও এ প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করা যায়।

রোকেয়ার স্বল্প সংখ্যক কবিতার বিষয়কে মোটামুটি শৌর্য, স্বদেশপ্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি গুণাবলী বলে নির্দেশ করা চলে। তাঁর সমসাময়িক অনেক কবি ব্যক্তিত্বের মতো তিনিও প্রকৃতির লীলা-লাস্য, চাঁদ, ফুল ও পাখীকেও তাঁর দু'একটি কবিতার বিষয়ীভূত করেছেন। কবি শেখ সাদীর একটি রচনার কাব্যানুবাদ করেছেন রোকেয়া "পরিতৃপ্তি" নামে। ইংরেজী ও উর্দু থেকেও চমৎকার অনুবাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যথাক্রমে "ডেলিশিয়া-হত্যা" ও "নূর ইসলাম" প্রভৃতি বিখ্যাত রচনা।

সরলতা ও সহজবোধ্যতা রোকেয়ার কবিতাবলীর বিশিষ্টতা। ছন্দোবিচারের মানদণ্ডেও তাঁর কবিতা উত্তীর্ণ। ছন্দের বৈচিত্র্য, বিষয়ের প্রাচুর্য ও নির্মাণ কলার অভিনবত্ব এখানে বেশি নেই। রোকেয়ার অধিকাংশ কবিতাই অক্ষরবৃত্তে রচিত। পয়ার ভেঙ্গে ত্রি-পদী ভিত্তিক বিভিন্ন রূপান্তর সাধনের নিদর্শন আছে "পরিতৃপ্তি"তে।

"স্বার্থপরতা" ত্রি-পদীতে লেখা।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা", "প্রবাসী রবিন" চোদ্দ মাত্রার পয়ারে রচিত।

"নিরুপম বীর" ছয় মাত্রার পর্বে বিন্যস্ত মাত্রাবৃত্ত।

তাঁর সমকালে কাব্যচর্চার নবতর কোন ধারার সঙ্গে রোকেয়া দৃশ্যত নিজেকে যুক্ত করেন নি। কলা কৈবলঙ্গবাদের নীতিতেও বিশ্বাস স্থাপন করেন নি তিনি। প্রচলিত অর্থে তাই সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মী বলে তাঁকে গ্রহণ করা যায় না। তবে লেখিকা, ভাবুক ও সমাজকর্মীর সুন্দর বিমিশ্রণে রোকেয়া-মানস পরিপুষ্ট।

উনিশ শতাব্দের শেষ পাদে বাঙালী মুসলমানের ভাষা-বিষয়ক প্রসঙ্গটি নানা জটিলতার সৃষ্টি করে। এই জটিল বিতর্কের নানা স্তরে জড়িত ছিল নানা আর্থ-সামাজিক প্রশ্ন, রাজনৈতিক অবস্থান নির্ণয়ের অভিলাষ ও স্বরূপ-সমাধানের অন্বেষা। উল্লেখ্য যে, বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা-প্রশ্নে কালক্ষেপনও হয়েছে অনেক। ক্রমে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই মুসলমান সাহিত্যিকদের মন থেকে মাতৃভাষা — বিতর্কের শেষ সন্দেহটুকু বিদূরিত হয় এবং পরিণামে বাংলা ভাষা সম্পর্কে গভীরতর চেতনা জাগে। দেশের একটি প্রধান সাহিত্যিক দলের চৈতন্য ও বিশ্বাসে বাংলা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হতে থাকে। এঁদেরকে বলা যায় উদার মানবিক। এঁরা অব্যাহতভাবে সাধনা করেন বাংলদেশে বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। এই সাহিত্যিক দলের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন রোকেয়া।[১৬] বিহারের বি-ভাষী স্বামীগৃহে এবং কলকাতার উর্দু-মাধ্যম স্কুলে রোকেয়ার বাংলা ভাষা-প্রীতি গভীরতর হয়। পিতা ও স্বামীর পরিবারে এবং পরে নিজের স্কুলেও উর্দুর অত্যাচারে তিনি ব্যথিত হয়ে উঠেছেন।[১৭] সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। সুদীর্ঘ ষোল বছরেও নিজের স্কুলে বাংলা শাখা চালু করতে না পেরে মর্মাহত রোকেয়া লেখেন ঃ

> ষোল বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন — অর্থাৎ তাহাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষতবিক্ষত হয়।[১৮]

ঐ বছরেই রোকেয়া তাঁর স্কুলে প্রথম বাংলার ক্লাশ শুরু করেন। বাংলা গদ্যেব একটা প্রমিত রূপ ছিল তখন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন স্বর্ণশীর্ষে। প্রমথ চৌধুরীর সৌরহিত্যে বাংলা কথ্যরীতির পূর্ণ বিজয় ঘোষিত হবার আগে বাংলা গদ্যের যে রীতি প্রচলিত ছিল, রোকেয়ার অনুসৃত রীতি তারই অনুরূপ। বঙ্কিমের মতে যাকে বলা হয় বিষয়ানুসারী। প্রধানত সাধু গদ্যের প্রতি রোকেয়ার আগ্রহ

অধিক। রোকেয়ার সাধু রীতি নিরাভরণ, সহজ ও অবাধ গতি সম্পন্ন। কথ্যরীতিরই নিতান্ত কাছাকাছি। কথ্যরীতিতেও রোকেয়ার কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা ও অভিভাষণ রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নিজের লেখায় টীকা-টিপ্পনি সংযোজনের প্রাচীন রীতিও রোকেয়া মাঝে মাঝে অনুসরণ করেছেন। কোন কোন রচনায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের উচ্চারণ ও অর্থও তিনি বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশ করেছেন।

মুসলমান সমাজে প্রচলিত বহু আরবী-ফার্সী শব্দের সঙ্গে অর্থব্যঞ্জনাপূর্ণ নতুন শব্দাবলীও তিনি সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন। উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে বহু দীর্ঘ উদ্ধৃতিও তিনি উপযুক্ত প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।[১৯]

আলাপচারিতা ও কথোপকথনের ভঙ্গী রোকেয়া-রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লেখার সূচনা ও উপসংহারে "পাঠিকাগণ"(পৃ ১৭), "পরিশেষে বলি"(পৃ ৩১), "মনে করুন" (পৃ ২৭) প্রভৃতি উচ্চারণের দ্বারা তিনি বক্তব্যকে জীবন্ত ও পাঠক-পাঠিকাকে সচকিত করেছেন।

অজস্র প্রবাদ-প্রবচন ও সুভাষণের প্রয়োগ রোকেয়ার ভাষা-রীতির আর একটি গুণ। তীক্ষ্ণ ও শানিত বুদ্ধির চমকে রচনার অনেকাংশ দীপ্ত। দ্রুত, অবসরহীন, সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থ গৌরবের মহিমামণ্ডিত বাক্য রচনার পর্যাপ্ত নিদর্শন রয়েছে রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে। (মুসলমান) নারীদের অবরোধ মোচন, শিক্ষার প্রসার ও স্বাধীনতা অর্জনের ঐকান্তিক প্রয়োজনে রোকেয়া বিভিন্ন সময়ে কিছু চিঠিপত্র লিখেছিলেন। অনেকগুলো চিঠির বিষয় হচ্ছে তাঁর স্কুলের নানা সমস্যা, তা সমাধানের পরিকল্পনা ইত্যাদি। এ জাতীয় চিঠিপত্রের সংখ্যা প্রায় ২০ খানা।

সামাজিক সচলতা সৃষ্টি ও সাংবাদিকতার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে দু'একটি চিঠিতে আলোকপাত করেছেন। 'দি মুসলমান' সম্পাদক মৌলভি মুজিবর রহমানকে লিখিত একাধিক পত্র এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।[২০]

রোকেয়া-রচনাবলীতে চিন্তার স্ববিরোধিতা এবং বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি রয়েছে — এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবত বহু প্রবন্ধের বিষয়ে অভিন্নতাই এর কারণ। অন্যত্র বক্তব্যে এবং উপসংহার রচনার সাদৃশ্য ঘটেছে কিছু কিছু। উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যকর্মের সীমাবদ্ধতা আর সৃষ্টিধর্মী রচনার অবাধ মুক্তির ব্যবধান মেনে নিলে, রোকেয়ার সাহিত্যকর্মকে তাঁর সমকালীন সমাজ ও মানুষের কাহিনী বলে গ্রহণ করা যায়। এ কালের তথ্যনিষ্ঠ সমালোচক রোকেয়ার সাহিত্য সাধনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে যথার্থই মন্তব্য করেন,

> বেগম রোকেয়ার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর ভাষার সারল্যে, ভঙ্গীর তীক্ষ্ণতায় এবং সুক্ষ্ম ব্যঙ্গে। মুসলমান লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন মীর মশাররফ হোসেন — সমাজ সমালোচনার উপায় স্বরূপ ব্যঙ্গ রচনা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু স্থূলতা ও অতিরঞ্জন থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেন নি এবং কোথাও কোথাও বিদ্বেষের ছাপ লেগেছে। বেগম রোকেয়াই বিদ্রূপের শানিত কশা নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে নামলেন এবং আঘাত করলেন ব্যক্তিকে নয়, সমাজের মনোবৃত্তিকে।[২১]

আমরা এ মন্তব্য সমর্থন করতে পারি।

তথ্যপঞ্জী

১. Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of Women, Reprinted (London, 1955), p 29.

২. D. M. Ketelbey, A History of Modern Times, (London, 1932), pp 55-56.

৩. গৌরী আইয়ুব, "গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা", 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা), কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ ৪৬।

৪. Marmaduke Pickthall, The Cultural Side of Islam, (Lahore, 1961), p 141.

৫. উদ্ধৃত, মোশফেকা মাহমুদ, "পত্রে রোকেয়া পরিচিতি", (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫), পৃ ৫।

৬. মুহম্মদ শামসুল আলম, "রোকেয়া ঃ কিংবদন্তী ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত", 'পাণ্ডুলিপি' (চট্টগ্রাম ঃ বাংলা সাহিত্য সমিতি, ১৩৯৩), পৃ ১৬ - ১৮।

৭. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), 'রোকেয়া-রচনাবলী' (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ ২৬।

৮. 'রো. র', পৃ ১৯ - ২০।

৯. ঐ, পৃ ২১।

১০. M. K. Gandhi, Women and Social Injustice (Calcutta, 1921), p 91.

১১. 'রো. র', পৃ ২৯ - ৩০।

১২. ঐ, পৃ ৫৪।

১৩. গোলাম মুরশিদ, "ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ ঃ বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তি ভাবনা" 'জিজ্ঞাসা', (কালকাতা, কার্তিক, ১৩৮৭), পৃ ৩২৭।

১৪. 'রো. র', পৃ ২৮২।

১৫. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত', (কলকাতা ঃ দে'জ পুনর্মুদ্রণ, ১৩৭৯), পৃ ৩৩৬।

১৬. কাজী আব্দুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', (কলকাতা ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩), পৃ ১৯৩।

১৭. 'রো. র', পৃ ২৮২।

১৮. ঐ, পৃ ২৮২।

১৯. 'রো. র', পৃ ৪৬, ৪৭, ৯২, ১০১, ১০৩, ১৫১, ২০৫, ৩৮৭, ৪০৫, ৪১৮, ৪৫৭, ৪৬৩. ৪৭৮।

২০. মৌলভি মুজিবর রহমান (সম্পাদিত), "দি মুসলমান", (কলকাতা ঃ ৬ ডিসেম্বর, ১৯২৬ ও ৮ ডিসেম্বর ১৯২৭)।

২১. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', (ঢাকা ঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪), পৃ ৪১৯

[ডিসেম্বর ৯, ১৯৯০ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদের সীতারাম সাকসেরিয়া সভাগৃহে প্রদত্ত । বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।]

রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা—২

কাজী আবদুল ওদুদ ঃ সাহিত্য ও জীবন দর্শন

স্বরাজ সেনগুপ্ত

এ যুগের বাংলা সাহিত্যে কাজী আবদুল ওদুদ একজন বিশিষ্ট গদ্য লেখক — তাঁর এই বিশিষ্টতা শুধু রচনাশৈলী ও ভাষার দিক থেকেই নয়, চিন্তা ও মননশীলতার দিক থেকে, মতবাদ ও জীবন-দর্শনের দিক থেকেও। আজকাল যাকে 'জনপ্রিয়' লেখক বলা হয় তা তিনি নন এবং তা তিনি হতে চাননি কখনো। সুখের বিষয় কাজী আবদুল ওদুদের মত দু'চারজন লেখক, অধুনা উপেক্ষিত এমন কি কিছুটা নিন্দিত 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের চর্চা করে থাকেন — যে সাহিতের উপজীব্য হল গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা ও মানবতা-বোধ।

শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্তি-নির্ভরতাই কাজী আবদুল ওদুদের রচনার বৈশিষ্ট্য। যুক্তিহীন কুসংস্কার ও বুদ্ধিহীনতার বিরুদ্ধে তিনি চিরসংগ্রামী। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় সমস্ত দেশ যখন দিশেহারা, দেশের সে দুঃসময়েও যুক্তিহীন ভাবাবেগে তিনি কখনো ছিন্নমূল হননি, হননি বিচলিত। ইংরেজিতে Rationalist বললে যা বোঝায় আমাদের সাহিত্যে ওদুদ ছিলেন তাই।

আধুনিক কবিতাই শুধু নয়, আধুনিক গদ্যও আজ অনেক ক্ষেত্রে জটিল হয়ে পড়েছে। অনেক রচনারই ভাবোদ্ধার প্রায় দুরূহ, এর কারণ সমারসেট্ মম্ যা বলেছেন মনে হয় তাই ঃ এঁরা লেখার আগে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করেন না, যতখানি ভাবার ততখানি ভাবেন না, লেখার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবেন। ফলে ভাব সুস্পষ্ট রূপ নিতে পারে না, লেখকের মন যা পারে না, পাঠকের মন তা কি করে পারবে? কাজী আবদুল ওদুদ এর বিপরীতধর্মী লেখক। তিনি যতখানি লেখেন তার অনেক বেশি ভাবেন এবং লিখতে বসার আগেই তিনি সেই ভাবনা সেরে ফেলেন। লেখা নিয়ে তিনি এত বেশি ভাবেন যে, লেখার আগেই তাঁর ভাষাও নাকি তাঁর মনে গড়ে ওঠে। সে ভাষা ও ভাব তাঁর মনের ভিতর কাগজে-কলমে রূপ নেওয়ার আগে, এত বেশি পুনরাবৃত্তি হতে তাকে যে তা তাঁর প্রায় মুখস্থ হয়ে পড়ে। ফলে এমন কি তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি মুখে মুখে শুনিয়ে দিতে পারেন। এভাবে ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ভাষাও গড়ে ওঠে, মনে মনেই চলতে থাকে তার মাজাঘষা। তাঁর বিশিষ্ট রচনাশৈলী এভাবেই রূপ গ্রহণ করে এবং তা

যে সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, এ বিষয়ে তখন তিলমাত্রও সন্দেহ থাকে না। আশ্চর্য, তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত পাঠক, রবীন্দ্রনাথের মুক্ত-বুদ্ধি ও সাহিত্যাদর্শের ঘনিষ্ঠ অনুসারী, শুধু রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলী থেকে তাঁর রচনাশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর — তবু তাঁর রচনাশৈলীর সঙ্গে অন্য কারো রচনাশৈলীর এতটুকু সাদৃশ্য নেই। বড় লেখকের এ এক বড় গুণ, তাঁদের ব্যক্তিগত মনোদর্শন যেমন স্বতন্ত্র তেমনি তাঁদের রচনাশৈলীও স্বতন্ত্র।

চিন্তা করার ভঙ্গি ও মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষারীতি গড়ে ওঠে। সব বড় লেখকের, জাত লেখকের স্বতন্ত্র চিন্তা পদ্ধতি ও মনোভঙ্গি রয়েছে — মনমানস ও মেজাজ থেকেই তার উৎপত্তি। সৌখিন লেখকদের পক্ষে পোশাকের ফ্যাশানের মতো ভাষারীতি-এর রদবদল সম্ভব হলেও খাঁটি মনোধর্মী লেখকের পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমাদের সব জাত লেখকের রচনার কথা মনে মনে স্মরণ করে দেখলে এঁদের রচনাশৈলীর নিজস্বতা সহজেই লক্ষ্যগোচর হবে। ভাষারীতির পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা যেন অনেকখানি স্বভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবদুল ওদুদের ভাষারীতি আবদুল ওদুদের স্বভাবেরই প্রতিফলন। বলাই বাহুল্য, তাঁর স্বভাবের মত তাঁর ভাষারীতিও গাম্ভীর্য, প্রত্যয় ও শালীনতারই প্রতিমূর্তি। Style is the man – এটি একটি মূল্যবান ও সার্থক উক্তি, আবদুল ওদুদ সম্বন্ধে এর সার্থকতা একেবারে অনস্বীকার্য।

আবদুল ওদুদের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও তাঁর মননশীলতার মূল্য বিচার করতে হলে তাঁর বেশ কিছু রচনার সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক। দু' একটি মাত্র প্রবন্ধ পড়ে তাঁর চিন্তা ও মানস-চেতনার পরিধি উপলব্ধি সম্ভব নয়। যাঁরা তাঁর একটি মাত্র বই পড়তে চান তাঁদের আমি 'শাশ্বত বঙ্গ' পড়বারই পরামর্শ দেব। এ গ্রন্থে সমাজ, দেশ, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে বহু মূল্যবান আলোচনা স্থান পেয়েছে, এসব আলোচনায় তাঁর জ্ঞানবত্তা ও পরিমিতিবোধ, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা এক অনন্যসাধারণ সুমার্জিত গদ্যে ফুটে উঠেছে। গদ্য সম্বন্ধে T.S. Eliot-এর মন্তব্য স্মরণীয়; "good prose cannot be written by a person without conviction." আবদুল ওদুদের গদ্য তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়ের ফল, তাই তা হতে পেরেছে এমনি জোরালো ও অনন্য। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ এবং আরো যাঁরা আমাদের ভাষায় সুসংহত ও জোরালো গদ্য লিখেছেন সবারই শক্তির উৎস-মূল হচ্ছে নিজ নিজ বলিষ্ঠ প্রত্যয়। আজ আমরা বিশ্বাসহীন, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আমাদের কারো নেই। মোটকথা আজ অধিকাংশ

বাঙালি-লেখকের কোন সুস্থ মতাদর্শ নেই। নেই কোন রকম সদর্থক জীবন-দর্শনের উপর সুদৃঢ় আস্থা। তাই এখন রম্যরচনার নামে লেখা হচ্ছে দেদার চটুল গদ্য। এ গদ্যের আয়ু 'সাংবাদিকতা'র চেয়ে বেশি হবে কিনা এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের কালের রচনায় বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান অভিজ্ঞতার অভাব নেই। কিন্তু এসব রচনা নিছক রম্যতা ছেড়ে কদাচিৎ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এও হতে পারে — জনপ্রিয়তার খাতিরে এঁরা হয়ত ইচ্ছে করেই প্রজ্ঞার পথে পা দেননি। কারণ প্রজ্ঞা-দীপ্ত সৃষ্টির পাঠক চিরকালই বিরল। আবদুল ওদুদ কিন্তু এ বিরল পথের পথিক। তাই তাঁর অধিকাংশ রচনায় প্রজ্ঞার দীপ্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু রম্য-রচনার জনপ্রিয়তার চোখঝল্সানো বৈদ্যুতিক আলোর কাছে এ দীপ্তিও হয়ে পড়ে নেহাৎ নিষ্প্রভ! তবু — Light is the one thing wanted for the world. Put wisdom in the head of the world, the world will fight its battle victoriously, and be the best world man can make it" — Carlyle. Light মানে ঐ প্রজ্ঞারই হীরক দ্যুতি। "With increase of wisdom our thoughts acquire a wider scope both in space and time" — Bertrand Russell. ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত দেশ ও জাতিগত সব রকম সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠার প্রজ্ঞার পরিচয় রয়েছে আবদুল ওদুদের রচনায়। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি কখনোই রেহাই দেননি, করেননি এতটুকু বরদাস্ত। তাঁর সম্বন্ধে অন্নদাশঙ্কর রায়ের এ উক্তিটি স্মরণীয় ঃ "সাম্প্রদায়িকতার এতবড় শত্রু দেশে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।"

দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, মননশীলতা ও সাংস্কৃতিক ভাবসাধনার সঙ্গে আবদুল ওদুদের পরিচয় অত্যন্ত গভীর। বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি যতখানি চেষ্টা ও অধ্যয়ন করেছেন তার তুলনা নেই, দেশের সব রকম ভাবসাধনার তিনি এক নিষ্ঠাবান পাঠক ও অনুশীলনকারী। 'বাংলার জাগরণ' এ বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান।

বাংলার নবজাগরণের প্রথম অগ্রদূত রামমোহন। পরম নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আবদুল ওদুদ রামমোহনের সাধনা ও চিন্তাধারার আলোচনা করেছেন; তার পরিণত রূপ রবীন্দ্রনাথ, তাই রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিশেষ অধ্যয়ন ও সাধনার বিষয়। দেশের অতীত ঐতিহ্য থেকেও মন খোরাক সংগ্রহ করে, এ ঐতিহ্যও লেখক-বিশেষের মনে শক্তি ও প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। মনের ভাণ্ডার ভরে তোলার এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই। বুদ্ধিজীবীদের জন্য মনের সম্পদ ও ঐশ্বর্য বাড়াবার এ হচ্ছে প্রথম ও আদি ক্ষেত্র। বহু আয়াসে, বহু পরিশ্রমে এ ঐতিহ্য আয়ত্ত করতে হয় —

শুধু আয়ত্ত নয় একে হজম করতে হয়, করতে হয় আত্মস্থ। "Tradition cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour". এ হচ্ছে ঐতিহ্য-প্রেমিক T.S Eliot-এর উক্তি। যেমন বিদেশকে না জানলে স্বদেশকে ভাল করে জানা যায় না, তেমনি অতীতকে না জানলে বর্তমানকে ভাল করে বোঝা যায় না; যায় না ব্যাখ্যা করা। তাই ইতিহাসের ধারা বুঝতে হয়। তাকে বহন করতে হয় শিরায় শিরায়। এরই নাম ঐতিহ্যবোধ।

বলেছি সাহিত্য-শিল্পের মূল কথা প্রজ্ঞা। কাব্যে, গল্প-উপন্যাস-নাটকে, যুক্তি তর্কের সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ। কাব্য ছন্দ, সুর ও নানা আলঙ্কারিক বিধি-নিষেধের দ্বারা আর গল্প-উপন্যাস-নাটক চরিত্র ও ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই ঐসব রচনায় প্রজ্ঞার বিশদ ব্যাখ্যা, যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তার প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ। গদ্য তথা প্রবন্ধই প্রজ্ঞার উপযুক্ত মাধ্যম। তাই অ্যারিস্টটল থেকে রবীন্দ্রনাথ সবাই প্রবন্ধের আশ্রয় নিয়েছেন। অত গল্প, উপন্যাস, কাব্য, সঙ্গীত, নাটক লিখেও যেন রবীন্দ্রনাথ মনের কথা মন খুলে বলতে পারেননি। প্রবন্ধের আশ্রয় নিতে হয়েছে। যুক্তি-তর্কই প্রবন্ধের প্রাণ, তার জন্য বিচারবুদ্ধি ও মননশীলতা অপরিহার্য (অবশ্য তথাকথিত রম্যরচয়িতাদের কথা স্বতন্ত্র। বিচার-বুদ্ধির চেয়ে লোকরঞ্জনই রম্যরচনার প্রধান লক্ষ্য)। ইউরোপীয় সাহিত্যেও এমন কোন মহৎ ভাবুক নেই, যিনি প্রবন্ধে নিজের মনের ভার লাঘব করতে চাননি। প্রচার-প্রিয় শ' যেমন লিখেছেন তেমনি প্রচার-বিমুখ ইয়েটস্ আর এলিয়টও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সনেটের ভাঙা দাঁড় বেয়ে ও গল্পের পাল উড়িয়ে প্রমথ চৌধুরীও তাঁর মননশীলতার সমুদ্রে কূল পাননি — প্রবন্ধের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রবন্ধ কিন্তু জনপ্রিয় সাহিত্য নয় — তার পাঠক সংখ্যা চিরকালই বিরল। বিশেষ করে আমাদের দেশে অনেক সাহিত্যিকও প্রবন্ধের নামে আঁতকে ওঠেন। অথচ যে কোন দেশের মন-মানসের, মননশীলতা ও জীবন-জিজ্ঞাসার পরিচয় বহন করে সে দেশের প্রবন্ধ সাহিত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি প্রবন্ধ-সাহিত্য ইংরেজ জাতির মননশীলতা ও জ্ঞান-সাধনার এক চূড়ান্ত পরিচয়। জাতির চিন্তা, ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সমস্যা বিশেষ করে মানসিক বিকাশের পরিচয় সাধারণত বিভিন্ন প্রবন্ধেই ফুটে ওঠে। ইংরেজিতে Intellectual culture বলতে যা বোঝায়, তা এবং তার ফলাফল প্রবন্ধই বহন করে। আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্য অনুন্নত, তার মানে আমাদের মেধাবুদ্ধি চর্চার মান অনুন্নত, পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। কাজী আবদুল ওদুদের বিভিন্ন রচনা ও প্রবন্ধে এ-যুগের মেধাবুদ্ধি চর্চার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস সেই পরিচয় নেহাৎ অগৌরবের নয়।

বাংলাদেশের যেটা সৃষ্টিশীল যুগ অর্থাৎ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ — এ যুগ সম্বন্ধে আবদুল ওদুদ এক রকম বিশেষজ্ঞ। ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণে ও তাঁর মূল্য বিচারে তাঁর সঙ্গে অনেকের হয়ত মতের অমিল হতে পারে। বলাবাহুল্য সাহিত্যের ব্যাপারে মতের মিল খুব বড় কথা নয়। ওদুদ সাহেব স্বাধীনভাবে, সব রকম পল্লবগ্রাহিতা বর্জন করে নিজের মতামত তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর রচনার এক বড় আকর্ষণ বহু বিষয়ে তাঁর অনন্য মৌলিকতা। গতানুগতিক চিন্তাধারার অনুসরণ তিনি করেননি — নূতন করে ভেবেছেন আলোচ্য সব বিষয়েই। ফলে তাঁর রচনা অন্যের চিন্তাকে নাড়া দেয়, ভেঙে দেয় অনেক পূর্বধারণা, পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে নূতন জিজ্ঞাসা। বাংলাদেশের এযুগের চিন্তাশীলদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কাজী আবদুল ওদুদের স্থান প্রথম সারিতে। রচনার বৈচিত্র্যে ও গভীরতার দিক দিয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। প্রমথ চৌধুরীর পরে এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে আর কেউ প্রবন্ধ লিখেছেন কিনা সন্দেহ। প্রমথ চৌধুরীর রচনার সরসতা অবশ্য আবদুল ওদুদের রচনায় নেই, তাঁর রচনা আরো গম্ভীর ও ভারী। প্রমথ চৌধুরীর কণ্ঠে সব সময় একটা চটুল পরিহাস ফুটে রয়েছে — ওদুদের রচনায় তাঁর অতলস্পর্শী গাম্ভীর্যের নীচে সব রকম পরিহাস পড়েছে চাপা, তাতে হালকা হাসি, চটুলতা এতটুকুও প্রবেশাধিকার পায়নি।

ইউরোপের রেনেসাঁস শুধু ইউরোপের নয়, সমগ্র পৃথিবীর জন্যই একটি স্মরণীয় ব্যাপার। এরপর থেকে ধর্মান্ধতা ও নানা কুসংস্কারের সীমা পেরিয়ে ইউরোপের মানব-বুদ্ধি বিদ্যার বিচিত্র পথে জয়যাত্রা শুরু করেছে — যুক্তিবাদ, মনুষ্যত্ববোধ ও আধুনিকতার রাজপথেই এ জয়যাত্রা। মানুষ যেন এবার থেকে নূতন করে নিজেকে আবিষ্কার করল — মানব-মনীষার বন্ধনমুক্তি ঘটল নানা বিচিত্র পথে, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও মনুষ্যত্ব চেতনায় তা নূতন করে সার্থক হয়ে উঠল এখন থেকে। গ্যেটে প্রতিভা এই রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ ফসল — নব মানবতাবাদের এক মহিমোজ্জ্বল প্রতীক। রেনেসাঁস বা নবজন্মের ফলে জাতীয় মনীষার কিভাবে বন্ধনমুক্তি ঘটে, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জার্মান জাতি। তার পরিচয় দিতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'কবিগুরু গ্যেটের' অবতরণিকায় লিখেছেন ঃ "একটা দেশের বা জাতির নবজন্মে, প্রতিবিম্বিত যেন বসন্ত ও বর্ষাব নৈসর্গিক প্রাচুর্য। বসন্তের আগমনে দেখা দেয় গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে লাখো পাখির আনন্দগান, বর্ষায় দেখতে দেখতে নদী নালা ভরে ওঠে উপরের নিরন্তর বর্ষণে; একটা জাতির নবজন্মকালে তেমনি একই সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান নবজন্মে দেখতে পাই —

চিত্রের ক্ষেত্রে এজর (Æser), ভিঙ্কল্‌ম্যান (Wincklemann), সঙ্গীতে মোৎসার্ট (Mozarat), বেটোফন (Bethoven), সাহিত্যে লেসিং (Lessing), ক্লপস্টক (Klopostock), ভীলাণ্ড (Wieland), হের্ডর (Herder), গ্যেটে (Goethe), শিলার (Schiller), শ্লেগেল (Schlegel); দর্শনে কাণ্ট, হেগেল, ফিক্‌টে, শোপেন-হাউয়র ইত্যাদি। এ-যেন দেখতে দেখতে গগন বিদীর্ণ করে দাঁড়ালো বিচিত্রশীর্ষ বিরাট পর্বতমালা। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ শৃঙ্গমালার উচ্চতম ও মহত্তমটির নাম গ্যেটে।'' ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে বাঙ্গালি সমাজেও রেনেসাঁস তথা নবজন্মের কিছুটা আভাস দেখা দিয়েছিল। ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙ্গালী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। ধর্মান্দোলন তথা শাস্ত্রের নবতর ব্যাখ্যায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ; সাহিত্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ; চিত্রকলায় রবি বর্মা থেকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল; বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা; ইতিহাসে রমেশ দত্ত, যদুনাথ সরকার, রমেশ মজুমদার; রাজনীতিতে ও দর্শনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন শীল, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায় — এমনি আরো বহুদিকে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর অর্থাৎ ইউরোপীয় বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে বাঙালি প্রতিভা নানা দিকে সার্থক হয়ে উঠেছিল। সি. ভি. রমন বাঙ্গালি নন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে বাংলাদেশে এবং এই নবজন্মের পরিবেশ ও আবহাওয়ায়। বাঙালি মনীষার এই বিচিত্র পর্বতমালা যে-কোনো জাতির পক্ষেই গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়। জার্মানির অনুকরণে এখানেও বলা যেতে পরে এই পর্বতমালার উচ্চতম ও মহত্তমটির নাম — রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের মুশকিল — আমরা পুরোপুরি মানুষ কখনো হতে পারিনি। আমরা আগে মানুষ না আগে হিন্দু বা মুসলমান, এ অদ্ভুত দ্বিধাদ্বন্দ্বে আমাদের সমাজ-মনের এক ত্রিশঙ্কু দশা। তাই বাংলার নবজাগরণের হাওয়া আমাদের গায়ে লেগেছে মাত্র, আমাদের চিন্তায় চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলেনি।

ওদুদ বিশ্বাস করতেন — রাজনৈতিক মুক্তি তো জীবনের বাইরের মহলের একটি খণ্ড দিকমাত্র। বুদ্ধির তথা মনের মুক্তি না ঘটলে অর্থাৎ অন্তরে যদি মানুষ মুক্ত-বুদ্ধি না হয় — এবং তা হতে হলে Intellectual culture অত্যাবশ্যক, যে culture এর মানদণ্ড, কার্লাইলের ভাষায় 'wise command, wise obedience'; — যে কোনো রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। এমন অবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সহায়ক না হয়ে, হয়ে পড়ে প্রবল বাধা। তাই রেনেসাঁস অর্থাৎ জাগ্রতচিত্ততা চাই। এই রেনেসাঁসের কিছু কিছু

কথা আবদুল ওদুদের বিভিন্ন রচনায় রূপ পেয়েছে। এই দিক দিয়ে আমাদের সমাজ-জীবনে ও সাহিত্যে তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

স্বাধীনতার আগে আমাদের জাতীয় জীবনে যতটুকু উদ্যোগ-আয়োজন, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধনা ও সংকল্পের রশ্মিরেখা দেখা দিয়েছিল, তার চিহ্নও এখন অবলুপ্ত। দেশের মাটি ও জল-হাওয়ায় তো কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের মনের মাটি ও জল-হাওয়ার অর্থাৎ মনের দৃষ্টিকোণ ও জীবন-বোধের। সাধনা ও অধ্যবসায়ের পথ ছেড়ে আমরা এখন সহজ সিদ্ধির (Shortcut) অর্থাৎ না পড়ে পণ্ডিত হওয়ার পথ ধরেছি। দেশব্যাপী Intellectual দারিদ্র্য ও মানসিক বন্ধ্যাত্বের এই তো এক বড় কারণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল ওদুদের রচনা এক অনন্য ব্যতিক্রম। সস্তা ভাব-বিলাসিতার পরিচয় তিনি কোথাও দেননি — বুদ্ধি, যুক্তি ও মননশীলতার স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর প্রতিটি রচনায়। আজ খাঁটি মননশীল রচনা অনেকখানি উপেক্ষিত, মননশীল রচনার সমঝদারি করতে হলে মন ও মস্তিষ্ককে যতখানি খাটাতে হয় ততখানি খাটাতে এই যুগে অনেকেই অনিচ্ছুক। তাই কাজী আবদুল ওদুদের রচনার যথাযথ মূল্য-বিচার এখনো অধিকারীর অপেক্ষায়।

জ্ঞানের তৃষ্ণাই জ্ঞান আহরণের প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। আমাদের মনে সেই তৃষ্ণার আজ একান্ত অভাব। তাই আমরা শুধু জ্ঞানবিমুখ নই, এমন কি উচ্চতর জ্ঞান-সাধনা তথা পাণ্ডিত্য আজ আমাদের কারো কারো কাছে বিদ্রূপের বিষয়। সব রকম culture-এর ভিত্তি কিন্তু সত্যিকার পাণ্ডিত্য। এই পাণ্ডিত্য তথা জ্ঞান-সাধনা ছাড়া রেনেসাঁসের স্বর্ণরেখা চিরকাল স্বর্ণমৃগই থেকে যাবে। J. A. Symonds লিখেছেন। "It was scholarship first and last, which revealed to men the wealth of their own minds, the dignity of human thought, the value of human speculation, the importance of human life regarded as a thing apart from religious rules and dogmas ..... The Renaissance opened to the whole reading public the treasure houses of Greek and Latin literature." আমাদের বেলাও এর ব্যতিক্রম হবে না। স্বাধীন যুক্তি বিচার ছাড়া কোনো জ্ঞান-সাধনাই সার্থক হতে পারে না। তাই কাজী আবদুল ওদুদের নেতৃত্বে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ এই যুক্তি-বিচারের পথে জ্ঞান-চর্চার একটু খানি 'শিখা' জ্বালাতে চেয়েছিল এবং এ প্রতিষ্ঠানের মটোই ছিল — 'বুদ্ধির মুক্তি।' আজকের দিনেও এ মটো বা আদর্শের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। মানুষকে জ্ঞানের চর্চা, বিচার বুদ্ধির চর্চা অব্যাহত রাখতেই হবে যদি জীবনে নব

নব সিদ্ধি তার কাম্য হয়। মানুষকে যে উন্নত জীব বলা হয়, তারও কারণ মানুষ বুদ্ধি-বিচারের অধিকারী বলেই। বুদ্ধি-বিচারকে বিসর্জন দিলে মানুষের অনেক আচরণই পশুর আচরণে গিয়ে ঠেকে। এই বুদ্ধি-বিবেচনাকে বাদ দিয়ে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যেরই নাম Revivalism. Revivalism-এর খপ্পরে একবার পড়লে আমাকে শুধু মানুষ হলে চলবে না, হতে হবে মুসলমান কি হিন্দু, তাতেও নিস্তার নেই — হতে হবে গোঁড়া মুসলমান অথবা গোঁড়া হিন্দু, অথবা গোঁড়া শিখ। ওদুদের এই ভাবনা-চিন্তা যে কতটা সত্য, তা তো আমরা এখন এদেশের প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাচ্ছি।

[জানুয়ারী ১১, ১৯৯২ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদের সীতারাম সাকসেরিয়া হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তরূপ। বক্তা ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক।]

বিস্মৃত-প্রায় বাঙালী মনস্বী কাজী আবদুল ওদুদ

রফি উদ্দিন

"এ দেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথরূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে, তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশ শক্তির বিশিষ্টতা।"

কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের। বলেছিলেন যাঁর সম্পর্কে তিনি কাজী আবদুল ওদুদ — আজ বিস্মৃত-প্রায় একজন বাঙালী মনস্বী। তাঁকে জানবার এবং জানাবার উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা আমাদের সবারই থাকবে — এটাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু তা যে ঘটেছে — এমন কথা কেউই বোধকরি বলবেন না। এ বঙ্গের বইবাজারে তাঁর কোনো বই মেলে না। ১৯৭০-এ তাঁর গ্রন্থাবলীর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তাঁরই স্মরণসভায়। ত'রপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত, অদ্যাবধি সে প্রস্তাব কার্যকর যে হয়নি, সেকথা বলাই বাহুল্য। সেই ১৯৭০-এ, তাঁর প্রয়াণের পরে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল বিভিন্ন পত্রিকায়। তারপর তাঁকে আমরা উদাসীনতায় ফেলে রেখেছি সময়ের গর্ভে। কাজী আবদুল ওদুদ আমাদের কাছে এক অনালোচ্য ব্যক্তিত্ব হয়েই রয়ে গেছেন। জীবদ্দশায় তাঁর বইয়ের সমালোচনা ছাড়া তাঁকে নিয়ে একটিমাত্র নিবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল, ওপার বাংলায়, ঢাকার 'সমকাল' পত্রিকায়। সেই একটিমাত্র, আর নয়। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'আশান্বিত মনে নমস্কার' করেছেন, সেই আবদুল ওদুদকে আমরা কেবল অবহেলাই দিয়েছি — এই নির্মম সত্যটি আজ নতমস্তকে স্বীকার করতে পারলে আমাদের লজ্জা, আমাদের অপরাধের ভার কিছুটা হয়তো কমতে পারে।

রামমোহন, কামাল আতাতুর্ক, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যেটের ভাবাদর্শে আমৃত্যু মানবতাবাদের জয় গেয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ। জীবনের

সব ক্ষেত্রে সব সময়েই পরিহার করেছেন চিন্তার সংকীর্ণতাকে, বদ্ধ সংস্কারকে। প্রাণকে দেখতে চেয়েছেন মুক্ত আলোর মত স্বচ্ছতায়। অন্ধ ধর্মমোহ থেকে মুক্তি ঘটুক মানবাত্মার, সে সমর্পিত হোক্ প্রকৃত ধর্ম-সত্তায়, ধর্মীয় উদারতায়, বোধের উদ্‌বোধনে — এই তিনি চেয়েছেন। ‘‘ধর্মকে যাঁরা — আগাগোড়া মোহ বলেন, তাঁদের মত আমরা গ্রহণ করিনা, কেননা জীবনের সার্থকতা ধর্ম-বোধে, অর্থাৎ সত্যে অথবা কোন আদর্শে সমর্পিত চিত্ততায়। - - - - প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়কে মোহ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ধর্ম-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কি দেশের চিন্তাশীল কর্মীদের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়?’’ - - - -

— এই তাঁর প্রশ্ন। এখানে ‘প্রকৃত ধর্মপ্রীতি’ প্রতিষ্ঠাকে জোর দিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে জাগ্রত হবে মনুষ্যত্ব, তার জীবন চর্চায় আসবে প্রেম, আসবে সহনশীলতা, তার হৃদয় ব্যাপ্ত হতে চাইবে অনাবিল প্রশান্তিতে। ব্যক্তিগত কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত ঈশ্বরকে ছেড়ে এক সর্বজনীন ঈশ্বরের সন্ধানে প্রবৃত্ত হবে সে। যে ঈশ্বরকে আপন স্বার্থে মানুষ কখনো শৃঙ্খলিত করতে পারে না। নিজের জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এ-বঙ্গে চলে এলেন কাজী আবদুল ওদুদ। এলেন মূলতঃ সারস্বত কর্মসাধনার কারণে। ১৯২১ সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে সবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেতন সেখানে বেশি। ডঃ শহীদুল্লাহ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ চলে গেলেন ঢাকায়। গেলেন অনেকেই, জন্মভূমি এ-বাংলা ছেড়ে। গেলেন না আবদুল ওদুদ। স্বভূমিতে ফিরলেন না। তিনি এ বঙ্গেই রয়ে গেলেন।

১৯২৬ এর জানুয়ারিতে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লার পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম সাহিত্য সমাজ। তৎকালীন মুসলিম সমাজের বদ্ধ চেতনার উপর আঘাত হেনে শুরু হল বুদ্ধি-মুক্তি আন্দোলন। এলেন কাজী আবদুল ওদুদ, এই আন্দোলনের অন্যতম নায়ক হয়ে। বার্ষিক মুখপত্র ‘শিখা’ এলো, যার মূল কথা — ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।’ মুক্তিকে সম্ভব করতে প্রয়োজন যে বুদ্ধির উন্মেষ, জ্ঞানের সহজাত এবং স্বচ্ছন্দ বিস্তার — মুসলিম সাহিত্য সমাজ সেইখান থেকেই পরিবর্তন সূচিত করতে চায়। হিন্দু সমাজের তীব্র ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কুসংস্কারের প্রাচীরে তখন প্রতিনিয়ত আঘাত হেনে চলেছে ‘ইয়ং বেঙ্গল’। প্রতিরোধের ঝড় উঠছে সর্বত্র, প্রাচীন পন্থীরা ক্ষিপ্ত। তখনই মুসলিম সাহিত্য সমাজ যেন আর একখানি ইয়ং বেঙ্গল হয়ে মুসলিম সমাজের বদ্ধ দেয়ালে আঘাত হানতে এগিয়ে এলো। এখানেও ক্ষিপ্ত হলেন রক্ষণবাদীরা। ইয়ং বেঙ্গল-এর মতই মুসলিম সাহিত্য

সমাজের বিপক্ষে উত্থাপিত হল ধর্ম-হীনতার অভিযোগ। তাতে একটুও ভীত না হয়ে তথাকথিত ধর্ম-হীনতার অভিযোগকে অক্লেশে মাথায় নিয়ে লক্ষ্যপথেই এগিয়ে গিয়েছে মুসলিম সাহিত্য সমাজ। এগিয়ে যাবার মন্ত্র দিয়েছে আপন জাতি-সমাজকে। যুক্তিবুদ্ধিহীন বিশ্বাসের আবর্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে — মানুষের মধ্যে মুক্ত জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়ে সুস্থ-সৌম্য মানবমুখী বোধবুদ্ধির উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতেই তার যাবতীয় প্রচেষ্টা। আর সেই প্রচেষ্টার শীর্ষভাগে থেকেই কাজী আবদুল ওদুদ — ধর্মের শাশ্বত নীতি-রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করেছেন মনুষ্যত্বের পূর্ণতার সাধনে। তাই বলতে পেরেছেন —

"বড় প্রয়োজন সৃষ্টিধর্মী নব নেতাদের। অতীতের প্রতি তাঁরা হবেন শ্রদ্ধান্বিত, তার পূজারী কখনো নয়। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সেইজন্য সুপ্রাচীন 'হিন্দু' ও 'মুসলমান'-এর মিলন তাদের কাম্য হবে না, কেননা তা অসত্য ও অসম্ভব; তাঁদের কাম্য হবে একটি নবজাতি গঠন — যার সূচনা নানাভাবে বহুকাল ধরে নানা দেশে হয়েছে, দেশের একালের জীবনের জন্য যার প্রয়োজনের অন্ত নেই। মনোজীবন ও রাষ্ট্রজীবন — দুই ক্ষেত্রেই অশ্রান্তভাবে চলবে তাঁদের সৃষ্টির কাজ। একালের যে ধর্মসম্প্রদায়গত রাষ্ট্রজীবন, — সেটি কদাচ তাঁদের সমর্থনের বিষয় হবে না। কেননা তার ফলে এদেশের অভিশাপরূপ জাতিভেদ নব নব সম্ভাবনা লাভ করে চলবে। তাঁদের সাধনার বিষয় হবে দেশের জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ, কেননা, তারই ভিতরে নিহিত রয়েছে দেশের রাষ্ট্রজীবনের, অথবা জীবনের সত্যকার বিকাশ সম্ভবনা।"

কেবল বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনই নয়; কেবল নবতর, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, ওদুদ প্রবৃত্ত ছিলেন সাহিত্য সৃষ্টিতে, পত্রিকা সম্পাদনায়। লিখেছেন উপন্যাস — 'নদীবক্ষে' ও 'আজাদ'। গল্পগ্রন্থ — 'মীর পরিবার', 'তরুণ'। লিখেছেন নাটক — 'মানববন্ধু' এবং 'পথ ও বিপথ'। এবং সর্বোপরি তিনি লিখেছেন বহু সংখ্যক প্রবন্ধ। এইসব প্রবন্ধ সাহিত্য বিষয়ে, বা সমাজ বিষয়ে, ও ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব, ধর্ম, রাষ্ট্র বা জাতীয়তা, কিম্বা ইতিহাস বা সংস্কৃতি বিষয়ে। চিন্তা সেখানে ক্ষুদ্রতাকে ভেঙেছে অবলীলায়। বলেছেন, "একালে চিন্তার বিশ্বজনীনতা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছে বলে। এই চিন্তার ক্ষেত্রে নূতন নূতন সম্ভাবনার কথা আজ মানুষ জ্ঞাতসারে মনে স্থান দিচ্ছে। ফলে প্রাচীন চিন্তাধারা তার চিত্তকে আর বন্দী করে রাখতে পারছে না — যেসব দেশে প্রাচীন ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী সেসব দেশেও নয়। - -

- - - সার্থক সমাজ-সত্তার দিক দিয়ে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ ভিন্ন যখন আর কিছু নয় তখন তার সাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ এই বিশাল সত্তার সঙ্গে তার গূঢ় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই — ঝরণার সার্থকতা যেমন নদীর পুষ্টি সাধন করে — এ সত্য যত অকপট ভাবে স্বীকার করা যাবে ততই শক্তি ও শ্রীলাভের পথে আমরা অগ্রসর হব।"

তাঁর কথা বলতে এসে এই সভায় এই সত্যকে সলজ্জ বিনয়ে স্বীকার করা সমীচীন মনে করি যে, তাঁর সম্পর্কে বেশি বলার জ্ঞানগম্যি আমার নেই। অকৌতুহলই এ অজ্ঞতার অন্যতম কারণ যেমন, তেমনই কারণ বইয়ের অভাবও বটে। আমরা, মফঃস্বলের পাঠক, যারা গ্রামের বা এলাকার লাইব্রেরির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকি; তালিকার খাতা তন্ন তন্ন করেও হতাশ হই। তাই আজ যদি এমন আশা নিয়ে ঘরে ফিরতে পারি যে, আগামীতে তাঁর গ্রন্থাবলী, তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্ম, তাঁকে নিয়ে বিদ্বজ্জনের আলোচনা আমাদের কাছে পৌঁছবে — তবে এটাই হবে এ সভা থেকে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। সময় এসেছে নতুন করে ভাবতে বসার। নতুন করে বুঝতে পারা - তাঁকে, তাঁর বলা কথাকে। তবে তখনই আমরা তাঁকে যথার্থ ব্যাপ্ত প্রাণের পরশ দিয়ে বিনম্র চিত্তে বলতে পারবো — নমস্কার।

(পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে পঠিত তরুণ গবেষকের ওদুদ-বিষয়ক ভাবনা)

কাজী আবদুল ওদুদ ঃ জীবন ও সাহিত্যকর্ম

শহিদুল ইসলাম

ভূমিকা ঃ কথা সাহিত্যিক রূপে কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যিক জীবন শুরু হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে। কাজী আবদুল ওদুদ প্রকৃত অর্থেই ভাবুক, চিন্তাবিদ ও জীবন-দার্শনিক। দুটি উপন্যাস, গোটা আষ্টেক গল্প এবং একটি নাটক লেখা ছাড়া তিনি সৃজনশীল সাহিত্যের পথ আর মাড়ান নি। কিন্তু তাঁর ১৮টি গ্রন্থে প্রবন্ধের সংখ্যা যেমন অসংখ্য তেমনি বিষয় বৈচিত্রেও ভরপুর। তাঁর সেই বিশাল চিন্তার জগতে দৃষ্টি না দিলে তিনি অনেকটাই অপরিচিতই থেকে যান। 'কবিগুরু গ্যেটে' ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের' অর্ন্তজীবনের পরিচয় লাভই যেমন ছিল ওদুদের 'কাঙ্ক্ষিততম' উদ্দেশ্য, ব্যক্তি ওদুদের যে মূল চিন্তাটি আমৃত্যু ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল তাঁর অন্তরে, সেটির সন্ধান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। 'একজন খাটিয়ে সাহিত্যিকের কথা' যাঁর আত্মজীবনীর নাম, তিনি সত্যিই একজন খাটিয়ে কর্মী — পরিশ্রমী সমাজ সংস্কারক। তিনি অনেক বিষয় নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, কিন্তু সব লেখাতেই উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের প্রতি তাঁর অশেষ মমতাবোধ ও অকুণ্ঠ আস্থা লক্ষণীয়। এক কথায় তাঁকে 'রেনেসাঁবাদী' বললে ভুল বলা হয় না। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি চোখে পড়ে, সেটাও এর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাহল, স্বীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের 'রেনেসাঁহীনতায়' তাঁর মনঃপীড়া। তবে মনোকষ্ট পেয়েই তিনি বসে থাকেন নি। ধর্মান্ধ ও রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে সারাজীবন 'রেনেসাঁর' বাণী প্রচার করেছেন শত প্রতিকূলতার মধ্যেও। কোরাণ-হাদিসের বাইরে যাদের চোখ যায় না, কোরাণ-হাদিস দিয়েই তাদের ঘায়েল করতে চেয়েছেন। সেখানে তিনি দয়ামায়াহীন, সবল প্রতিপক্ষের প্রতি আপোষহীন। এসব বাদ দিয়ে ওদুদের মূল্যায়ন সত্যিই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ওদুদকে নিয়ে ভাববার সময় তাঁর ভাবনা-চিন্তা জীবনাদর্শ সামনে রাখা দরকার এবং সেই জীবনাদর্শের আয়নায় নিজেদের বর্তমান চেহারাটাও একবার দেখা দরকার। প্রবন্ধের শুরুতেই এই ছোট্ট ভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল এ কারণে যে ওদুদের আলোচনায় আমি তাঁর কোন বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্বারোপ করতে চাই প্রথমেই তার সীমানা নির্ধারণ করতে চেয়েছি।

জীবনী ঃ পদ্মার ধারে নদীয়া সীমান্তে ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রামের একটি বনেদী কিন্তু সঙ্গতিহীন পরিবারে ওদুদের জন্ম ১৮৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল। পূর্ব পুরুষেরা অসাধারণ কেউ ছিলেন না। পিতামহ কাজী ইয়াসিন আলী লেখাপড়া জানতেন না। ভদ্রঘরের ছেলে, তাই নিজহাতে চাষাবাদ করতেন না। তবে পরিবারটি ছিল কৃষিনির্ভর। চিন্তাভাবনার ধার ধারতেন না — ঋণ করে ইলিশমাছ খেতে তাঁর বাধতো না। পিতামহী ছিলেন জাঁদরেল পার্সী-জানা মৌলবির মেয়ে, কিন্তু ধর্মভীরু যত — বুদ্ধিমতী, কর্মকুশলা ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্না তার চাইতে বেশী। পিতামহীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই পরিবারের সবার উপর সঞ্চারিত হয়েছিল বলে ওদুদ মনে করেন। পিতা কাজী সগীরউদ্দীন ছিলেন বুদ্ধিতে একান্ত খেয়ালী — কিন্তু অতি স্নেহময় অন্তঃকরণের; আত্মীয়স্বজনের দুঃখ আদৌ সহ্য করতে পারতেন না। সামান্য রেলের চাকুরে — আয় সামান্য কিন্তু পরিজনদের দান করতেন মুক্তহস্তে। কিন্তু ঢিলেঢালা মানুষটির আত্মসম্মানবোধ ছিল অসাধারণ। সাহেবদের সঙ্গে মারামারি করে চাকরি ছেড়েছেন বহুবার। ওদুদের বুদ্ধিমত্তা পছন্দ করতেন কিন্তু তাঁর শান্তশিষ্ট ভাবটি খুব একটা পছন্দ করতেন না। দর্শনা, সোদপুর, হাওড়া প্রভৃতি স্টেশনের 'মাষ্টারের' দায়িত্ব পালন করে হাওড়ার স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে ১৯২২ সালে প্রাণত্যাগ করেন। মা ছিলেন অতিশয় দৃঢ় চরিত্রের ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না কিন্তু কর্তৃত্ব অভিলাসিনী। পিতৃগৃহে ও মাতুলালয়ে বাল্যশিক্ষা শুরু। ছোট মামা বড় দারোগার বাড়ীতে থেকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯১৩ সালে দশ টাকার বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মামার পরামর্শে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিছুদিন জনৈক হিন্দু শিক্ষকের বাড়ীতে থাকেন। সে বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যায় সদ্য-প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলী' (১৯১০) থেকে গান গাওয়া হতো। সে গানে মুগ্ধ ওদুদ নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই 'গীতাঞ্জলী' কেনেন। সেই থেকে তিনি রবীন্দ্রানুরাগী। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভাল হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে স্বাদেশকিতা, ইউরোপীয় ভারতীয় সভ্যতার তারতম্য ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ ও চিন্তা করেন। তাঁর মাতুল ছিলেন ধর্মভীরু কিন্তু বিলাসীও। ওদুদ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু পনের-ষোল বছরেই তাঁর ধারণা হয় যে ওঁদের চিন্তা চলবে না। তাঁর বাবা-চাচা গোঁড়া ছিলেন না আদৌ বরং গোঁড়ামিকে উপহাস করার ধরণ তাঁর পূর্বপুরুষের কারো মধ্যে ছিল। প্রবেশিকা পাশের আগে রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি। কিন্তু তখনই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন 'ধর্মকে ভালবাসতে হবে কিন্তু গোঁড়ামি অচল।' ১৯১৭ সালে তিনি বি. এ এবং ১৯১৯

সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ পাশ করেন। এসব তথ্য ওদুদের ক্ষুদ্র আত্মজীবনী থেকে নেওয়া।[১]

কর্মজীবন ঃ এম. এ. পাশ করার পর ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রভাষকের পদটি পেতে তাঁর কোনই অসুবিধা হয়নি। কারণ ততদিনে তাঁর 'বিরাজ বৌ'-এর আলোচনা, 'সাহিত্যিকের সাধনা' ও 'মুসলমান সাহিত্যিক' তাঁকে প্রাবন্ধিক হিসেবে এবং 'মীর পরিবার' ও 'নদীপক্ষে' তাঁকে সাহিত্যিকের খ্যাতি এনে দিয়েছে। তাই শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শশাঙ্কমোহন সেন, প্রমথ চৌধুরীর অনুকূল মত জেনে দীনেশচন্দ্র সেন ওদুদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হয়ে উক্ত পদের জন্যে তাঁর পক্ষে সুপারিশ করেন। ঢাকায় শিক্ষকতার সময়ই শুরু হয় খেলায়ত-অসহযোগ আন্দোলন। ঐ আন্দোলন এবং রোমাঁ রোঁলার 'জাঁ ক্রিসতফ' তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। শিল্পী ওদুদের জীবনের মোড় পরিবর্তন শুরু হয়। শিল্পী ওদুদ হলেন 'জীবন জিজ্ঞাসু' ওদুদ।[২] তাঁর নবজীবনের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে 'নবপর্যায়' নামক প্রবন্ধ সংকলনের প্রকাশের মধ্যদিয়ে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ঢাকায় যোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষকতার পর ১৯৪০ সালে বাঙলা সরকারের টেক্সট্ বুক কমিটির সম্পাদক হয়ে তাঁর কলকাতায় আগমন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানী বোমার ভয়ে সরকারের শিক্ষাদপ্তরটি রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গনে স্থানান্তরিত হলে ওদুদকেও রাজশাহী যেতে হয় ১৯৪২ সালে। এখানে বসেই তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'কবিগুরু গ্যেটে' (১৯৪৬) লেখার কাজ প্রায় শেষ করেন। রাজশাহী কলেজের উপাধ্যক্ষ, 'তে হি নো দিবসা' গ্রন্থের লেখক ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনের সঙ্গে ওদুদের অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। সেন লিখছেন "তিনি (ওদুদ) সুবক্তা এবং 'বুদ্ধির মুক্তিতে' বিশ্বাসী। মনে হয় গোঁড়া মুসলমানরা তাঁহাকে তেমন পছন্দ করিতেন না, কিন্তু সম্প্রদায় নির্বিশেষে যুবক সমাজে তাঁহার অনুগামীর অভাব ছিলনা"।[৩] যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ সালে পুনরায় কলকাতা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানালে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে থাকাই নিরাপদ মনে করেন।[৪] বিশের দশকের ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের একজন সক্রিয় সংগঠক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁকে বলে দেয় যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনাসমৃদ্ধ বড় মাপের কোন মানুষকে ধারণ করার ক্ষমতা সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের নেই। তাঁর সে সিদ্ধান্ত যে ভুল ছিল না পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসই তার প্রমাণ। পাকিস্তানে

যেকোন সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ হয়েছে স্তব্ধ। একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত উর্দু কথাসাহিত্যিক 'আগ কি দরিয়ার' লেখক কুরৎ-উল-আইন হায়দার দীর্ঘকাল পাকিস্তানে বসবাসের পর ১৯৬১ সালে পাকাপাকিভাবে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। সৈয়দ মুজতবা আলীর ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তাই তাঁর মৃত্যুর পর 'দেশ'-এর বিশেষ সংখ্যায় অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছিলেন "তাঁর মতো মানুষের পক্ষে পাকিস্তান হতো গোরস্থান"।[৫] কথাটা যে কতবড় সত্যি আমরা যারা পাকিস্তানী প্রজন্ম তারা ভালভাবেই বুঝেছি। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশে ঢাকা এলে ওদুদকে অবশ্যই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হতে হতো কারণ তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করেন নি এবং ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে দেশভাগের সমর্থকও ছিলেন না। পাকিস্তানী আবহাওয়ায় 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' লেখা সম্ভব হতো কিনা, অন্নদাশঙ্কর রায়ের সে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের প্রীত করেনি তাঁর প্রমাণ প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ স্পষ্টতই বলেছেন 'পনর বছর খেটে মুসলিম সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে লিখলে তিনি হয়তো আমাদের জন্য স্মরণীয় কিছু রেখে যেতে পারতেন"।[৬] পনর বছর খেটে গ্যেটে লেখার এই প্রতিক্রিয়া! 'শাশ্বতবঙ্গ' প্রকাশের পরও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল পত্র-পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। তাঁর প্রতিবাদও করেন ওদুদ।[৭] ১৯৫১ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সমগ্র সময় লেখার কাজে নিয়োগ করেন। ১৯৭০ সালের ১৯ মে এই কর্মবীরের জীবনাবসান হয়।

সৃজনশীল কথাসাহিত্য ঃ তাঁর প্রথম রচনা 'বিরাজ বৌ'-এর সমালোচনা ছাপা হয়েছিল 'ভারতবর্ষে'।[৮] কলকাতায় এম. এ পড়ার সময় তাঁর গল্পগ্রন্থ 'মীর পরিবার' (১৩২৫) 'নদীবক্ষে' উপন্যাস (১৩২৬) প্রকাশিত হয়। এম. এ পাশ করে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' বাড়ীতে মোহাম্মদ আফজালুল হকের কক্ষে কিছুদিন বাস করেন। প্রায় একই সময়ে করাচী থেকে এসে কাজী নজরুল এসে ওঠেন একই বাড়ীতে কমরেড মোজফ্‌ফর আহমেদের কক্ষে। প্রতিদিনের সাহিত্যিক আড্ডায় এখানে তাঁর সঙ্গে নজরুল ইসলাম, মোজফ্‌ফর আহমেদ, মু. শহীদুল্লাহ, কাজী ইমদাদুল হক, শশাঙ্কমোহন সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, কান্তি ঘোষ, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওদুদের সাহিত্যিক জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'মীর-পরিবার' প্রকাশের পর শরৎচন্দ্র

ও কবি শশাঙ্কমোহন সেন লেখককে উৎসাহিত করেন। উপন্যাস 'নদীবক্ষে' ওদুদ চাচাতো ভাই-বোনের, লালু ও মতির, বিয়োগান্ত প্রেম উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন সমাজের যে নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন, সে সংগ্রামের কাহিনী পাঠে অভিভূত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখককে কৃতজ্ঞতা জানান।[৯] উপন্যাসটি পাঠ করে সৈয়দ এমদাদ আলী লেখকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা ব্যক্ত করে তাঁকে 'রবীন্দ্রপন্থী' বলে উল্লেখ করেন।[১০] 'পথ ও বিপথ' তাঁর একমাত্র একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালে। নাট্যকার 'কোন্‌টি জীবনের পথ আর কোন্‌টি মৃত্যুর পথ' সে কথাটিই বলতে চেয়েছেন। সেই সময়ের হিন্দু-মুসলমানের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা নাট্যকারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। নাট্যকার নাটকের মধ্য দিয়ে অখণ্ড ভারতের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[১১] লেখকের 'আজাদ' উপন্যাসটির প্রকাশকাল যদিও ১৯৪৮, লেখক বিশের দশকের শুরুতেই উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।[১২] গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ও 'জাঁ ক্রিসতফ' উপন্যাসখানি তাঁকে 'আজাদ' লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল, লেখক জানিয়েছেন ভূমিকায়।

মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্য ঃ জীবন জিজ্ঞাসাই ওদুদের মনকে আমৃত্যু সক্রিয় রেখেছিল। তাঁর বিশাল প্রবন্ধের সমারোহের যেমন সীমা নেই, তেমনি নেই জিজ্ঞাসার বৈচিত্র্যে ও গভীরতায়। সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন কোনো অঞ্চল নেই, যেখানে তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখ পড়েনি। সমকালের সবকিছুই তাঁর বিচারাধীন হয়েছে এবং তাঁর encyclopedic প্রতিভার সাহায্যে সেসবের চুলচেরা বিচার করে রায় ব্যক্ত করতে তিনি বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। মুসলিম সমাজের পশ্চাদপদতা ও রক্ষণশীলতার প্রতি তিনি যেমন ছিলেন নির্দয়; আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে ইতস্তত করেন নি, তেমনি পাশের বৃহত্তর ও অগ্রসর হিন্দু সমাজের অনুদারতা ও কূপমণ্ডুকতাকেও আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি। ওদুদ চিন্তায় ছিলেন মুক্ত ও সংস্কারহীন, তেমনি তার প্রকাশও ছিল অকপট ও নির্ভীক। তাই ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে তাঁর ৭টি প্রবন্ধের সংকলন 'নবপর্যায়' বের হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বিতর্কের ঝড় তোলে।[১৩] বিভিন্ন পত্রিকায় বইটির যেমন প্রশংসাসূচক আলোচনা বের হয়, তেমনি 'মোহাম্মদী' 'মোসলেম ভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় মোঃ আকরাম খাঁর নেতৃত্বে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ বইটির নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় খণ্ড 'নবপর্যায়'তে ৯টি প্রবন্ধ ছাপা হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। বইটি সম্পর্কে 'সওগাতে'র

মন্তব্য "প্রত্যেক মোসলমান— যাহারা বাস্তবিকই সমাজের কথা চিন্তা করেন — তাহাদের এই পুস্তকখানা পাঠ করা উচিত'।[১১] ১৯২৪ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী সম্মিলনীর ১৩৩১ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ওদুদ রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে একটি ধারবাহিক প্রবন্ধ পাঠ করেন যেটি পরে পরিমার্জিত হয়ে 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়। ১৯২৭ সালে এটি 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে — রবীন্দ্রনাথ তা পাঠ করে তাঁকে এক পত্রে অভিনন্দন জানান।[১৫] বইটি পাঠক সমাজেও সমান সাড়া জাগায়। অন্নদাশঙ্কর রায় 'তাঁর সৌন্দর্য সচেতন রসমগ্ন সুফীভাবের গভীরতায়' ওদুদকে 'সাহিত্য বিচারক' হিসাবে শ্রদ্ধা শুরু করেন।[১৬] পক্ষপাতহীন সত্যকথা বলার আর একটি নজির তাঁর পরবর্তী প্রবন্ধ সংকলন 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রকাশ পায় ১৩৪১ এর আশ্বিনে। আবদুল কাদির ও শ্রীচারুচন্দ্র দত্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[১৭] ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে হায়দারাবাদের নিজামের এক লক্ষ টাকা দানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে 'মুসলিম সংস্কৃতি' কেন্দ্রস্থাপন করে 'নিজাম-বক্তৃতার' প্রবর্তন করেন এবং প্রথম বক্তা হিসেবে কাজী ওদুদকে আমন্ত্রণ জানান। বিষয়টি ছিল সে যুগের (এযুগেরও) জটিলতম সমস্যা 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ'। ১৯৩৫ সালের ২৬,২৭ ও ২৮ মার্চ রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে বিরাট বক্তৃতায় অনেক কিছুর সঙ্গে ওদুদ মহাত্মা গান্ধীর 'মুসলমান গুণ্ডা আর হিন্দু কাপুরুষ' এইমত খণ্ডন করে প্রমাণ করেন যে গুণ্ডার ভাব ও কাপুরুষতার লক্ষণ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমভাবে উপস্থিত। ওহাবী আন্দোলনকে মুসলমানদের পশ্চাদ্‌গামিতার কারণ — প্রমাণ করেন। কারণ সে আন্দোলনের চরিত্র ছিল অতীত-মুখী। যখন রেঁনেসার অবগাহন ছিল অতি জরুরী তখন ওহাবী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় উন্নতিকামী জাতীয়তাবাদী চেতনা আধুনিক মুসলিম জগতে বর্জিত হচ্ছে।'[১৮]

১৩টি প্রবন্ধ নিয়ে 'আজকের কথা' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলার মুসলমানের কথা' সম্পর্কে দু-চারটা কথা বলতে হয়। আঠার শতককে তিনি ভারতীয় মুসলমানের জন্য এক গভীর চেতনাহীনতার শতক বলে চিহ্নিত করেন। কারণ "মধ্যযুগে মুসলমান বিজয়ের প্রভাবে হিন্দু সমাজে দেখা দিয়েছিল পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধের অভাব ও ধর্মাচারের আধিক্য; উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ বিজয়ের প্রভাবে মুসলমান সমাজে দেখা দিল নৈরাশ্য ও মাত্রাতিরিক্ত ধর্মাচার প্রীতি।"[১৯] ধর্মনাশের ভয়ে ও ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানরা দীর্ঘদিন ইংরেজি শিখতে এগুলো না। তাঁরা বুঁদ হয়ে রইল অষ্টম শতাব্দীর ইমাম আবু হানিফার বিচারবাদের মধ্যে "কোরআনের কোনো উক্তি

সম্বন্ধে 'কেন' — এই প্রশ্ন করা চলবে না। কোরআনে যা আছে, যেভাবে আছে তাই-ই মানতে হবে।"[২০] ওদুদ একে বিচারবিরোধী মত বলে চিহ্নিত করেন।[২১] তাই গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'একটি ঐতিহাসিক চরিত্র'-এ সুলতান মাহমুদ ও তাঁর অনুসারীরা যে তাঁদের প্রিয় ইসলামের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি, তা তিনি প্রমাণ করেছেন তাঁদেরকে কোরআনের কয়েকটি বাণীর লঙ্ঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত করে।[২২] অথচ তাঁরই দরবারে নজরবন্দী জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আলবেরুনীকে 'ধর্মযুদ্ধ' ও 'কাফের পীড়ন' সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। ওদুদ প্রবন্ধের শেষে প্রশ্ন রেখেছেন 'মুসলমানদের কাছে কোনটি আজ তাদের গতিপথ — সুলতান মাহমুদের? না আলবেরুনীর?

১৩৩৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে ওদুদ গ্যেটে সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তারই পরিবর্ধিতরূপে 'কবিগুরু গ্যেটে' নামে দুই খণ্ডে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। 'নিবেদনে' লেখক বলছেন 'বাংলার একালের জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে গ্যেটের যোগ নিবিড়। ...অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের যে নব মানবিকতার সাধনা — New Humanism – পাশ্চাত্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল গ্যেটে আর প্রাচ্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ যার ব্যাপকতম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে।"[২৩] এ সম্পর্কে কোনই ভুল নেই যে বাঙলা ভাষায় গ্যেটের উপর এমন অসাধারণ গ্রন্থ আর রচিত হয়নি। অন্নদাশঙ্কর রায় গ্যেটেকে ওদুদের 'জীবন দিশারী' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন "এ গ্রন্থ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বোধহয় ভারতীয় সাহিত্যে অপূর্ব।[২৪]"১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় 'নজরুল প্রতিভা'। ৩টি প্রবন্ধের এই বইটির দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'প্রতীক প্রীতি'তে 'নজরুল প্রতিভায় একই সঙ্গে ইসলাম প্রীতি আর প্রতীক প্রীতি কেন দেখা দিল' তার বিচার করে ওদুদ কবির 'প্রতীক প্রীতি'কে রেনেসাঁধর্মী বলে মনে করেন।

'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকার অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ আলোকে লেখা "Modern Bengali Literature' দিয়ে শুরু হয়েছে তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'Creative Bengal' - প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। লেখক স্পষ্ট ভাষায় তাঁর চিন্তা বইটির ভূমিকায় ব্যক্ত করেছেন।[২৫] ১৯৪৯ সালে সহপাঠী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেই কবিতাসহ ছয়টি প্রবন্ধের সংকলন 'স্বাধীনতা দিনের উপহার' জাতিকে উপহার দেন ১৯৫১ সালে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। সে স্বাধীনতাকে 'আরো প্রাণপদ আরো নির্ভরযোগ্য' করার আবেদন রেখেছেন লেখক ভূমিকায়।[২৬] তাঁর বহুল প্রশংসিত ও প্রচারিত

'শাশ্বতবঙ্গ' প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৮। পূর্বপ্রকাশিত ৮টি গ্রন্থ ও পনেরটি নতুন প্রবন্ধের এই সুবিখ্যাত সংকলনটি পাকিস্তানে কখনও প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে বইটির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে ব্র্যাক। পাকিস্তান-আমলে বইটি সেখানে ছাপা না হওয়ার কারণ পাঠকদের অজানা থাকার কথা নয়। পাকিস্তানে তাঁর ভাগ্যে কি জুটতো এই একটি ঘটনাই তার দিক নির্দেশনা। 'নিবেদনে' লেখক অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে দেশভাগকে কি চোখে দেখেছেন, তা উল্লেখ করতে ইতস্ততঃ করেন নি।[২৭]

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত ছয়টি লিখিত বক্তৃতা সংকলিত হয়ে 'বাংলার জাগরণ' নামে প্রকাশ পায় পৌষ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে। উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁকে তিনি চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার এই বইটিতে। জাগরণের অর্থ তাঁর কাছে 'পরকালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ যখন ইহকালের দিকে ভাল করে তাকিয়েছিল, তখন সূচিত হয়েছিল রেনেসাঁর।''[২৮] জীবন সম্বন্ধে মানুষ নতুন আশাআনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে, প্রাচীণ জ্ঞান ও কাব্যকলা নবজীবন লাভ করে এবং ধর্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে জাগে নবতর চেতনা। নবজন্মের দৃষ্টিতে তখন সবকিছুই নতুনভাবে দেখতে শেখে মানুষ। ওদুদ-রামমোহনের কলকাতাবাস (১৮১৫-১৬) থেকে বাঙলার নবজাগরণের শুরু মনে করেন। 'ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে বিচার' থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে ওদুদ-ভট্টাচার্য ও রামমোহনের ধর্মবোধের পার্থক্য নির্দেশ করতে চান।[২৯] ধর্ম বলতে রামমোহন যে নৈতিক বা আত্মিক উন্নতি বিশেষভাবে বুঝতেন তার পরিচয় রয়েছে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে ডঃ ডাফের কাছে তিনি যে উক্তি করেন, তাতেও "সব রকমের যথার্থ শিক্ষা হওয়া চাই ধর্মানুগত।" তবে রামমোহনের কাছে ধর্মজীবন অন্য অর্থ বহন করে। "অকপট সত্যাশ্রয়িতা আর জগতের সঙ্গে নিবিড় প্রেমের যোগই" তাঁর কাছে ধর্মের অর্থ। হাফিজের নিম্নোক্ত ফার্সী বয়েতের মধ্যে ধর্মের যে ভাবটি ফুটে উঠেছে, রামমোহন ও ওদুদের কাছেও ধর্ম সেই অর্থই বহন করে ঃ

'ধর্ম জীবের সেবা ভিন্ন আর কিছু নয়
জপমালা, আলখেল্লা ও আসনে ধর্ম নেই।'[৩০]

'তুহ্ফাতুল মুত্তহ্হিদীন' (একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার) গ্রন্থের আরবী ভাষায় লেখা ভূমিকা থেকেও দীর্ঘ উদ্ধৃতির উল্লেখ করে ধর্ম সম্বন্ধে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি আরো পরিষ্কার করতে চান।[৩১] ওদুদ প্রমাণ করতে চান, ধর্মচিন্তার সঙ্গে যখন পরিবর্তনশীল পৃথিবীর পরিবর্তনশীল আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস,

রীতিনীতির মিশেল দেওয়া হয়, এককথায়, দৈনন্দিন ইহজাগতিকতার সঙ্গে যখন ধর্মতত্ত্বকে যুক্ত করা হয়, তখনই বিপর্যয়ের শুরু। ইউরোপের নবজাগরণ ধর্মমত ও ইহজাগতিকতার দীর্ঘদিনের এই বন্ধন ছিন্ন করে। বাঙলায় রামমোহনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সেই নবজাগরণের সূত্রপাত।

কিন্তু সময়ের অগ্রযাত্রার সঙ্গে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙলার সে ধারা কিভাবে পরিবর্তিত হয় এবং উনিশ শতকের শেষপাদে এসে অসামান্য সৃষ্টিধর্মের অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে তা কিভাবে প্রবল 'হিন্দু ঐতিহ্য গর্বে' পরিণত হয় ওদুদ অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তার ঐতিহাসিক গতিপথ অঙ্কন করেন। 'সৃষ্টিধর্মী উৎকৃষ্ট চিন্তার স্থানে' 'হিন্দু-ঐতিহ্য গর্ব' স্থান পাওয়াকেই ওদুদ বঙ্কিমের সবচেয়ে — 'মারাত্মক দুর্বলতা' বলে চিহ্নিত করেন। কেননা 'ঐতিহ্যগর্ব মানুষকে কিছু সচেতনতা দিলেওশেষ পর্যন্ত তাকে প্রতারিত করে, কেননা ঐতিহ্যগর্ব মানুষের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিশক্তি দিতে পারে না বরং বাড়িয়ে চলে তার অন্ধ আবেগ।'[৩২] তাই 'উগ্রজাতীয়তা ইউরোপে প্রলয় ঘটিয়েছে, আমাদের দেশেও এরই মধ্যে খণ্ড প্রলয় ঘটিয়েছে।' চতুর্থ বক্তৃতায় উনিশ শতকীয় জাগরণে মুসলমানের সরে থাকার কারণও যোগ্যতার সঙ্গে অনুসন্ধান করেছেন। নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী এবং আমীর হোসেনের প্রচেষ্টায় শতাব্দীর শেষপাদে মুসলমানদের মধ্যে যে ইংরেজি শেখার কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয় তার বড় ত্রুটি ওদুদ নির্দেশ করেছেন এই বলে যে ইহজাগতিক স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় তাদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় লাভের প্রয়োজন পড়েছিল। কিন্তু ''নতুন শিক্ষাকে সত্যই কার্যকরী করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ছিল যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির, সে বিষয়ে তারা আদৌ সচেতন হয়নি।''[৩৩] বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ওদুদ সে জীবনবোধের উন্মেষ লক্ষ্য করেন বর্তমান শতকের বিশের দশকের ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মধ্যে। তবে বিচার-বিশ্লেষণ করে ওদুদের সিদ্ধান্ত 'বাংলার জাগরণ বিপর্যস্ত হয়েছে।'[৩৪] একথাটা আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন আবদুল কাদিরের কাছে লেখা চিঠিতে।[৩৫] তবে ক্ষুদ্রতার মৃত্যু ঘটিয়ে ধর্মবর্ণজাতপাত-নির্বিশেষে বাংলার ও ভারতের জনগণ আবার নবজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত হবে, সূর্যের দিকে মুখ ফেরাবে, এ আশা তাঁর আন্তরিক।[৩৬]

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'শরৎ স্মৃতি' বক্তৃতামালার চারটি বক্তৃতা সংকলিত করে 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৬১। শরৎ পরবর্তী ৩১ জন কথাশিল্পী নিয়ে কথা বলেছেন

লেখক। তাছাড়া পূর্বপাকিস্তানের কথাসাহিত্যের উপরও সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন।[৩৭] রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ১৭ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি 'Tagore's role in the re-construction of Indian Thought' নামে প্রকাশিত হয়। 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৩৬৯ ও ১৩৭৬ সালে। বইখানির প্রশংসা করে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন।[৩৮] ১৩৭৩ এর বৈশাখে 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে' প্রকাশ করেন "হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম"। প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। ১৩৭৩ ও ১৩৭৪ সালে প্রকাশিত হয় 'পবিত্র কোরআনে'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

ঢাকা বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ওদুদ রচনাবলীর ২য় খণ্ডে 'রাজনৈতিক পত্রাবলী'তে ওদুদের ৮টি চিঠি ছাপা হয়েছে। সবগুলি চিঠিতেই সমকালীন সমস্যাগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেলেও, তার মধ্যেও ওদুদের রেনেসাঁ-ভেজা মনের প্রকাশ ঘটে। আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ' সম্পর্কে মৌঃ আকরাম খাঁ 'মোহাম্মদীতে' যে আপত্তিকর রুচিহীন মন্তব্য করেন, তারই জবাবে ওদুদ প্রথম চিঠিটি লেখেন।[৩৯] দ্বিতীয় পত্রটি আবদুল কাদিরকে লেখা। কাদির স্বদেশী আন্দোলন ও ওহাবী আন্দোলনকে এক পর্যায়ে ফেলে 'জয়তী'র সম্পাদকের পাঁজিতে — যে মন্তব্য করেন, ওদুদ তাতে আপত্তি তোলেন এবং ঐ দুই আন্দোলনের প্রধান পার্থক্য নির্দেশ করেন।[৪০] তৃতীয় পত্রটিও কাদিরকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠি। এখানেও মূলত রেনেসাঁর আলোকেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সমস্যাটি ডিঙ্গিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন বা সমস্যাটিকে দেখার চেষ্টা করেছেন।[৪১] মানুষের 'সৃষ্টিক্ষমতার' উপর ওদুদের অগাধ বিশ্বাস। সেইজন্য বারবার তিনি মানুষের 'সৃষ্টিক্ষমতার' কথা বলেছেন। এই ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান কেবল স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সাথে প্রতিযোগিতায় নামবে, ওদুদ তা সমর্থন করতে পারেন না। তাই 'নির্বাচন প্রসঙ্গে' চিঠিতে তিনি কাদিরকে লেখেন যে Inferiority complex-এর বড় বিপদ।[৪২] একমাত্র সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয়েই যে ছোটদল সমাজে উঁচুস্থান দখল করতে পারে, তা প্রমাণ করতে ইউরোপের ইহুদী সম্প্রদায়ের উদাহরণ টেনেছেন। দুর্বল প্রতিপক্ষ হয়েও তাদের 'সৃষ্টিক্ষমতা' তাদের উঁচুস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। ওদুদ মনে করেন 'হিন্দুদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ স্বীকার করে', নিয়েও ত স্বীকার করতে হবে যে তারা আলোর পথে, জীবনের পথে পা বাড়াতে চেয়েছে, কিন্তু

মুসলমান? "যারা সামান্য লাভের আশায় ক্ষমতার কাছে চির অবনত শির অথবা গোঁয়ার তারাই আজো তার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা, যারা জ্বলজ্যান্তভাবে কাণ্ডজ্ঞানহীন, নীতিহীন, এমনকি শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সেই বুভুক্ষের দল আজো তার ধর্মজীবনের নেতা, আর তার সাহিত্যের আসরে রুচিহীন অর্ধশিক্ষিতের দল আজো প্রবল- প্রতাপ।"[৪৩] কতবড় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তিনি ছিলেন তা আজকের উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। 'বুলবুল' পত্রিকায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধের জবাবে ওদুদ লিখছেন 'ইসলাম সম্বন্ধে আপনার যা ধারণা তা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে শ্রদ্ধেয় এবং সত্য দুই-ই। কিন্তু একে যদি ঐতিহাসিক সত্যরূপে ভাবেন তবে আপনার মতের সঙ্গে অনেকের অমিল হবে। ঐতিহাসিক ইসলাম আর একালের ভাবুকদের ইসলাম যে পুরোপুরি এক নয়, সে কথাটা আপনি তেমন মনে রাখেন নি।... ধর্মমাত্রই মোটের উপর Symbolism — কাজেই কোনো না কোনো রকম প্রতীক চর্চা — অন্যকথায় প্রতিমা পূজা। ...এটা যে একান্ত নিরর্থক তাও হয়তো সত্য নয়। প্রেমবোধের সঙ্গেও এর যোগ দৃঢ়। ...প্রতীক চর্চা বা প্রতিমা পূজা অভিশাপগ্রস্থ হয় তখন যখন এটি হয়ে ওঠে বিশেষ প্রতিমার বা বিশেষ পদ্ধতির অন্ধপূজা।"[৪৪] এ চিঠিতেও তিনি ওহাবীদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেন।[৪৫] তাই ওদুদ মনে করেন "প্রত্যেক ধর্মই কোনো না কোনো যুগে বিশেষভাবে কল্যাণ অভিসারী ছিল। কিন্তু কালে কালে সব ধর্মই আচার পূজা হয়ে গেছে। সৃষ্টি ধর্মের উপর জোর দিলে 'ধর্ম'কে এই অনর্থ থেকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হতে পারে।" তাঁর মতে 'ধর্ম হচ্ছে প্রত্যয়ীভূতজ্ঞান।'[৪৬] তাই ওদুদ সিদ্ধান্ত দেন "হিন্দু-মুসলমান মারামারি করছে ধর্মভাবের অধীন হয়ে নয়, ধর্মভাবকে বিসর্জন দিয়ে, তথাকথিত ধার্মিকতা নিয়ে অর্থাৎ আচার অনুষ্ঠানের একান্ত পূজারি হয়ে।"[৪৭]

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও 'শিখা' ঃ ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' প্রতিষ্ঠা বাঙালি মুসলমান সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেননা এই 'অভূতপূর্ব' ব্যাপারটি যখন ঘটে, তখন ঢাকার মুসলিম সমাজ একশ' বছর আগে কলকাতার হিন্দু সমাজের মতই রক্ষণশীলতার দুর্গে বাস করছিল। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মধ্য দিয়ে যাঁরা 'বুদ্ধির মুক্তি' ঘটাতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ 'বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্ত' করে মুসলিম সমাজকে রেঁনেসার পথে আনতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও রক্ষণশীল অভিজাতশ্রেণীর হাতে নাজেহাল ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (১৮৮৫-১৯৬৯)

সভাপতিত্বে 'সমাজের' গোড়া পত্তন হয়। সম্মুখে দেখা না গেলেও এই সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন 'তিন কাজী; কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কাজী আনোয়ারুল কাদির (১৮৮৭-১৯৪৮) এবং কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১)। এঁরা তিনজনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। 'সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আবুল হুসেন ও কাজী ওদুদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ধর্মান্ধ ও রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে রেনেসাঁর আলো জ্বালানোই ছিল এর প্রথম ও প্রধান কাজ। এই রেনেসাঁর বাণী তাঁরা আহরণ করেছিলেন হজরত মোহাম্মদ, রামমোহন, কামাল আতাতুর্ক, রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোঁলা ও শেখসাদী প্রমুখের কাছ থেকে।

ওদুদের 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থে জানা যায় সম্পাদক আবুল হুসেনের একটি বক্তব্য নিয়ে ঢাকার রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যায়।[৪৮] এছাড়া কাজী ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' এবং আবুল হুসেনের "নিষেধের বিড়ম্বনা" প্রবন্ধ দুটি ছাপা হলে ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ে।[৪৯] ঢাকার মুসলমান সমাজ তপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলিম হলে 'সাহিত্য সমাজের' সভা নিষিদ্ধ হয়। 'মোহাম্মদী' ও 'ছোলতানের' প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় তাঁদের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে বিষোদগার চলতে থাকে।[৫০] ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার খান বাহাদুর মৌঃ কাজেমুদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকীর বাড়ীতে বিচার সভা বসে। আসামী আবুল হুসেন ও কাজী ওদুদ। আবুল হুসেন ত্রুটি স্বীকার করতে রাজী হলেও ওদুদ রাজী হন না।[৫১]

ওদুদ তাঁর দিনলিপির ৪-১-২৮ তারিখে লিখছেন 'শুনলাম মোহাম্মদীতে আমার সম্বন্ধে যে গালাগালি বেরিয়েছে, তা পড়ে, এখানকার কয়েকজন লোক উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে দু'জন এই প্রতিজ্ঞা করে যে তারা যদি আমার মাথা না নেয় তাব নবীর শাফায়েৎ পাবে না।"[৫২] পরপরই 'জাগরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কৈফিয়তে' আবুল হুসেন বলেন 'হজরতকে আমরা ধর্ম ও নৈতিক জীবন যাপনে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করবো, কিন্তু আধুনিক ও ভবিষ্যৎ জীবনধারার সকল বিষয়েও তাঁকে চরম গুরু বলে ধরলে আমরা নব নব সমস্যার নব নব সমাধান উদ্ভাবণ করতে পারবো না। কারণ আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক প্রয়োজন প্রতিদিন পরিবর্তন লাভ করছে। সে প্রয়োজন মিটাতে হবে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি খাটিয়ে। কিন্তু তা না খাটিয়ে তার সমাধান যদি তাঁর মহাজীবনে খুঁজিতে যাই, তাহলে বিফল মনোরথ হবই।"[৫৩] ওদুদও দুঃখ করে বলেন "কোরআনের সম্মোহন বাস্তবিকই প্রবল। সে কুয়াশার ঘোর

মুসলমানদের উপর থেকে কতদিনে যে ঘুচে যাবে তা জানি না''[৫৪] ''আকরাম খাঁ ও দলীলউদ্দিন দুজনারই যুক্তি কোরআনে আছে — অতএব সত্য-মুসলমানরা মানতে বাধ্য। ..এত অন্ধ যে সমাজের প্রধানেরা তার আর আশা কি? মুসলমান সমাজ অর্ধসভ্যের সমাজ। এখানে মুর্খ পণ্ডিতের উপরে, মুর্খের ভয়ে পণ্ডিত ভীত। কিন্তু এই ভীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। সেই-ই ধর্ম।''[৫৫]

এই লাঞ্ছনা, জীবনের ভয় আর সন্ত্রাসের মধ্যে 'সাহিত্যসমাজ' পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে পেরেছিল মাত্র তিন বছর। এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে নজরুল যোগ দিয়েছিলেন এবং এর আদর্শ ও আবেদনের অর্থপূর্ণতা উপলব্ধি করে উল্লসিত হয়েছিলেন।[৫৬] এর বাৎসরিক অধিবেশন আরো সাত বছর হয়। দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র। 'শেষের দিকে বৃহত্তর দেশে সাম্প্রদায়িক অবনিবনা আর শতকরা পঁয়তাল্লিশ আদি ধ্বনির প্রভাব এতবেশী হল যে 'সাহিত্য সমাজের' মত অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাবের প্রতিষ্ঠান অর্থহীন হয়ে পড়ল।'[৫৭]

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব' এই মুখবাণী বুকে ধারণ করে 'সাহিত্য সমাজের' বার্ষিক মুখপত্র পর পর পাঁচ বছর প্রকাশিত হবার পর তার অকালমৃত্যু ঘটে অনিবার্য কারণে। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে প্রথম সংখ্যায় বলা হয় ''শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন।'' রক্ষণশীল সমাজের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও ওদুদ মনে করেন ''মুসলিম সাহিত্য সমাজ' সেইদিন বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাবই বিস্তার করেছিল — তবে কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কিনা, তা জানা যাবে ভবিষ্যতে।''[৫৮] ওদুদের সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের কাছে এর উত্তর কি?

টীকা ঃ

১. 'কাজী ওদুদের জীবনকথা' — কাজী সাহেব তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জীবন কথা লিখেছিলেন চিঠির আকারে, ময়মনসিংহের উৎফুল্ল রায় নামক একজন তরুণ লেখকের অনুরোধে ১৩৫৮ সালে ১৪ই বৈশাখের কিছু পূর্বে। উৎফুল্ল রায় 'ব্যক্তিগত অংশটুকু' বাদ দিয়ে তাঁর 'আজেবাজে' পুস্তক ছাপান। প্রকাশকাল ২২ শ্রাবণ ১৩৫৮। ঢাকার 'লোকায়ত' পত্রিকার ১৯৮৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

সেখান থেকে আবদুল হক (সম্পাদিত) ঃ কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা ভাদ্র ১৩৯৭ তে স্থান পায়। পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৩৭।

২. ঐ পৃষ্ঠা - ৩৩৬।

৩. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন ঃ 'তে হি নো দিবসা' ঃ সাহিত্য সংসদ কলকাতা প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৪ পৃষ্ঠা - ২১৩।

৪. খোন্দকার সিরাজুল হক ঃ 'কাজী আবদুল ওদুদ' ঢাকা ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ পৃঃ ২০-২১

৫. অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ 'দেশ' বিশেষ সংখ্যা ১৯৭০ ঃ উদ্ধৃতি ঃ খোন্দকার সিরাজুল হক 'প্রাগুক্ত' পৃঃ ২১। রায় আরো লেখেন "সেখানকার (ঢাকার) মানসিক আবহাওয়ায় 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ'ও কি লিখতে পারা যেত? তাঁর দ্বিতীয় মহৎ কীর্তিও পাকিস্তানে প্রতিকূলতা পেতো। আর তাঁর দ্বিতীয় মহৎ কীর্তি 'কবিগুরু গ্যেটে' যদি অবিভক্ত বঙ্গে লেখা না হতো তা হলে পাকিস্তানে বসে সে-খানিও লেখা দুস্কর হতো। তাঁর মতো মানুষের পক্ষে পাকিস্তান হতো গোরস্থান। সেইজন্যে পাকিস্তানের বিবিধ প্রলোভন তিনি সবলে উপেক্ষা কবেছেন। ফলে তিনি তাঁর লেখার সংকল্প পূর্ণ করতে পেরেছেন।"

৬. 'বাতায়ণ' (ঢাকা ১৯৬৭) পৃঃ ৩৪৬। উদ্ধৃত খোন্দকার সিরাজুল হক 'প্রাগুক্ত' পৃঃ ৫২-৫৩।

৭. খোন্দকার সিরাজুল হক 'প্রাগুক্ত' পৃঃ ৩৭-৩৮। ওদুদের চিঠিটি ১৯৫৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি 'ওদুদ সাহেবের সাফাই' নামে 'আজাদ'-এ ছাপা হয়। ওদুদ লিখছেন " মাহে নও - এ সনেট সম্পর্কে কবি আবদুল কাদিরের যে উপভোগ্য রচনা বেরিয়েছে, তার এক তীব্র সমালোচনা সম্প্রতি আপনার কাগজে দেখলাম। এমন সমালোচনা সাহিত্য ক্ষেত্রে আদৌ নূতন নয়, আর এর মূলে কি সব গূঢ় কারণ আছে, আমার মতো অপাকিস্তানীর সে-সম্বন্ধে কৌতুহল না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আলোচক আমার প্রতি অতি অপ্রসন্ন। তাই দুই-একটি কথা বলতে হচ্ছে। ...আলোচক বলেছেন, আমি আবদুল কাদির সাহেবের গুরু আর আমি পাকিস্তান-বিরোধী, অতএব...। শুনেছি আমার সম্বন্ধে এমন মন্তব্য আপনার পত্রে কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। আমার বিনীত নিবেদন — আমার সম্বন্ধে এ-ধারণাটি পুরোপুরি সত্য নয়। যে সময়ে পাকিস্তানের

পরিকল্পনা চলছিল, তখন আমি তার বিরোধী ছিলাম একথা সম্পূর্ণ সত্য। তেমনি একথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, ভারত ও পাকিস্তানের বহু দায়িত্ব সম্পন্ন নেতার সম্মতিক্রমে যখন দেশ বিভক্ত হলো, তখন তা আমি পুরোপুরি মেনে নিই। ..'শাশ্বত বঙ্গে'র প্রতিশব্দ অখণ্ড বঙ্গ নয়। এ সম্বন্ধেও আপনার আলোচকদের কিঞ্চিৎ অবহিত হবার প্রয়োজন আছে মনে হয়।''...

৮. কাজী আবদুল ওদুদ 'বিরাজ বৌ' (চরিত্র-বিবৃতি) 'ভারতবর্ষ' চৈত্র ১৩২৩।

৯. ''আপনার 'নদীবক্ষে' উপন্যাসখানিতে চাষীগৃহস্তের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরলতা ও নতুনত্বে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। এই কারণে আমার কৃতজ্ঞতা জানিবেন।'' ১৩২৬, ১৬ই বৈশাখ। এই আশীর্বাণীসহ উপন্যাসটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে।

১০. সৈয়দ এমদাদ আলী 'সওগাত' অগ্রহায়ণ ১৩২৬ পৃঃ ৮৪।

১১. ভূমিকায় তিনি বলেন ''বাংলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, গুজরাটের চাইতে ভারতবর্ষই আজ তাদের সত্যকার স্বদেশ কেননা তাদের একালের জীবনের ধাত্রী হবার যোগ্যতা বিশাল ভারতবর্ষেরই আছে, কোনো প্রদেশেরই নেই।'' খোন্দকার সিরাজুল হক 'প্রাগুক্ত' পৃষ্ঠা ৬৯-৭০

১২. নানাকথা (দিনলিপি)'র ২৪-১-১৯২৪তে লিখছেন ''ভাবছিলাম 'আজাদ' আবার লেখা শুরু করবো।'' ওদুদের জীবনের মোড় পরিবর্তনের সময় উপন্যাসটির লেখা বন্ধ হয়ে যায়। ভূমিকাতে লেখক নিজেই বলছেন ''নবপর্যায়'' প্রভৃতি রচনায় মন দেওয়ায় ' আজাদের' পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

১৩. প্রবন্ধগুলি পাঠ করে উত্তেজিত রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধকারকে তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন ''এতে তাঁর মনের জোর, বুদ্ধির জোর, কলমের জোর একসঙ্গে মিশেছে। গোঁড়ামির নিবিড় বিভীষিকার ভিতর দিয়ে কুঠার হাতে তুমি পথ কাটতে বেরিয়েছ, তুমি ধন্য।'' খোন্দকার সিরাজুল হক 'প্রাগুক্ত' পৃঃ ৬০।

১৪. 'সওগাত' কার্তিক ১৩৩৬ পৃঃ ২১৩-২১৪।

১৫. ''আমার রচনার এমন সরস বিচারপূর্ণ সমাদর আর কারো হাতে লাভ করেছে বলে আমার মনে পড়ে না। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাষা

নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা বিস্ময়কর। তোমার মত পাঠক পাওয়া কবির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়।" 'জয়তী' বৈশাখ ১৩৩৭, বিজ্ঞাপন। খোন্দকার সিরাজুল হকের গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৩-২৪।

১৬. অন্নদাশঙ্কর রায় 'দেশ' ১১ই আষাঢ় ১৩৭৭ পৃঃ ৯৫৫-৫৬।

১৭. 'দেশের একজন সত্যকার সন্তান হিসাবে বিচিত্র সমস্যা সম্পর্কে এমন মোহমুক্ত আলোচনা ও সেসবের ভবিষ্যৎ সমাধানের পথ এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ আমাদের নানা চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে কিছু আলোকপাত করিবে নিশ্চয়ই।" কাদির 'ছায়াবীথি' চৈত্র ১৩৪১ পৃঃ ৪৬৪। শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত এক দীর্ঘ আলোচনায় লেখকের 'দরদের' কথা উল্লেখ করে বলেন 'সে দরদে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নেই। তাহা উদার, মুক্ত আকাশের মত উদার। লেখক স্পষ্ট কথা বলিতে কোথাও দ্বিধা করেন নাই। লেখক বঙ্কিমকে অসহিষ্ণু ইত্যাদি বললেও তাঁর ভাষা এত সংযত, এমন ভব্য ও মার্জিত, যে তাহা পড়িয়া কাহারও মনে ব্যথা লাগিতে পারে না।" পরিচয় ঃ কার্তিক ১৩৪২ পৃঃ ৩১২-১৬ দেখুন খোন্দকার সিরাজুল হক পৃঃ ৬৬-৬৭।

১৮. বইটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এদেশের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূর দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথরূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেইসঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সুক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলা ভাষায় তাঁর প্রকাশ শক্তির বিশিষ্টতা।" গ্রন্থের 'নিবেদনে' ওদুদ বলেন, "এই গুরু বিষয়ের আলোচনায় আমি অগ্রসর হয়েছি জ্ঞানের স্পর্ধায় নয় — দুঃখের তাড়নায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত আশীর্বাদী আমার সেই সামান্য প্রয়াস মহিমান্বিত করেছে।" বইটির প্রকাশকাল ১৩৪২ বঙ্গাব্দ। বইটি পড়ে বিনয়কুমার সরকার বলেন "ওদুদ সকল প্রকার শাস্ত্র নিষ্ঠার যম। তাঁর প্রাণের কথা হল সৃষ্টিকার্য, সৃষ্টিধর্ম।" উদ্ধৃত ঃ খোন্দকার সিরাজুল হক 'প্রাগুক্ত' পৃঃ ৬৮-৬৯।

১৯. কাজী আবদুল ওদুদ 'বাংলার মুসলমানের কথা' 'শাশ্বত বঙ্গ' ব্র্যাব প্রকাশনা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৩ পৃঃ ১১০।

২০. ঐ পৃঃ ৯৯।

২১. ঐ পৃঃ ৯৯।

২২. যেমন 'ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ।' (২ ঃ ২৫৬); আল্লাহ্ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না। পাছে তারা অজ্ঞতাবশতঃ সীমা অতিক্রম করে আল্লাহ্কে গালি দেয়।' (৬ ঃ ১০৯) 'শাশ্বত বঙ্গ' পৃঃ ১৫৭-১৫৮।

২৩. কাজী আবদুল ওদুদ 'কবিগুরু গ্যেটে' (চরিতকথা ও সাহিত্য পরিচয়) প্রথম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

২৪. অন্নদাশঙ্কর রায় 'আধুনিকতা' কলিকাতা ১৯৫২ পৃঃ ৬ উদ্ধৃত ঃ খোন্দকার সিরাজুল হক পৃঃ ৭২।

২৫. "Emancipation of the intellect and Humanism are perhaps the basic thoughts on which the essays of the collection try to take their stand; and the thoughts are intimately connected with the questions of enlightenment and progress in India and Pakistan ... We are now deep in the age of Totalitarianism and Fanaticism . the voice of reason and humanism sounds today feeble indeed .. ...the story of Creative Bengal in the story of resurgent India and East, May the resurgence be a thing of joy for mankind". প্রকাশক ঃ থ্যাকার স্পিঙ্ক এ্যান্ড কোং লিঃ ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট কলিকাতা। ১৯৫০।

২৬. লেখক বলছেন, "এই শুভ দিনে — যেন আমাদের মন উন্মুখ হয় স্বাধীনতার সদ্য আহৃত ফল উপভোগের দিকে নয়। সেই স্বাধীনতাকে নিকটে ও দূরের, স্বদেশের ও বিদেশের সকলের জন্য আরো প্রাণপদ আরো নির্ভরযোগ্য আরো মহৎ করবার কাজে।" গ্যেটেবাদী ওদুদ বেদবাক্যের মত গ্যেটের 'জীবন আর স্বাধীনতা তারই লভ্য ও ভোগ্য যে প্রত্যহ নতুন করে জয় করে এ দুটি।' এখানেও উচ্চারিত। খোন্দকার সিরাজুল হক পৃঃ ৭৫।

২৭. 'দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশঙ্কিত বিড়ম্বনা ভোগ এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। দেশের একালের জাগরণের এক পরিণতিরূপেই আমাদের লাভ হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কিন্তু সেই স্বাধীনতা লাভের পুণ্যক্ষণে দেশের (ভারতবর্ষের ও পাকিস্তানের) অগণিত লোকের যে আত্মিক অপঘাত ঘটলো তাতে সেই অশেষ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ স্বাধীনতাও আজ

হয়ে পড়েছে রাহুগ্রস্থ।'' 'শাশ্বত বঙ্গ' নিবেদন।

২৮. কাজী আবদুল ওদুদ 'বাংলার জাগরণ' ওদুদ রচনাবলী ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃঃ ২।

২৯. ''ভট্টাচার্যের চোখে ধর্ম মুখ্যত একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অনুসরণ, এরূপ পদ্ধতির অনুসরণে মানুষের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কিছু হবে কিনা সেটি যেন তাঁর ভাবনার বিষয় নয়, ধর্মকর্ম যেন মন্ত্রপ্রয়োগ করে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা — একটা তুক্তাকের ব্যাপার। অপর পক্ষে রামমোহন তাকাচ্ছেন, ধর্মকর্ম একটি সদ্‌যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কিনা সেদিকে, বিশেষ করে তাতে অনুষ্ঠাতার নৈতিক সমুন্নতির সম্ভাবনা আছে কিনা।'' রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০।

৩০. কাজী আবদুল ওদুদ 'প্রাগুক্ত' পৃঃ ১৪।

৩১. ভূমিকায় রামমোহন লিখছেন ঃ তিনি পৃথিবীর অনেক দেশে ভ্রমণ করেছেন এবং সর্বত্রই দেখেছেন জগতের একজন কর্তা ও পালয়িতা আছেন এ বিষয়ে লোকেরা একমত। কিন্তু কি তাঁর স্বরূপলক্ষণ কোন্ ব্যাপার বৈধ কোন্ ব্যাপার অবৈধ, এসব ব্যাপার সম্পর্কে লোকেরা একমত নয়। তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এক শাশ্বত মহাসত্তার সন্ধানী হওয়া যেন মানুষের স্বভাবগত, আর সেই বিশেষ বিশেষ রূপের কথা ভাবা, বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর উপাসনা বা গুণকীর্তন করা, এসব মানুষের শিক্ষালব্ধ ব্যাপার। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকে একে অন্যের মতের দোষ ধরে, কিন্তু ভুলে যায় তাদের দলের আচার্যরাও অন্যান্য মানুষের মত ভুলভ্রান্তির অধীন ছিলেন। এসব আলোচনা করে রামমোহন মন্তব্য করেন ঃ তাহলে আমাদের বিচার্য দাঁড়ায় — হয় সব ধর্মমতই সত্য, না হয় সব ধর্মই অসত্য। কিন্তু ধর্মমতগুলো পরস্পরবিরোধী, সেইজন্যে সব ধর্মমত সত্য হতে পারে না, আর এরূপ ক্ষেত্রে কোনো একটিকে সত্য বলা পক্ষপাতিত্ব করা। কাজেই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় ঃ সব ধর্মের মধ্যেই কিছু কিছু ভ্রান্তি আছে। বিভিন্ন ধর্মমতের ভিতর ভুল কিভাবে আছে, মধ্যবর্তী অবতার-পয়গম্বরআদির ধারণা কি ভাবে অযৌক্তিক, তুহ্ফাতে সেই সবই সংক্ষেপে কিন্তু অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে। ...তুহ্ফাতের একটি অংশের মর্ম এই ঃ সব ধর্ম আত্মা ও পরকালে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; যদিও এই দুয়ের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় তবু এতে বিশ্বাস তেমন দোষই নয়, কেননা মানুষ দুষ্কর্ম

থেকে নিরস্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাজভয়ে। কিন্তু এই দুই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের সঙ্গে পান আহার, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে কত শত অকল্যাণকর বুদ্ধিনাশকর বিশ্বাস সম্মিলিত হয়েছে ও তাতে মানুষের দুঃখ বেড়ে গেছে।' ওদুদ রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩-১৪।

৩২. কাজী আবদুল ওদুদ 'রচনাবলী' পৃঃ ৭২।

৩৩. ঐ পৃষ্ঠা ৮৯।

৩৪. ঐ পৃষ্ঠা ১৪২।

৩৫. "ভারতের মধ্যযুগের মুক্তিসাধনাকে ব্যাহত করেছে আওরঙ্গজেব ও রামদাস প্রমুখ সনাতনীদের চিন্তা ও কর্ম, এ যুগের রামমোহনের শ্রেষ্ঠতর মুক্তিসাধনা খণ্ডিত হয়েছে অভিমানী বঙ্কিমচন্দ্র ও সনাতনী রামকৃষ্ণ গান্ধীর দ্বারা।" আবদুল্লাহ্ আল-আজাদ 'জয়তী' শ্রাবণ ১৩৩৭, রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫১।

৩৬. "নতুন করে সঞ্জীবন হোক সেই অমূল্য জাগরণ বাংলার ও ভারতের আন্তরিকতম প্রার্থনার ভিতর দিয়ে — সঞ্জীবিত হোক তার সার্থকতমরূপে।" 'বাংলার জাগরণ' রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪২।

৩৭. কাজী আবদুল ওদুদ 'শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর', ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ ৭ই ফাল্গুন, ১৮৮২ শকাব্দ। মুখবন্ধে বলছেন "জীবনের খুব বড় অংশ হচ্ছে সমসাময়িক জীবন। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও 'সনাতন', 'চিরন্তন' এ সবের দাবি যত বড় 'সমসাময়িকের' দাবি তার চাইতে কম নয় — সাহিত্য ক্ষেত্রে তো যে সমসাময়িকের মধ্যে চিরন্তনকে না বুঝেছে সে কিছুই বোঝেনি। অর্থাৎ জীবনকে যে চায়, সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার উপায় তার জন্য নেই।"

৩৮. কাজী মোতাহার হোসেন 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০ পৃঃ ১১৭-১২০। হোসেনের মতে "ওদুদ সাহেব বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের সকল গল্পের, সকল কাব্যের, সকল পত্রের, সকল কথার, সকল ভাবের, হুলিয়ানামা দেবার দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছেন।" তবে এই দুঃসাহসিক কাজের মধ্য দিয়ে ওদুদ রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেছেন, জানিয়েছেন ওদুদ বইটির ভূমিকায়।

৩৯. 'সাপ্তাহিক সওগাত' ২য় বর্ষ ২৮শ সংখ্যা ২৯ নভেম্বর ১৯৫৯। রচনাবলী, পৃঃ ১৪৬।

৪০. "স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা বৃহত্তর দেশের economic resource-এর ইত্যাদির কথা যত অল্পই হোক ভেবেছিলেন, তাই সঙ্কীর্ণতাসত্ত্বেও তা Nationalist আন্দোলন, কিন্তু ওহাবী আন্দোলন মূলত Religious আন্দোলন অথবা বিজিতদের একবার গা ঝাড়া দেওয়ার চেষ্টা।" জয়তী জৈষ্ঠ্য ১৩৩৭, রচনাবলী, পৃঃ ১৪৬-১৪৮।

৪১. ওদুদের মনে হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব দেশের মানসলোকে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে। কারণ তাঁর সন্ন্যাসীসুলভ অবাস্তব প্রীতি একালের রাষ্ট্রজীবনের অভিলাষী ভারতবাসীর জন্য অপূর্ণাঙ্গ আদর্শ ত বটেই মূলতঃ অসত্যও।" "জাতিভেদের বিরুদ্ধে কিছু অসন্তোষ এদেশে কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে, মহাত্মার অসন্তোষ তার চাইতে প্রবলতর কিছু নয়, হয়ত দুর্বলতর। আজ যদি এদেশে জাতিভেদ শিথিল হয়ে আসে তবে সে মহাত্মার প্রচারের জন্য নয়, ইউরোপের একাকারত্বের প্রভাবে।" এখানেও আধুনিক রেনেসাঁর কথা বলেছেন ওদুদ। 'জয়তী' শ্রাবণ ১৩৩৭, রচনাবলী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৯-১৫৩।

৪২. "মানুষের জীবনে এ যে কতবড় অভিশাপ তা এই একটা কথা ভাবলেই বোঝা যাবে যে এর একমাত্র কাজ নষ্ট করা — নিজেকে নষ্ট করা — পরকেও নষ্ট করা।" 'জয়তী' ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৭, রচনাবলী, পৃঃ ১৫৩-১৫৮।

৪৩. ঐ পৃষ্ঠা ১৫৭।

৪৪. ঐ পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬০।

৪৫. "অন্ধ আচার-পদ্ধতির পূজাও যে প্রতিমা পূজা, এদিকে তার দৃষ্টি নেই বললেই চলে।" ঐ পৃঃ ১৬০।

৪৬. ঐ পৃষ্ঠা ১৬১।

৪৭. ঐ পৃষ্ঠা ১৬৩।

৪৮. আবুল হোসেন বলেছিলেন, "হজরত মোহাম্মদের একটি বিখ্যাত বাণী হচ্ছে 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ — আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে বিভূষিত হও, আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে বিভূষিত হবার অর্থ অনন্ত সদ্‌গুণে ভূষিত হওয়া, কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই -- সে হজরত মোহাম্মদের চাইতেও বড় হতে পারে।" রচনাবলী, পৃঃ ১৩৯।

৪৯. ১৯২৬ সালের ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত 'সমাজের' প্রথম বর্ষের চতুর্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত ওদুদের 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধটি প্রথম 'অভিযান'

পত্রিকায় (১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র) এবং পরে 'নবপর্যায়' গ্রন্থে ছাপা হয়। 'অভিযানের' সেই একই সংখ্যায় আবুল হুসেনের 'নিষেধের বিড়ম্বনা'ও ছাপা হয়।

৫০. ওদুদ বলছেন "মৌলানা আকরাম খাঁ ছয় মাস ধরে আমার 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধটির সমালোচনা করেন। তাঁর মোট বক্তব্য দাঁড়ায় — আমি ইসলামকে নষ্ট করতে চাই। হজরত মোহাম্মদকে হীন প্রতিপন্ন করতে চাই। এর ফলে ঢাকায় বিক্ষোভ দেখা দেয়।" কাজী ওদুদের জীবন কথা' রচনাবলী পৃঃ ৩৩৭।

৫১. ওদুদ লিখছেন, "আমার সহকর্মী আবুল হুসেন এদের বোঝানো অসম্ভব দেখে ত্রুটি স্বীকার করতে রাজী হন। যেমন হয়েছিলেন গেলিলিও। আমি ত্রুটি স্বীকার করিনা, তবে বলি 'এরা যে ভেবেছেন আমাদের কথায় ধর্মদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে, আর আহত হয়েছেন, সেজন্য আমি দুঃখিত। ...একরকম মিটমাট হয়ে যায়; এরপর ঢাকার বুদ্ধির মুক্তিবাদীরা আর প্রবল থাকতে পারেনি। মুসলমান সমাজ ক্রমেই গোঁড়ামির দিকে আরও অগ্রসর হতে থাকে।" ঐ পৃঃ ৩৩৭।

৫২. নানাকথা (দিনলিপি) রচনাবলী পৃ ৩২৪।

৫৩. 'জাগরণ' কৈফিয়ৎ' ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৩৫ পৃঃ ১৭২ ও ১৭৩।

৫৪. দিনলিপি, রচনাবলী পৃঃ ৩২৬।

৫৫. দিনলিপি, রচনাবলী পৃঃ ৩২৭।

৫৬. দ্বিতীয় অধিবেশনে নজরুল বলেছিলেন "আজ আমি দেখছি - এখানে মুসলমানদের নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম, যে মৌঃ আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ কতকগুলো গুণীব্যক্তি দেখছি — আস্ত কাফের।" শিখা' ১ম বর্ষ চৈত্র ১৩৩৩। খোন্দকার সিরাজুল হক 'প্রাগুক্ত' পৃঃ ২৫।

৫৭. রচনাবলী পৃ ১৩৯।

৫৮. বাংলার জাগরণ, রচনাবলী ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪০।

[পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বিশিষ্ট অতিথির ভাষণ। অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।]

রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা — ৩

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৩)

মানসী দাশগুপ্ত

অনেক লিখেও শেষ জীবনে পুত্রতুল্য ভাশুর-পুত্রের আশ্রয়ে, সাহিত্যলোকের বৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরে নির্বাসিত মানুষের মতো দিন কাটিয়েছিলেন বলেই শৈলবালা ঘোষজায়াকে 'বিস্মৃত লেখিকা' আখ্যায় ভূষিত করা যাবে না, অন্তত আমি তা করব না। এর কারণ, সাধারণ ভাবে সমস্ত মানুষ এবং মানুষের ছোটবড় সৃষ্টির সঞ্চয় কালপ্রবাহে সর্বদাই হারিয়ে যায়। দৈবক্রমে কোনও কথামালা, ছবি কি গান যখন রচনাকাল থেকে বহু যুগ পরে সুদীর্ঘকাল মানবচিত্তকে সঞ্জীবিত করে, তখন কালোত্তীর্ণ সেই সব সৃষ্টির কলাকারকে, শিল্পীকে কি গীতিকারকে কালজয়ী জ্ঞানে আমরা বিশেষ সম্মান দিই। মানবসংস্কৃতির ইতিহাসে এমন কালজয়ী প্রতিভা দুর্লভ বলেই অসামান্যতার নিরিখে আদরণীয় হয়ে থাকেন সেই সব স্রষ্টা। তাঁদের নির্মাণ ও সৃষ্টি এমনই সজীব থাকে নব নব প্রজন্মের কাছে — যাতে যথার্থই বলা যায় সকলেই ''আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি''। কিন্তু 'নিরবধি' কালের দরবারে না গেলেও যত সাহিত্যসাধক তথা শিল্পী সমসময়কে চমকিত করে আনন্দিত করে, সমৃদ্ধ করে যান তাঁরা অতঃপর ''বিস্মৃত'' ? তাহলে তো আমাদের সেদিনের বহু চিত্তজয়ী প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও গণ্য করতে পারি, বিস্মৃত লেখক বলে। তাঁর 'হেইডি, হাইডি, হাই' — কবিতা কিংবা 'সাগরসঙ্গমের' 'বাতাসী'-কে কে আর মনে করতে পারে আজ ? হয়ত তাঁরই গড়া 'ঘনা-দা' ডুবিয়ে দিয়েছে ওই সব কথার ছন্দ আর ছবি। এই তো কিছুকাল পূর্বে, যখন চতুরঙ্গ পত্রিকাতে কাবিননামা তথা বসুধারা বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হয়, কে-ই বা স্মরণ করেছিল কাঠ খড় কেরাসিন কাহিনীগুলিতে গেঁথে রাখা দুঃখী মিয়া-বিবিদের কথা ! এঁদের স্রষ্টা, সেদিনের উজ্জ্বল লেখক ও কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত হারিয়ে গিয়েছেন কবেই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ — গ্রন্থকর্তার আড়ালে। এরকম হয়, হয়েই থাকে। হওয়া ভাল কি মন্দ সেই কথা এখানে না তুলে, আমি বলব যাঁরা সতেজ, সজীব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি কর্মগুলিকে মেলে ধরবার কালে সমঝদার পাঠক প্রায় পাননি, সকলেই একরকম অনাগ্রহ দেখিয়েছিলেন যে

সপ্রাণ লেখককে, তিনিই যদি মৃত্যুর পরেও কোনও সাড়া না পান, তাঁকেই শনাক্ত করা ভাল 'বিস্মৃত লেখক' বলে। এমন হতভাগ্য গুণী লেখকের সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি ফুটপাথে পড়ে থাকা পুরনো বইয়ের ভিড়ে আচমকা। কিন্তু লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়া কখনও অনাদৃত হননি সেই অর্থে। প্রখ্যাত প্রবাসী পত্রিকার পথ ধরে নবীনা শৈলবালার বাংলা সাহিত্য জগতে নির্ভীক চমকপ্রদ আবির্ভাব এতটাই সাড়া তুলেছিল যা আজকের দিনের লেখক-লেখিকার কাছেও — আমাদের কাছে তো অবশ্যই — ঈর্ষনীয়।

ব্যক্তিগত জীবনে, চোদ্দ বছর বয়সে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন নন্দী সাহেবের আদরিণী কন্যার বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামের পড়তি জমিদার ঘোষবাড়ির বউ হয়ে যাওয়ার মতো বাধা এলেও, বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী শৈলবালা পাঠচর্চাতে ছেদ পড়ে যেতে দেননি। স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ তখনও ইউনান সাহেবের হোমিও কলেজে হোমিওপ্যাথির ছাত্র যখন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপরে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে শৈলবালা ঘোষজায়া 'সরস্বতী' উপাধি পান। এরই ভিতরে তাঁর সাহিত্যসাধনা পূর্ণোদ্যমে শুরু করবার পূর্বেই পিতার মৃত্যু এবং বৎসর পাঁচেকের ভিতরেই হৃদয়বান যুবক স্বামীর উন্মাদরোগগ্রস্ত হওয়ার মর্মন্তুদ আঘাত তরুণী শৈলবালা ঘোষজায়াকে বেজেছিল। লক্ষণীয় পারিবারিক এইসব শোক দুঃখ তাঁর সাহিত্যিক সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার মূল্যবান প্রধান গ্রন্থগুলির রচনাকাল বাংলা ১৩২৬ থেকে ১৩৩৭ সন। অথচ এই বছরগুলির ভিতরেই ব্যক্তিগত দুর্যোগ ঘিরে এসেছিল। তাঁর স্বামী উন্মাদরোগে ভুগছেন ১৩২৬ থেকে। দশবছর পরে — শৈলবালার বয়স যখন মাত্র ছত্রিশ — তখন নরেন্দ্রমোহন ঘোষ দেহরক্ষা করেছেন। লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়া কিন্তু লিখেই চলেছেন অক্লান্ত। ১৩২৬ বাংলা সনের পূর্বেই তাঁর প্রথম প্রকাশিত শেখ আন্দু উপন্যাসের একাধিক মুদ্রণ হাতে পড়ে যখন আমি সুরাহা-সম্প্রীতির আগ্রহে এই বহুশ্রুত উপন্যাসটির খোঁজ করি কলকাতার সংস্কৃত কলেজের পাঠাগারে। গ্রন্থাগারে কর্মরত নীরব ও সুদক্ষ কর্মী সুনীল দাশ পুরাতন গ্রন্থ সুবাদে সযত্নরক্ষিত শেখ আন্দু-র দ্বিতীয় সংস্করণটি সৌজন্য বশে আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। একই ভাবে পড়তে পেরেছি শৈলবালার মঙ্গলমঠ, নমিতা ও ইমানদার। শেখ আন্দু প্রকাশিত হলে লেখিকার মুসলমান দরিদ্র শেখ আন্দুর সঙ্গে সম্পন্ন হিন্দু নায়িকার প্রণয় কাহিনী রচনার দুঃসাহসিকতায় প্রবীণ মানুষজনের অবশ্যই ভ্রূকুঞ্চিত হয়েছিল কিন্তু তারই সঙ্গে এসেছিল মুক্তমন পাঠক তথা সুধী পর্যালোচকবৃন্দের অকুণ্ঠ সাদর অভ্যর্থনা। শুধু

যে দি ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা তৎকালীন মোসলেম ভারত পত্রিকার মান্য সম্পাদক কবিবর মোজাম্মেল হক বি.এ. এই বইখানির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন, বা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকাটির কার্তিক (১৩২৮) সংখ্যায় শেখ আন্দু-র এক এগারোপৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ পর্যালোচনা ও সাধুবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তাই নয়, শৈলবালার অগ্রজ ও স্নেহের আশ্রয়ে কাপ্তেন শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার নন্দী আই. এম. এস স্বয়ং ভগ্নীর 'স্নেহের আন্দুকে' আন্তরিক স্নেহে ''আদরের ভাগিনেয়'' বলে গ্রহণ করেছিলেন — এই সাক্ষ্য রেখেছেন লেখিকা স্বয়ং তাঁর লেখনীপ্রসূত পরবর্তী এক অসামান্য ইমানদার 'ফৈজু'-র কাহিনীগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে। স্পষ্টতই শেখ আন্দু-র প্রসিদ্ধি লেখিকা শৈলবালার কল্পনা-প্রবাহে যে বেগ এনে দিয়েছিল, 'ফৈজু' চরিত্রের উৎস ছিল সেখানে। শুধু ইমানদার উপন্যাস নয়, আন্দু কি ফৈজু চরিত্রের বিকাশ ও ব্যাপ্তির ভিতরে তাঁর কল্পনার অভিব্যক্তি এসে ছুঁয়েছে মঙ্গলমঠ উপন্যাসের নিরঞ্জন-কেও।

মঙ্গলমঠ উপন্যাস পাঠান্তে বর্ধমান রাজবাটির প্রধান সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রিয়নাথ তর্করত্ন 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী শৈলবালা সরস্বতী বিদগ্ধচরিতা'-কে ১৩২৯ বাংলা সনের ছাব্বিশে বৈশাখ একখানি পত্র লিখেছিলেন। সেইটি থেকে কিছু কিছু অংশ আজ আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিই। এতে তৎকালীন সারস্বত সমাজে শৈলবালা ঘোষজায়ার সমাদৃত অবস্থান ধরা যাবে ভাল।

''.... ভক্তির সহিত উপহৃত তোমার মঙ্গলমঠ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। নিরঞ্জনের নির্ম্মল পবিত্র চরিত্র অঙ্কনে তুমি নিজের অসাধারণ মনস্তত্ত্ব পর্যালোচনার পরিচয় দিয়া আমাকে বিস্মিত করিয়াছ ....। মায়াকে তুমি মর্ত্ত্যের মানবী রূপে অবতীর্ণ করাইয়াও বাস্তবিক দেবীরূপে তাহাকে পরিচিত করাইয়াছ, সাময়িক অধীরতা নিরঞ্জনের চিত্তকে অনেক সময়ে চাঞ্চল্যক্ষুব্ধ করিলেও মায়া কোনও দিনই সুকোমল নারী চরিত্রের মর্যাদাকে আহত করিয়া আপনার অধীরতার পরিচয় প্রদান করে নাই। তুমি এই দুইটি চরিত্রই আপনার অনুপম শক্তিবলে মনোনুরূপে অঙ্কিত করিয়া যথার্থই কবি যশোভাগিনী হইয়াছ। বহুত্তর প্রসঙ্গে অধ্যাত্ম-চিন্তার অবতারণায় তোমার মন যে কি ভাবে লীলাময়ের বিচিত্র সৃষ্টিলীলা পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকে তাহার পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। [......] তোমার সদুপদেশ পাইয়া সংসারের অপরিণত বুদ্ধি নরনারীগণ সমাজের আদর্শ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হউক, হিতৈষী ব্রাহ্মণের

এই আশীর্ব্বাদ [......]"

এই চিঠিতে শেষাংশে ব্যবহৃত 'সদুপদেশ' শব্দটি বেশ লক্ষণীয়। শৈলবালা ঘোষজায়া নিজে অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রমুখ মান্য কথাকারদের মতো বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশিত 'লোকশিক্ষার জন্য লিখিবে' — আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন মনে হয়। সেই যে বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ গ্রন্থশেষে ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম, আশা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃতফল ফলিবে" ঠিক অতদূর প্রকাশ্য করে নীতিবাক্য লেখেননি শৈলবালা ঘোষজায়া। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সমকালীন দিনে কলম ধরে ঠিক ওরকম উপদেশ লেখা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। কিন্তু তাঁর প্রণীত প্রত্যেকটি আখ্যায়িকা উচ্চ আদর্শপ্রাণিত বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ এবং সমাজশিক্ষামূলক, এ কথা তাঁর প্রধান ও প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলি যত্ন করে পড়লেই ধরা যায়। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী — এই বিশ্বাস লেখিকা শৈলবালা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অনেকাংশে সার্থক হয়েছে তাঁর সেই শুভ প্রচেষ্টা।

যদিও নার্স নমিতার তুল্য পুণ্যবতী শুদ্ধস্বভাব নারী, কিংবা, খাঁটি ইমানদার ফৈজুর মতো সৎলোক সততার মূল্য দিতে মরেই যায়, কিন্তু আমাদের পরম্পরায় মৃত্যুকে পরাজয় বলে সাব্যস্ত করা হয়নি তাই আমরা মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুকে তাদের হার বলে চিহ্নিত করি না। মরণের ভিতরে জয়ের কথাটা রবীন্দ্রনাথের গানেও ধ্বনিত হয়েছে বারবার। সাধারণের শিক্ষার্থে শৈলবালা তাঁর উপন্যাসে আরও সহজ সরল পথে এগিয়ে পাপীদের জরাব্যাধিগ্রস্ত করে ছেড়েছেন কখনও কখনও। শৈলবালা ঘোষজায়ার বিশ্বাস অনুসারে তিনি এই কথাটাই প্রকাশ করেছেন যে ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি অন্যায়ের প্রতিবিধান করবেনই। অবশ্য মানুষকে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে সৎ পথে কর্তব্য পালন করতে হবে। দুষ্ট লোককে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে হবে, অবস্থানুসারে লোক ডেকে পিটিয়ে দিতেও হতে পারে। শাস্তিযোগ্য দুষ্ট লোক বা নীচ লোক যে কোনও সম্প্রদায়ের ভিতরে বা শ্রেণীতে থাকতে পারে। মহত্ত্ব যেমন কুটিলতাও তেমনই কোনও জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া নয় — এই কথাটা শৈলবালা নানা চরিত্র চিত্রণের ভিতর দিয়ে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন।

তাঁর মুক্তমনের উদারতার বলেই শৈলবালা অতি সুবিন্যস্ত বিশ্বাসাশ্রিত জগতের আলেখ্যসমূহে নানা ধর্ম, বর্ণ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানকে উপস্থিত করে অনন্য বৈচিত্র্য সংযোজন করেছিলেন। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই উপস্থাপনাতে। তাঁর রচনার গুণে মনে হবে যেন তিনি অনেক দেশভ্রমণ করেছেন, বহু তীর্থে

সাধুসঙ্গ ঘটেছে তাঁর এবং হিন্দু ঘরসংসারের মতো মুসলমান গৃহস্থালী দেখা হয়েছে তাঁর আপনজনের দৃষ্টি দিয়ে। এই দৃষ্টি বহুলাংশে অন্তর্দৃষ্টির প্রসাদে পেলেও লেখিকা শৈলবালা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অনেক লাভ করেছিলেন যা শুধুমাত্র বর্ধমান সদর বা বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পিতার সরকারি চাকরিতে বদলি ছিল যার ফেরে শৈলবালা জন্মগ্রহণ করেছিলেন কক্সবাজারে। পরবর্তীকালে ভাগ্যগুণে অথবা বৈগুণ্যে ভারতের/বঙ্গের নানা স্থানে বাস করতে হয়েছিল তাঁকে যার কথা তিনি তাঁর ঊনআশি বছর বয়সের আত্মপরিচিতি দিতে গিয়ে বলতে ভোলেননি। এই অভিজ্ঞতা সূত্রগুলির ছেঁড়া টুকরো জুড়ে নিতে পারব তাঁর অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা তথা আত্মজীবনী সম্পূর্ণ করতে আজকের কোনও প্রকাশক আগ্রহী হলে।

সুরাহা-সম্প্রীতি তাঁর জন্মশতবর্ষের পূর্বেই যে শেখ আন্দুকে পুনরুজ্জীবিত করতে অগ্রসর হয়েছেন, নাটক হিসেবে এটি আজ সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হতে চলেছে এতে বোঝা যায় লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখনী কত প্রবলভাবে জীবিত। শেখ আন্দু-র সার্থকতা যে ফৈজুকে সৃষ্টি করার মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত করেছিল লেখিকাকে সেই ফৈজু তার শিশু আজীব আর শিশুর জননী টিয়াকে রেখে চলে গেল ইমান রক্ষা করে এই বার্তা ইমানদার বইখানি পড়লে পাওয়া যায় খুব নির্ভুলভাবে। ফৈজুর উত্তরাধিকারের দায় নিয়ে আজীব আর তার মা টিয়া কোন পথে যাবে এই ভাবনা শৈলবালার মনে আনাগোনা করেছিল কিনা আমরা জানতে পারি না। তা যদি পেতাম, তাহলে সুরাহা-সম্প্রীতির অনুসন্ধান ব্রতী আমাদের সম্মুখে পথের দিশা একভাবে উন্মুক্ত হত বলে মনে হয়। কেননা সাবেক কালের মানুষ শৈলবালা ঘোষজায়া এতই সমকালের মানবিক সমস্যাদিকে ধবতে পেরেছেন যাতে তিনি আজকের বিক্ষিপ্ত সমাজজীবনে যথার্থ দিশারী হয়ে আলো দেখাতে সক্ষম এমন সদর্থক বিশ্বাসই জাগে।

তিনি আমাদের সাহিত্যিক পূর্বসুরী এতে আমরা শ্লাঘা বোধ করি। তিনি যা দিতে পারতেন অকুণ্ঠ সাহসে দিয়ে গিয়েছেন, শোক তাপ দুঃখ তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। পরবর্তী প্রজন্মে আমরা যদি তাঁর অবাধ চিত্তের চলিষ্ণুতাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে উপস্থিত কর্তব্য পালনে অকুণ্ঠ থাকতে পারি তাহলেই শৈলবালা ঘোষজায়াকে যথার্থ সম্মান করা হবে।

[জানুয়ারী ২৫, ১৯৯৩ সালে শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের সভাগৃহে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার। বক্তা ছিলেন শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের অধ্যাপক।]

ইতিহাসের ইঙ্গিত ঃ বেগম রোকেয়ার ভাবনা

হাসান আজিজুল হক

বাইরে থেকে বেগম রোকেয়ার জীবনে দুটি সংকল্প আমরা লক্ষ করি। এক, দেশ ও সমাজের কাছে কিছু কথা স্পষ্ট করে বলা; দুই, এই সমাজের ভিতরেই নিজের প্রাণপণ সাধ্যে কিছু কাজ করা। তাঁর কালাপাহাড়ি কথা শুরু হয়ে যায় ১৯০৪ সাল থেকেই, যখন তাঁর বয়স ২৪ বছর, আর শেষ হয় তাঁর মৃত্যুতে। এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনো কথা বলা থেকে বিরত হননি। অপ্রীতিকর জেনে কোনো কথা চেপে রাখেন নি, ভয় পেয়ে কোনো কথা ফিরিয়ে নেন নি। এর অর্থ এই যে, দেশ, সমাজ, মানুষ সম্বন্ধে ভাবনা তিনি কখনো ত্যাগ করেননি। এটা আরো উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে তাঁর ভাবনা, তাঁর কাজ পুরোপুরি সমাজ ও মানুষকেন্দ্রিক। তাঁর নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছুই ছিল না — বিধবা হয়েছিলেন তিরিশ বছর বয়সের কাছাকাছি, যৌবনেই সন্তানহারা হয়েছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় চালানোর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সপত্নী-কন্যা-জামাতার নিদারুণ হিংসা ও বিরোধিতার মুখে ভাগলপুরে কাজ করার ইচ্ছা ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন। স্বামীর দেওয়া অর্থে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতায় এবং বাকি জীবনটা — মোটামুটি বাইশ বছরের কাছাকাছি — এখানেই কাটিয়ে দেন। কথা এবং কাজ পুরোপুরি মিলিয়ে নেবার দুর্লভ সুযোগ বেগম রোকেয়ার হয়েছিলো এবং অবিচলিত সংকল্পে তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

প্রথম লেখাতেই বেগম রোকেয়া শাস্ত্রবদ্ধ সমাজকে আক্রমণ করে তাঁর কথা শুরু করেছিলেন। প্রথা এবং আচার শাসন তো বটেই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল মূল ধর্মগ্রন্থ। বাঙালি সমাজের যে সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন তিনি সেই মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, সংকীর্ণতা, ভেদবুদ্ধি ও গোঁড়ামি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কতোদূর পৌঁছেছিল তা তাঁর চেয়ে আর কারো ভালো জানার কথা নয়। কারণ অনগ্রসরতা, অশিক্ষা, সংকীর্ণতার শ্বাসরোধকারী পরিমণ্ডলেই তাঁর জন্ম ও বেড়ে-ওঠা, আর পরিস্থিতি কতো কঠিন নিরাময়সাধ্য জানা বলেই তাঁর এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। কিন্তু আমাদের যা অবাক করে তা হচ্ছে এই অসম্ভব অসহিষ্ণু সমাজকে গ্রাহ্যমাত্র না করে তিনি ধর্মের মূল ধরে টান দিতে পেরেছিলেন কিভাবে! বোধের তীব্রতা, মানবহিতৈষণার জ্বলন্ত আদর্শ ভিতরে

না থাকলে বেগম রোকেয়ার বিদ্রোহ আমার কাছে অসম্ভব বোধ হয়। ১৯০৪ সালের নবনূর-এ তাঁর যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে তিনি লেখেন ঃ "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ... পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ... ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকেও (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর হইতে দেখা যায়!! ... তবেই দেখিতেছেন, ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ... যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বর-প্রেরিত কিনা তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না।" এই কথাগুলি তিনি বলছেন ১৯০৪ সালে, ১৯৯৩ সালে নয়, উপনিবেশ ভারতবর্ষে, স্বাধীন ভারতবর্ষ বা স্বাধীন বাংলাদেশে নয়। এটা এখন সবার কাছে স্পষ্ট যে এমন কথা একালে, এই মুহূর্তে এই ভূখণ্ডে বলা কঠিন তো বটেই, তার চেয়ে বেশি, একথায় এখন প্রাণ পর্যন্ত খোয়ানো খুবই সম্ভব। আমাদের মনে আছে, একটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ উপন্যাস লেখার দায়ে একজন সালমন রুশদীর উপরে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রাণদণ্ড ঝুলছে, প্রাণদণ্ড দিয়েছে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমাদের মনে আছে যে, পৌরাণিক চরিত্র রামের জন্মস্থানটি বাবরি মসজিদ বলে চিহ্নিত করে সেই মসজিদটি ভেঙে ফেলা হয়েছে — সঙ্গে সঙ্গে উপমহাদেশের তিনটি মৌলবাদী শক্তির অভ্যুত্থান ও বিস্ফোরণ ঘটেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঝরে পড়েছে কয়েক হাজার জীবন। শত শত মন্দির ও মসজিদ ভূমিস্যাৎ হয়ে গেছে। মানুষের সভ্যতা হয়তো চক্রপথে এগোয়, হয়তো এগোয় আবার পিছোয়, হয়তো গড়ে এগিয়েই যায় — কিন্তু সিনিক বা এমনকি কর্মযোগীও বলতে পারেন মানুষের সভ্যতা মুহূর্তের মধ্যে পিছনদিকে লাফ দিয়ে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে, লহমার মধ্যে নষ্ট করে দিতে পারে তার সমস্ত অর্জন। আজকের খ্রীস্টানি, ইসলামী, হিন্দু মৌলবাদের কার্যকলাপ দেখলে এইরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেজন্যে মনে হয় ব্রিটিশ ভারতে বেগম রোকেয়া ধর্মগ্রন্থগুলির অপৌরুষেয়তা সরাসরি অস্বীকার করে পার পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু একালের সভ্যতার এত জাঁক, এত প্রগতি সত্ত্বেও ১৯০৪ সালে যা বলেছিলেন তা এখন বলতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সন্দেহ করা বৃথা, রোকেয়ার লেখা পড়ে যা বুঝেছি তাতে মনে হয় তাঁকে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে বা নিবৃত্ত করে রাখতে পারে

এমন কোনো শক্তির সঙ্গে তাঁর কখনো পরিচয় হয় নি। কাজেই দুঃসাহস রোকেয়া চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। এই দুঃসাহসই তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দেখিয়েছেন, বলতে কি, আগাগোড়া আত্মসঙ্গতি তাঁর চরিত্রের দ্বিতীয় উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য কিন্তু তাঁর দুঃসাহসের উৎস কখনোই হঠকারিতা নয়, প্রদর্শেয় ব্যাপার নয়, তার উৎস গভীর বোধ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুতীক্ষ্ণ মনন, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আর মানবকল্যাণের সুনির্দিষ্ট প্রেরণা। একটু মন দিয়ে রোকেয়ার ভাবনাকে অনুসরণ করলেই দেখা যায়, তাঁর তীব্র উক্তিগুলির তীব্রতাজাত সংকীর্ণতা আস্তে আস্তে কমে আসছে। তিনি সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধিগুলিকে তাদের সামগ্রিকতায় দেখতে পাচ্ছেন। রোকেয়াকে প্রথমে মনে হয় তিনি বুঝি মুসলিম সমাজের নিষ্ঠুর পর্দা বা অবরোধ প্রথার কঠিন ও নির্মম সমালোচক মাত্র এবং মুসলিম সমাজের মেয়েদের অবরোধের বাইরে আনাই তাঁর একমাত্র কাজ এবং এ থেকে এই গতানুগতিক উপাধি তাঁর কপালে জুটে যায় যে তিনি হচ্ছেন মুসলিম নারীসমাজের মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ঠিক হবে না। তাঁর সামনে আছে সমগ্র সমাজ — সেই সমাজে পুরুষও আছে, নারীও আছে, হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। অন্য কথায়, রোকেয়া লাভ করতে চেয়েছিলেন সমাজ সম্পর্কে একটি সমগ্রদৃষ্টি।

মনে হয়, সেটা সহজে ঘটে নি। সমাজের সামান্যই দেখেছিলেন তিনি। বাল্যে কৈশোরে অন্তঃপুরের বাইরে কখনো আসতে পারেন নি। রংপুরের পায়রাবন্দের একটি অভিজাত মুসলিম পরিবার ঠিক কি পরিমাণ অন্ধকার, অশিক্ষা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডুকতা ধারণ করতে পারে, তা এখন আমাদের পক্ষে আন্দাজ করা কঠিন। ধারণা যেটুকু যা দেবার বেগম রোকেয়াই তাঁর নিজের লেখায় দিয়ে গেছেন। রোকেয়া কোনদিন স্কুলে যান নি, বাংলা হরফ বাড়িতে ঢোকার জো ছিল না, নেহাৎ বাংলাদেশ, কথাবার্তাটা বাংলায় চলতো বুঝি, লেখাপড়া বলতে বোঝাতো তোতাপাখির মতো আরবি ভাষায় কিছু ধ্বনি কণ্ঠ দিয়ে ওগরানো, যার নাম কোরান পড়া। বড়ো বোন করিমুন্নেসার বাংলা পড়ার গল্প শুনিয়েছেন আমাদের রোকেয়া — বাংলা বই পড়া অবস্থায় বাবা এসে পড়ার ভয়ে বিবর্ণ করিমুন্নেসার ছবি আমরা কোনদিন ভুলবো না। রোকেয়া এই বোনের কাছে বাংলা শিখেছিলেন, বড়ো ভাই সাবের সাহেবও কিছু সাহায্য করে থাকতে পারেন — তারপরে নিতান্ত অল্প বয়সে অবাঙালি মৃতদার দ্বিগুণ বয়েসি সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। পায়রাবন্দের অন্তঃপুর ছেড়ে তিনি চলে গেলেন ভাগলপুরে, সেখান থেকে অবশ্য স্বামীর নানা

কর্মক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকেছেন। ইংরেজি তিনি কিছু শিখেছিলেন তাঁর বড়ো ভাইয়ের কাছে — কিন্তু ভাষাটা পড়া এবং লেখা আয়ত্ত করেছিলেন স্বামীর কাছে। কলকাতায় আসার আগে সমাজ তাঁর তেমন কিছু দেখা হয় নি, শুধু মন-মানসিকতার গড়নে পড়েছিলো সাখাওয়াৎ হোসেনের ঔদার্যের প্রভাব। দৃষ্টিভঙ্গির যে অবিশ্বাস্য প্রসারতা তিনি পেয়েছিলেন তার কতোটা এসেছিলো বাংলা ইংরেজি ভাষার বইপত্র থেকে, কতোটাইবা সাখাওয়াৎ সাহেবের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে রোকেয়ার মনের মধ্যে আলো জ্বালানোর কাজে সাখাওয়াৎ হোসেনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা বোধহয় সঙ্গত হবে না। রোকেয়া তাঁর প্রথমদিকের ইংরেজি লেখা 'Sultana's Dream' প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন, নির্জন বাড়িতে দিন দুয়েকের চেষ্টায় লেখাটা তিনি দাঁড় করান — সাখাওয়াৎ হোসেন ট্যুর থেকে ফিরলে লেখাটা তিনি তাঁকে দেখান। আগ্রহের সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, a terrible revenge। এই সকৌতুক মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, সমাজকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গিটি বেগম রোকেয়ার মধ্যে গড়ে উঠছিলো, তা সাখাওয়াৎ হোসেনের পোষকতা পেয়েছিলো। লেখাটি দেখার জন্যে তিনি ভাগলপুরের ইংরেজ কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯০৪ সালে নবনূর পত্রিকায় 'আমাদের অবনতি' নামের লেখাটিই বিদ্রোহী রোকেয়ার সমাজের উপর প্রথম আঘাত এবং সম্ভবত তাঁর দেওয়া প্রচণ্ডতম আঘাত। খুব স্বাভাবিক যে, প্রতিবাদ হতে থাকে, যদিও প্রতিবাদের নামে আবোল তাবোল বকা ছাড়া প্রতিবাদকারীদের কোনো উপায় ছিল না। এস. এ. আলমুসাভী লেখেন ঃ 'নারী কখনো সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না — তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে'। নওশের আলী খান ইউসুফজী রোকেয়ার কথাগুলি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ 'এ অনাহুত গর্হিত কথাগুলি বলিবার কি প্রয়োজন ছিলো! এ অবান্তর কথাগুলি না লিখিলে কি আপনাদের অবনতির কারণ অনুসন্ধানে কোনো বাধা জন্মিত?' যে কোন কারণেই হোক 'মতিচূর' ১ম খণ্ডে এই লেখাটি যখন 'স্ত্রীজাতির অবনতি' নামে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন পাঁচটি অনুচ্ছেদ বাদ পড়ে। উপরে রোকেয়ার লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি আমি দিয়েছি তার সবই এই পাঁচটি অনুচ্ছেদের মধ্যে ছিলো। আমার কাছে এই বর্জন করার কাজটিকে রোকেয়ার আপস মনে হয় না — কাণ্ডজ্ঞান বলেই মনে হয়। তিনি অনুভব করেছেন তাঁর কিছু করার আছে, সেজন্যে সমাজকে প্রস্তুত করারও একটা দায় থাকে — তিনি তাঁর বক্তব্যকে বিশদ, যুক্তিসিদ্ধ, সহজবুদ্ধির কাছে

গ্রহণযোগ্য করে তোলায় সচেষ্ট হন। অথচ নিজের অবস্থান থেকে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হন না তিনি। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষদের রচিত, এই সরাসরি বক্তব্যটিকে বাদ দেন বটে কিন্তু স্ত্রীজাতির দুর্দশার মূল কারণগুলিকে ঠিকই শনাক্ত করতে পারেন। তিনি লেখেন ঃ "আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবত সুযোগের অভার ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল ···ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সংকোচ বোধ করি না।"

'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া সাধারণভাবে স্ত্রীজাতির অবনতির কথাই বলেন, মুসলিম সমাজের মেয়েদের কথা আলাদা করে বলেন না। ধর্মগ্রন্থগুলির অলঙ্ঘ্য নির্দেশ, মানুষের সভ্যতার বিকাশের কাল থেকেই মেয়েদের উপর পুরুষদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অসংখ্য বেড়ি, ধর্মকে সামনে রেখে যুগ যুগ ধরে তৈরি করা দেশাচার লোকাচারের নির্মম বাঁধন — প্রত্যক্ষ জীবিকার কাজ থেকে মেয়েদের সরিয়ে দেওয়া, পণ্যের মতো তাদের ব্যবহার, পশুর মতো তাদের শোষণ, শিক্ষার জগৎ থেকে তাদের নির্বাসন, দাসত্বই স্বাভাবিক বলে মেয়েদের তাকে স্বভাবের অঙ্গ করে নেওয়া — ইত্যাদি সমস্ত প্রসঙ্গই রোকেয়ার এই লেখাটির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ভয়ানক তীব্র শ্লেষের সঙ্গে তিনি লেখেন ঃ "আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ির আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য জোড় পরাইতে পারেন। বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পর্দার কড়া রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।"

রোকেয়ার অবস্থানের নির্দিষ্টতা মনে রাখলে একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই আমাদের লক্ষ করতে হয়, প্রয়োজনে প্রতিবেশী সমাজের তীব্র সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে যখন একজন হিন্দু লেখক জানাচ্ছেন, "ভারতে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা, নারী, তাঁহারা নারীরই উপাসক" তখন বিদ্রূপে ফেটে পড়ে তিনি তাঁর 'সুগৃহিনী' প্রবন্ধের পাদটীকায় লিখলেন "বেশ! বলি হিন্দুর আরাধ্য দেবতা কোন্ জিনিষটি নহে? পূজনীয় বস্তু বলিতে চেতন অচেতন, উদ্ভিদ ইহার কোন্ পদার্থটিকে বাদ দেওয়া যায়? হনুমান এবং গো জাতিও কি উপাস্য দেবতা নহে? তাই বলিয়া কি ঐ সকল পশুকে তাহাদের উপাসক মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে?" অন্যদিকে মানুষ

নামের একটি জড়পিণ্ডের উদাহরণ দিতে গিয়ে বেহারের ধনী মুসলমান পরিবারের এক বধূবেগমের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি হিশেব করে দেখান বধূটির সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারের মোট পরিমাণ আট সের। গলা পর্যন্ত মাটিতে পোঁতা, মুখ-ঢাকা নারীদের ছবি তিনি মুসলিম সমাজ থেকেই তুলে এনেছেন বটে, তাঁর কারণ সেই সমাজ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিলো, এই অভিজ্ঞতার মর্মান্তিক যন্ত্রণা তিনি নারী হিশেবে পেয়েছিলেন। অন্যদিকে এটাই ছিল তাঁর সময়ের ঐতিহাসিক সামাজিক সত্য — পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের নারীদের উপর ছিলো অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় অনুশাসনের বাড়তি বোঝা। রোকেয়া সমাজটাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন, সমাজবিজ্ঞানীর বুদ্ধিনির্ভর খোলা দৃষ্টিতে। অবরোধ-প্রথার আলোচনায় তাঁকে বার বার ফিরে যেতে হয়েছে — এজন্যে আলাদা একটা বই লিখেছেন, তাতে প্রতিপাদ্য একটিই — নারী মুসলিমসমাজে এমন কি ভোগ্যপণ্যের আদরও পায় না — পুরুষের কাছে সে পশুর চেয়ে একটুও বেশি নয়। মুসলিমসমাজে পুরুষ যে নারীকে গৃহপালিত জন্তুর মতো ব্যবহার করে — একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে একাধিক পশুকে সে খাঁচায় রেখে দেয়, এটাই একমাত্র কথা নয়, তার চেয়ে বড়ো কথা মুসলিম নারী এই পোষমানা পশুত্বকে মেনে নিয়েছে — সে যে পশু সে সচেতনতাও সে হারিয়েছে, এক চেতনাহীন জরদ্গব মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, তার আত্মাই বিকিয়ে গেছে। সমস্ত 'অবরোধবাসিনী' পড়লে একটা বিরাট কারাগারের অসহ্য ছবি ভেসে ওঠে — মুসলিমসমাজের অন্ধকার অন্তঃপুরের ছবি — একটি একটি করে ঘরের সমস্ত দ্রব্য চোরে তুলে নিয়ে যায়, পর্দা নষ্ট হয়ে যাবে মহিলারা চুপ করে থাকেন, বোরখা জড়িয়ে রেল লাইনের উপর একজন নারীর দেহ ছিন্নভিন্ন হতে থাকে — পর্দা লঙ্ঘন হয়ে যাবে এই ভয়ে সে বাঁচার চেষ্টাও করে না। প্লাটফর্মে আটকে নিশ্চেষ্ট থাকেন এক মহিলা, ট্রেন তাঁকে পিষ্ট করে দিয়ে চলে যায় — কয়েকজন বিবি বোরখা পরে বোঁচকার মতো পড়ে থাকেন, সামনে হঠানোর জন্যে রেলের লোক এসে তাদের জুতো দিয়ে ঠোক্কর মারে, তারা কথা বলে না পাছে পরপুরুষ তাদের গলার আওয়াজ শুনতে পায়। পর্দা বা বোরকা সম্পর্কে রোকেয়া আলাদা করে লিখেছেন। বোরকা যখন শালীনতার অঙ্গ তখন তিনি বোরকা সমর্থনই করেছেন। বোরকা রোকেয়ার কাছে শালীনতার অঙ্গ — নাম যাই দেওয়া হোক না — পোশাকে শালীনতার দাবি মেয়েদের মতো পুরুষদের কাছেও করা যায়, মেয়েদের বেলাতে সেটা শুধু মুসলিম মেয়েদের জন্যেই কাম্য তা নয় — পৃথিবীর যে কোন দেশে,

যে কোন সম্প্রদায়ের নারীদের জন্যেই বাঞ্ছনীয় বলে রোকেয়া মনে করেন। কিন্তু জেনানা নামে যে ভয়ঙ্কর কয়েদখানা মুসলিম সমাজে গড়ে উঠেছে, বোরকা তার একটা অবলম্বন মাত্র। গারদটা ঠিক মতো চালানোর একটা উপায় বাধ্যতামূলক পর্দাপ্রথা — কিন্তু সেটাই একমাত্র অবলম্বন নয়, তার সঙ্গে যোগ করতে হয়েছে মেয়েদের জন্যে বাধ্যতামূলক অশিক্ষা, বুদ্ধি ও মননের চর্চার সমস্ত পথরোধ, কর্মের জগৎ থেকে পুরোপুরি অপসারণ, বাল্যবিবাহ, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চণা — এইরকম নানারকম পন্থা। রোকেয়া মুসলিম-সমাজ বা হিন্দু-সমাজ, বাঙালি মুসলমান বা বিহারি মুসলমান সমাজ যাকেই আক্রমণ করুন না, পুরো সমাজ তাঁর দৃষ্টি থেকে কখনোই আড়ালে যায় না। তিনি লেখেন ঃ "পরিশেষে বলি আমরা সমাজের অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোনো ব্যক্তির এক বা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতো দূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।" অপচয়ের বোধটাই তাঁর মধ্যে তীব্র হয়ে ওঠে। সমাজের আধখানার শ্রম মেধা সৃজনক্ষমতার কোনো ব্যবহার হচ্ছে না — মানবসভ্যতার যে পুষ্টি ঘটতে পারত, সেটা ঘটছে না। 'স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন স্ত্রী তখন একটি বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ প্রস্থ মাপেন।'

বেগম রোকেয়া একটা সুস্থ কল্যাণমুখী সৃজনশীল সমাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা করেন — সংকীর্ণ অর্থে মুসলিম নারীসমাজের জন্যে নয়, হিন্দু নারীসমাজের জন্যেও নয়, এমনকি সাধারণভাবে নারীসমাজের জন্যেও নয় — আমরা দেখতে পাই পুরো দেশ ও সমাজের জন্যেই; এবং তা করতে গিয়ে নারী এবং পুরুষের জন্যে একটি সাধারণ প্রত্যয়ের আশ্রয় নেন। সে প্রত্যয়ের নাম মানুষ। মানুষ সব পারে এবং মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে — এই মানুষ নারীও বটে, পুরুষও বটে। সেখানে বিন্দুমাত্র ফারাক নেই — নারীকে পঙ্গু অথর্ব করাটা সমাজেরই কাজ, পুরুষশাসিত সমাজ সেই কাজ করেছে। নারী তাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে — কিন্তু পঙ্গুত্ব নারীর স্বভাবের অঙ্গ বা তার যোগ্যতার অভাব নয়। পুরুষ যে অবস্থার মধ্যে বিরাট হয়, তার সৃজনক্ষমতা আকাশ স্পর্শ করে সমাজে সেই একই পরিবেশ তৈরি করতে পারলে নারীর সৃজনও আকাশ স্পর্শ করতে পারবে।

এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রোকেয়া এতই অনন্য, অসাধারণ যে বিশশতকের গোড়ায় যাঁরা আমাদের সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির জগতে উল্লেখযোগ্য কাজ

করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও তাঁর সঙ্গে অবিকল তুলনা করা যায় এমন মানুষ খুব বেশি দেখি না। এই কালের একজন প্রধান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারীজাতির প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। করুণাবৃত্তিকে যদি মূল্য দিতে হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে, শরৎচন্দ্রের মতো নারীদরদী শিল্পী বাংলা সাহিত্যে নেই। কিন্তু নারী যে করুণার প্রত্যাশী নয়, যে কিছুই চাইবে না, কারো সাহায্য নেবে না, সে নারী দাঁড়াবে নিজের পায়ে, আর সব প্রাপ্য বুঝে নেবে অধিকার বলে, ভিক্ষা হিশেবে নয় — সেই স্রেফ 'মানুষ' নারীটিকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদ্রোহিনীদের পাওয়া গেলেও শাস্ত্র ও আচার শাসনই ভারতীয় নারীর জন্যে মঙ্গলজনক এই সিদ্ধান্ত শরৎসাহিত্য থেকে আমাদের শেষপর্যন্ত করতেই হয়। নারীর জন্যে এই অবস্থান রোকেয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। নারীকে তিনি মানুষ হিশেবে পুরুষের সঙ্গে একই সমতলে দাঁড় করিয়ে দিতে চান। এইখানে এসে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থানগত কোনো মৌলিক পার্থক্য কি রোকেয়ার নজরে পড়েছিলো?

যদি নির্যাতনের গুরুভার আর নৃশংসতার কথা ভাবা যায় তাহলে মুসলিম সমাজের মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে আর কারো তুলনা চলে না — কিন্তু এটাও ঠিক যে মুসলিম মেয়েদের উপর প্রায় সমস্তটাই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া, বোরকা বাইরে থেকে চাপানো, অন্তঃপুরের কয়েদখানায় শারীরিকভাবে বাইরে থেকে ঠেলে ঢুকনো, ধর্মের দোহাই দিয়ে বেড়িগুলো জোর করে মেয়েদের হাতে-পায়ে পরিয়ে দেওয়া। হিন্দু নারীসমাজে এই জবরদস্তিটা তেমন দেখা যায় না — সেখানে আচারের শাসন রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। নারীর মনই তৈরি হয়ে গেছে আচার প্রথা কুসংস্কারের ছাঁচে। এমন যে নিজের অধঃপতিত অবস্থানটিকেই নিজের যথাযোগ্য গর্বের অবস্থান বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা নেই। প্রথম ক্ষেত্রে কোমরে কাপড় বেঁধে লড়াইয়ে নেমে যাওয়া যায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শত্রুর খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শরৎচন্দ্রের মতো লেখকও নারীর শত্রুদের ঠিকমতো খুঁজে পান নি। রোকেয়া লড়াইটা দুই দিক থেকেই চালিয়েছিলেন। এখানে তাঁর জন্যে কোনো মোহ কাজ করে নি।

সাধারণভাবে যাকে উনিশ শতকীয় রেনেশাঁন্স বলা হয় তার ফল বাঙালি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের উপর কেমন হয়েছিলো রোকেয়া নিজের লেখায় নানা জায়গায় তা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' অভিভাষণে তিনি জানান, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজহিতৈষী

লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তন করে হিন্দুকে সবংশে খ্রীষ্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাঁদের নিজের স্কুল, কলেজ হলো — তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন। ··· অপরদিকে মোসলেম সমাজ তখন ঝোঁপড়ীমে শুয়ে মহলের খাব দেখছিলেন। সেই সময়ে আলোক এসে মোসলেমের ঝোঁপড়ীর ভাঙা চালের ভিতরও উঁকি মারলে। এই কথা লেখার পর রোকেয়া জানাচ্ছেন বিদেশী শিক্ষায় মুসলিমদের লাভ তেমন হয়নি। তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন মাত্র। বিদেশী শাসকের সহযোগীর ভূমিকায় শিক্ষিত মুসলিমদের বেগম রোকেয়ার খুব কাছ থেকেই দেখার কথা।

পর্দা, অবরোধ, ধর্ম ও আচারের শাসন, অর্থনৈতিক অধীনতা ইত্যাদি নানা কারণে মুসলিম সমাজের মেয়েদের যে অবনতি হয়েছে, রোকেয়ার মতে তা থেকে বাঁচার প্রায় একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরে রোকেয়ার মতো এতবড়ো স্ত্রীশিক্ষার সক্রিয় সমর্থক খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর কারণ আধুনিক শিক্ষার অভাবকেই শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মেয়েদেরই বিশেষ দুর্গতির উৎস বলে শনাক্ত করেছিলেন। সমস্ত জীবন কাজও করেছেন এই ক্ষেত্রে। শিক্ষা সম্পর্কে রোকেয়ার আলোচনা থেকেই বোঝা যায় আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা যেমন স্বচ্ছ তেমনই গভীর ছিলো, নিজের কালে পৃথিবীর নানা দেশ, নানা জাতি — বিশেষ করে মুসলিম জাতি — শিক্ষা অবলম্বন করে কোথায় এগিয়ে যাচ্ছে — আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে কোথায় পিছিয়ে পড়ছে তার ইতিহাসও তিনি জানেন।

অত্যন্ত তীব্র ভাষায় বেগম রোকেয়া লেখেন : "যদিও ইসলাম ধর্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানগণ অম্লানবদনে কন্যাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি অদ্যাপি অবাধে বধ করিতেছেন। ··· এখন শিক্ষার অবস্থা এই যে, আমাদের দেশের গড়পরতা প্রতি ২০০ (দুই শত) বালিকার একজনও অক্ষর চিনে না; প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলা বোধ হয় দশ হাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া যাইবে না। ভিক্ষাবৃত্তি সর্বাপেক্ষা নীচ কার্য। আর মুসলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী।"

দেশ ও সমাজকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বেগম রোকেয়া দিয়েছেন তাকে পরিপূর্ণ আধুনিক বলতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। এবং আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে রোকেয়ার ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে নিতেও কোনো বাধা নেই। এবং সেটা করতে গেলে এমন মনে হওয়া সম্ভব যে রোকেয়ার ভাবনা মুসলিম সমাজেও মোটামুটি গৃহীত হয়েছে, তার মূল

লক্ষ্যগুলিও অর্জিত হয়ে গেছে।

কথাটা হয়তো কিছুটা সত্যি। গত এক দশকে মৌলবাদ আর মৌলবাদের রাজনীতির দৌরাত্ম্য অনেক বেড়ে গেলেও বলতে পারি বাংলাদেশে যে একটা বড়ো মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে উঠেছে যেটা দেখতে পেলে বেগম রোকেয়াও মনে করতে পারতেন, যে মুসলিম সমাজের জন্য সমস্ত জীবন তিনি যা করতে চেয়েছেন তার অনেকটাই লাভ করা গেছে। এই কথাটা নেহাৎ উপরে উপরে সত্যি — রোকেয়ার চিন্তা সমাজের মূলে কতো দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে সেটা এখনো দেখার বিষয়।

তবু যদি নিরিখের কাজ এইটুকুই রাখি, তাহলে যে পশ্চিমবঙ্গে তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়ে গেছেন সেই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে ৫০/৬০ বছরে বেগম রোকেয়ার চিন্তার প্রভাব কতোটুকু পড়েছে জানতে ইচ্ছা করে। বোধ হয় ছবিটা হতাশাজনকই। রোকেয়া যে স্কুল খুলেছিলেন সেখানে বাংলাভাষার এতটুকু চর্চা ছিলো না — কারা ঐ স্কুলের ছাত্রী ছিলো — বাঙালি মুসলিম না, অবাঙালি ছাত্রী দিয়ে ভরা ছিল তাঁর স্কুল। কলকাতার বাঙালি মুসলমানের কোনো মাতৃভাষা নেই — বলেছিলেন তিনি, অভিভাবকরা তাঁকে চিঠি লিখতেন ইংরেজিতে বা উর্দুতে — বিশেষ করে তাঁকে সাবধান করে দিতেন যেন কোনোমতেই ছাত্রীদের বাংলা শেখানো না হয়, এক আধটু কোরান ছাড়া আর কিছুই শেখানোর দরকার নেই মেয়েদের। বোঝা যায়, যা ভাবতেন রোকেয়া তা কাজে পরিণত করার বিশেষ সুযোগ তিনি পাননি। ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন কি আজও হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখন কতো বড়ো — নাগরিক এবং গ্রামীণ মধবিত্ত শ্রেণী মেয়েদের কতোটা পর্দা এবং অবরোধ প্রথার বাইরে আনছে — মেয়েরা কিরকম হারে লেখাপড়া শিখতে পারছে, কতোদূর পর্যন্ত যেতে পারছে তারা, আর কি ধরনের বৃত্তিতে তারা নিযুক্ত আছে এ সমস্ত জানা অত্যন্ত দরকারি মনে হলেও আমি তেমন জানার সুযোগ পাই নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিচে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী — শিক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে — ভয়ানক অন্ধকারে উদ্ধারহীন ডুবে আছে, পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতিটা কি ভিন্ন!

বেগম রোকেয়ার সারা জীবনের সাধনা পুরোপুরি বিফলে গেলো কি?

[পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বিশিষ্ট অতিথির ভাষণ। অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।]

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ ঃ জীবন ও সাধনা (১৯০৮ - ১৯৬৪)

শহিদুল ইসলাম

উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর বাঙলার অভিজাত হিন্দু সম্প্রদায় যখন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য চঞ্চল, পার্শ্ববর্তী অভিজাত মুসলিম সমাজ তখন নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ। দ্বিতীয়ার্ধে যখন মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর চিত্ত-চাঞ্চল্যের শুরু, সেই সময় নোয়াখালী জেলার একটি অভিজাত পরিবার-প্রধান তাঁর পাঁচ পুত্রকে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন এবং পাঁচ পুত্রকেই বি.এ পাশ করান। কিন্তু তৎকালীন ধর্মান্ধ ও রক্ষণশীল মোল্লা-শাসিত সমাজের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ভেদ করে বাড়ির মেয়েদের আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে তিনি তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি। পরিবার-প্রধান মুনশী তামিজউদ্দীন নিজে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং সরকারি উকিল। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র মৌলবী ফজলুল করিম হলেন বেগম শামসুন্নাহারের পিতামহ। ফজলুল করিম ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে বি.এ এবং ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে বি. এল পাশ করেন। নোয়াখালীর প্রথম গ্র্যাজুয়েট। পিতা মোহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরী একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কিন্তু কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বেই মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। পরিবারে বাঙলা, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সী ভাষার চল ছিল। প্রমাতামহ আমজাদ আলীও ছিলেন ইংরেজি জানা সরকারী চাকুরে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারেব পেশকার ও পরে ব্যক্তিগত সহকারী।

পিতার মৃত্যুর পর মাতা আসিয়া খাতুন চৌধুরাণী তিন বছরের একমাত্র পুত্র হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ও ছয় মাসের একমাত্র কন্যা শামসুন্নাহারকে কোলে করে চট্টগ্রামে পিত্রালয়ে চলে আসেন। মাতামহ খান বাহাদুর আবদুল আজিজও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং উদারমনা শিক্ষাবিদ। তিনি তখন চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ পদে অধিষ্ঠিত ; তাঁর বাড়ির পরিবেশ ছিল মুক্ত। পড়াশুনার সুন্দর পরিবেশ। বাড়িতে 'মোসলেম ভারত', 'নবনূর', 'সওগাত', 'বসুমতী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রপত্রিকা রাখা হত। আজীজসাহেব ছিলেন একজন

সাহিত্যমোদী। মাতামহের এই সাহিত্য প্রীতি পরবর্তীতে বাহার ও নাহারের মনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল ভাবা যায়।

পড়াশুনার প্রতি নাহারের আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁকে চট্টগ্রামের ডঃ খাস্তগীর গার্লস স্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ষষ্ঠশ্রেণীর পর তাঁর স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তিনি তখন বড় হয়ে গেছেন। সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তাঁর উদার মাতামহও তাঁকে আর স্কুলে পাঠাতে সাহসী হলেন না। কিন্তু শিক্ষার প্রতি নাহারের গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে মাতামহ তাঁকে বাড়িতেই পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। রাখা হল একজন বৃদ্ধ হিন্দু শিক্ষক। বৃদ্ধ হলেও তিনি পরপুরষ। তার সামনে বের হওয়া শরীয়ত বিরোধী। তাই অভিনব পন্থায় পড়াশুনা চললো। টেবিলের মাঝ বরাবর একটি পর্দা ঝুলিয়ে প্রাইভেট পড়া শুরু হলো। ১৯২৬ সালে চারটি লেটার সহ শতকরা প্রায় আশি নম্বর পেয়ে নাহার প্রবেশিকা পাশ করলেন। মা, নানা-নানী সকলেই উচ্চশিক্ষার পক্ষে থাকলেও সমাজের ভয়ে সে পথ মাড়াতে কেউই সাহসী হলেন না। অবশেষে পথ বের করা হলো। বিয়ের পর স্ত্রীর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করবেন — এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার ওয়াহীদউদ্দিন মাহমুদ তাঁকে বিয়ে করলেন। ডাঃ মাহমুদ সে প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

কলকাতার ডায়োশিসন কলেজে ভর্তি করা হল শামসুন্নাহারকে। ঐ কলেজে কলকাতার অভিজাত হিন্দু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মেয়েরা পড়াশুনা করতেন। আপাদমস্তক বোরখা ঢাকা শামসুন্নাহার সেখানে একেবারেই বেমানান। এরপর আত্মীয় স্বজন ও মুসলিম অভিজাতশ্রেণীর কম গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়নি তাঁকে। কিন্তু শিক্ষক-সহপাঠী সকলকে অবাক করে দিয়ে নাহার ১৯২৮ সালে আই. এ তে বিংশতিতম স্থান দখল করেন। প্রথম পুত্র মামুনের জন্মের কারণে আবার পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। কিন্তু সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। ১৯৩২ সালে তিনি প্রাইভেটে বি.এ পাশ করেন ডিস্টিংশন সহ। ১৯৪২ সালে এম. এ. পাশ করেন দীর্ঘ দশ বছর পর। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে আয়োজিত এ্যালবার্ট হলের শোকসভায় শামসুন্নাহার সুন্দর ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। ১৯৩৯ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বি.এ পাশ নাহারকে বাঙলা বিভাগের প্রধান হিসেব নিয়োগ দান করেন। শর্ত থাকে তিন বছরের মধ্যে এম. এ পাশ করতে হবে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তাঁকে ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজে বদলী করা হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দেন।

সমাজসেবা ঃ কেবল উচ্চশিক্ষা লাভ করে শামসুন্নাহার তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতা ও সামাজিক অন্ধকার তাঁকে সব সময় পীড়িত করে। তাই বেগম রোকেয়ার সহকর্মী হয়ে তিনিও সেই অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামেন। নানাবিধ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। রোকেয়া-প্রতিষ্ঠিত 'নিখিলবঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি'র সম্পাদিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে'র কলকাতা শাখায় যোগ দেন। এই সম্মেলন ভারতীয় নারীদের সর্বতোমুখী উন্নতির জন্য তাদের শিক্ষা, সামাজিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা আদায়, দুঃস্থ ও দুর্গত নারীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ ও সাহায্য করার ব্যাপারে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিষ্ঠান তাঁকে বহু উচ্চশিক্ষিত-অভিজাত হিন্দু মহিলার সংস্পর্শে আসার সুযোগ করে দেয়। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মিসেস সাধনচন্দ্র রায় ও তদীয় কন্যা রেণু চক্রবর্তী, লেডী রাণু মুখার্জী, এন. সি. সেন ও বি. এম. সেন, মিসেস এ. সি. মুখার্জী, রেণুকা রায়, মিসেস জ্ঞানাঙ্কুর দে, মিসেস ডি. এল. মজুমদার, লেডী প্রমিলা মিত্র, লেডী অলকা বসু, শান্তা দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কয়েক বছর সমিতির সম্পাদক হিসেবে, অতঃপর কয়েক বছর কেন্দ্রীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য রূপে কাজ করার সুবাদে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য তিনি ভারতবর্ষের বড় বড় শহর ঘুরবার সুযোগ পেয়েছেন এবং কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর পরিচয় হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভারতের স্বনামখ্যাতা মহিলা মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কাউর, ময়ুরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী, বেগম হামিদা আলী, লেডী আব্দুল কাদির, বেগম শাহনওয়াজ প্রমুখের সঙ্গে। এসব অধিবেশনে ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ করার সময় ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলনে তিনি সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন। এছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষাবোর্ড, প্রাদেশিক টেক্সটবুক বোর্ড, কলকাতা লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উচ্চবালিকা বিদ্যালয়, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্য হিসাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে তিনি বাঙলার মুসলমান নারীসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। উক্ত সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করেন এবারডিনের মার্কুইজ পত্নী ইসাবেনা। এছাড়া তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অব্ উইমেন, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্

উইমেন ইন ইন্ডিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৪ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে শিক্ষা ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এম. বি. ই. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

দেশভাগের পর তিনি ঢাকায় যান। তৎকালীন পাকিস্তানেও তিনি বিভিন্ন সমাজসেবা-সংগঠনে যোগ দেন। তিনি 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির' সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সরকার মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্যে যে কমিশন গঠন করে শামসুন্নাহার সেই কমিশনের সদস্য ছিলেন। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় ১৯৬১ সালে 'পথ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র' স্থাপিত হয়। ১৯৬৩ সালে তিনি সমগ্র পাকিস্তানের শিশুকল্যাণ পরিষদের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠার কাল থেকে এর সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। পরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রীও হয়েছিলেন। 'সওগাত' সম্পাদক নাসিরুদ্দিন ও তার কন্যা নূরজাহান বেগমের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'বেগম ক্লাবের' তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। ১৯৫৫সালে 'বাংলা একাডেমী' প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, প্যারিস, রোম, কলম্বো, টোকিও প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। টোকিওর নারী সম্মেলনে 'মানবাধিকারে নারীর স্থান' শীর্ষক আলোচনায় সুচিন্তিত ও সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করে তিনি সকলের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে ঢাকার দৈনিক পূর্বদেশ সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেন যে, এক যুগ-সন্ধিক্ষণে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন "সমাজে তাঁর সাথী ছিলনা, সঙ্গী ছিল না, তাঁর সাধনার অনুকূল পরিবেশ ছিল না, বরং ছিল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু সব বাধা, সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এই মহীয়সী কর্মী মহিলা নিজের তথা দেশের নারী সমাজের অগ্রগতির পথ রচনা করেন।" মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রেখে যান। বড় ছেলে মামুন মাহমুদ রাজশাহীর ডি. আই. জি. অব্ পুলিশ থাকাকালে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ও নিহত হন। ১৯৮১ সালে বাঙলাদেশ সরকার তাঁকে মরণোত্তর 'স্বাধীনতা দিবস' পুরস্কারে ভূষিত করেন।

সাহিত্য সাধনা ঃ তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'প্রণতি' মাত্র ১২ বছর

বয়সে লেখা। প্রকাশিত হয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকায় ১৩২৭ এর আশ্বিনে। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'পূণ্যময়ী' ১৯২৫ সালের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। শুরুতেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি নাতিদীর্ঘ আশীর্বাণী বুকে ধারণ করে বইটির প্রকাশ ঘটে। বইটি আটজন মুসলিম মহীয়সীনারীর জীবন-চরিত। তাঁর ১৭ বছর বয়সে বইটি প্রকাশিত হলেও ১০ বৎসর বয়সে তিনি যখন মাইনর পাশ করে ঘরে বন্দীজীবন যাপন করছিলেন, প্রবন্ধগুলি তখনকার লেখা। শহীদুল্লাহ্ বইটির প্রশস্তিতে লেখেন "লেখিকার হাতে নারী চরিত্র ফুটিয়াছে ভাল। লেখিকা বয়সে নবীনা, কাজেই আবেগময়ী, তাঁহার ভাষা তাঁহার আবেগ বহন করিয়া গুরুগম্ভীর রবে চলিয়াছে।" প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখিকা 'আত্মকথা' শিরোনামে তৎকালীন মুসলিম সমাজে নারীর দুর্দশা ও কঠোর অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে শক্ত ভাষায় তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেন। "যদিও কয়েক বছর আমি চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছি, কলেজের উচ্চশিক্ষা আমার ভাগ্যে হয় নাই। কেন হয় নাই তাহা বোধহয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অবরোধের কুলিশ-কঠোর মারণযন্ত্রই আমাকে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আমার সতীর্থ মেয়েরা (অন্য ধর্মাবলম্বী - শ. ই.) আজ বেথুন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। 'দিদি' জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী জ্ঞানপিপাসার শান্তিবিধানের জন্য ইংলণ্ড ছুটিয়া গিয়াছেন। আর আমি জিন্দান খানায় খাঁচার পাখীর মত দুর্বহ জীবন যাপন করিতেছি। পর্দা ঐসলামিক প্রথা স্বীকার করি। কিন্তু অবরোধ সম্পূর্ণ অনৈসলামিক। হজরতের সময় অবরোধ ছিল না। আব্বাসিয়া ও ওম্মিয়া শাসনের সময়ও ছিল না ও বর্তমান মুসলিম জাহানে কোথাও অবরোধ নাই। অবরোধের অত্যাচার কেবল বাঙলার মুসলমান সমাজে।" এরপর তিনি মুসলমান সমাজপতিদের উদ্দেশ্যে বলেন — "সমাজতরণীর কর্ণধারগণ, এ বিষয়ে অবগত হউন — মেয়েদের হৃদয়মন উচ্চশিক্ষার আলোয় আলোকিত করুন।" ১৯২৫ সালে এদেশের মুসলিম সমাজের এমন অবস্থা এখন ভাবাই যায় না। 'পূণ্যময়ী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় আট বছর পর ১৯৩৯ সালে ১লা বৈশাখে। ২য় সংস্করণের ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন — "এই সময়ের মধ্যে দুনিয়ায় অনেক উত্থান পতন হইয়া গিয়াছে। আমাদের নারী সমাজেও বেশ একটা পরিবর্তনের ঢেউ লাগিয়াছে। আমাদের ঘুমন্ত নারী সমাজে আজ সত্যই একটা বিরাট জাগরণের সূচনা দেখা যাইতেছে। আমি পর্দার তাড়নায় বাল্যেই গৃহকোণে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ আমিও

বি.এ. পরীক্ষা শেষ করিলাম।"

পরের বই 'ফুল বাগিচা' ছোটদের জন্য গল্প ও মহত্ত্ব কথা সমষ্টি। এরপর তিনি পাঠান ও মোগল বেগমদের বিচিত্র জীবন কাহিনী অবলম্বন করে 'বেগম মহল' লেখেন। প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। নারী জাগরণের দিকে লক্ষ্য রেখেই বইখানি লেখা। তাই যদুনাথ সরকার বইখানা সম্পর্কে বলেন — "সমাজের অর্ধ অংগ, সাম্রাজ্যের যাঁহারা অনেক সময় প্রকৃত প্রস্তাবে 'রাজার উপর রাজা' ছিলেন সেইসব মহিলাগণ পর্দার ভিতর কি খাঁচার পাখীর মত বাস করিতেন? এ প্রশ্নের উত্তর যে গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয় অধিকার করিবেই।"

তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'রোকেয়া জীবনী' ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে ভাই বাহার কর্তৃক কলকাতার বুলবুল পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। মায়ের আগ্রহে ও ভায়ের উৎসাহে তিনি বইটি লেখেন। রোকেয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিল। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বইটি সম্পর্কে বলেছেন, 'সুলেখিকা শামসুন্নাহার সাহেবা রোকেয়ার এই জীবনীখানি রচনা করিয়া সকলের সাধুবাদ অর্জন করিয়াছেন। আমরা জানি রোকেয়ার সবচেয়ে বড় সংগ্রাম ছিল তৎকালীন রক্ষণশীল ও ধর্মান্ধ মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে। মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলন ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। শামসুন্নাহার রোকেয়ার সার্থক উত্তরসূরী ও যোগ্য উত্তরাধিকারী। সেই তাগিদ থেকেই তিনি রোকেয়ার জীবনী লিখতে উৎসাহী হন। সভ্যতার বা সমাজের অগ্রযাত্রা এভাবেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সংযোগ ঘটায়। প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার বিষয়টি চমৎকার উল্লেখ করেছেন 'রোকেয়ার জীবনী' রচয়িতা শামসুন্নাহার সম্বন্ধে। "এই জীবনী যিনি লিখেছেন, তিনিও সামান্যা নহেন। তিনি যে এমনভাবে এই চরিত্রটি গড়িয়া তুলিয়াছেন তার কারণ তিনি এই জীবনকে মনে ও প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। ..... যে আদর্শ ওই জীবনে ও চরিত্রে বিদ্যমান ছিল, সেই আদর্শকে তিনি নিজের অন্তরে চাক্ষুষ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ও ঐ একই ছাঁচে গড়া।" বইয়ের ভূমিকায় লেখিকা জানান যে, রোকেয়ার জন্মের দুই বছর পর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। নাহারের মাতামহ আবদুল আজিজ ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালে এই সমিতির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। পিতামহ ফজলুল করিম ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বজলুর রহিমও ঐ উদ্যোগের সাথে যুক্ত ছিলেন। ঐ সমিতি বালিকা ও মহিলাদের জন্য ঘরে ঘরে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। হিন্দু, ব্রাহ্মণ নারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী লাভের

জন্য ঘরের বাইরে এলেও মুসলিম মেয়েদের জন্য তখন তা ছিল কল্পনারও অতীত। নাহার লিখছেন "ইহারা স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে উদার মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।" আসলে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি উক্ত সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'সম্মিলনী' সম্পর্কে যে কথাটি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলতে হয় তা হল উক্ত সম্মিলনী ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গের' বিরোধিতা করে। 'এতে ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থক্ষুণ্ণ হবে এবং মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে' এই ভেবে। কারণ তখন কলকাতাই ছিল শিক্ষা সহ সকল আধুনিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধাচরণ ও অসহযোগিতার কারণে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। শামসুন্নাহারের ভাষায় — "দেশের আম-দরবারে বিরাটভাবে সাড়া জাগানো সম্মিলনীর নবীন কর্মীসংঘের পক্ষে সম্ভব হয়নি।" তাই 'রোকেয়া জীবনী'তে নাহার লিখছেন — "কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল সেদিন, যেদিন আলোকের দূতী রোকেয়ার অপূর্ব প্রাণের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আমাদের জীবনে মধ্যাহ্ন তখনো আসে নাই।" নাহার তাঁর বইতে রোকেয়ার মুখ দিয়ে নিজের অন্তরের কথাই বলার চেষ্টা করেছেন। স্ত্রী শিক্ষা বিরোধী ধর্মের ধ্বজাধারীদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য — "শিক্ষা না পাইলে লোকে স্রষ্টাকেও চিনিতে পারে না। যে সকল মোল্লা স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়, তাহারা ছদ্মবেশী শয়তান।"

শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে "শিশুর শিক্ষা" তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ। তথ্যে ভরপুর। এই বইটি পড়লে শিশুপালন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ৭-৪-৩৯ তারিখে লেখেন —

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার সকল রচনাকেই
আমি অন্তরের সাথে প্রশংসা
করে থাকি। কী ভাষায়
কী মননশক্তিতে কী সরসতায়,
তোমার লেখা যে বিশিষ্টতা
লাভ করেছে আমি তার
প্রশস্তিবাদ তোমাকে পাঠাই
তোমার গ্রন্থে তার ব্যবহার

করতে পার। ইতি ৭/৪/৩৯

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বইটির ভূমিকা লিখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য খান বাহাদুর এম. আজিজুল হক। বইটির প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৪৬। আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা অন্য কোন কবির কবিতার দু/চারটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। যেমন প্রথম অধ্যায় 'গোড়ার কথা' শুরু হয়েছে নীচের কবিতাংশ দিয়ে —

ইহাদের কর আশীর্বাদ
ধরায় উঠেছে ফুটি ক্ষুদ্র শুভ্র প্রাণগুলি
স্পন্দনের এনেছে সংবাদ।

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্যা হিসাবে তুরস্ক সফরের উপর লেখা তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'আমার দেখা তুরস্ক' একটি ভ্রমণ কাহিনী। সবশেষ গ্রন্থ 'নজরুলকে যেমন দেখেছি', প্রকাশকাল ১৯৫৮ সাল। শামসুন্নাহারের উপর কাজী নজরুলের প্রভাব অপরিসীম। নজরুলকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। তিনি যখন প্রবেশিকা পাশ করে ঘরে বন্দিনী, তখন ১৯২৬ সালে নাহারের অগ্রজ হবীবুল্লাহ বাহার কবিকে সঙ্গে করে তাঁদের চট্টগ্রামের বাড়ি নিয়ে যান। নজরুল একমাস সেখানে থাকেন। বহু কবিতা লেখেন, সেগুলি পরে 'সিন্দু হিন্দোল' ও 'চক্রবাক' বইতে স্থান পায়। 'সিন্ধু-হিন্দোল' বইখানি কবি বাহার-নাহার ভাইবোনকে উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয়বার কবি আমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের বাড়িতে আসেন ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে। কবির উপস্থিতি এবারও চট্টগ্রামে দারুণ সাড়া জাগায়। কিন্তু ১৯২৯ সালে নাহারের পরিবারের মত মুক্ত আবহাওয়াতেও বাড়ির মেয়েরা বাইরের জগতের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করার অধিকার পায়নি। বইতে নাহার লিখেছেন, "ফাঁকে ফাঁকে আড়াল আবডালে থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে বাহির বিশ্বের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ পরিচয় করার চেষ্টা চলতো আমাদের বাড়ির মেয়েদের। আর আমি? আমি তখন সবে নতুন বন্দিনী। উচ্চশিক্ষার জন্য আমার চলছে বিদ্রোহ।" নজরুল একবার তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজনে তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি।"

কলকাতায় বাসকালে নাহারের নজরুলের সঙ্গে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে নাহার বলেছিলেন — "তোমরা জন্মেছ উজ্জ্বল আলোকের প্লাবনের মধ্যে আর আমাদের জন্ম গভীর অন্ধকারে। অন্ধকারেই হয়েছে যাত্রা শুরু। অন্ধকার ভেদ করে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি আমরা আলোকের তীরে।" সেই যুগ-অন্ধকার ভেদ করতে বেগম শামসুন্নাহারকে অনেক কষ্ট, অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে, অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। তিনি ১৯৩৯ সালে ব্রেবোর্ণ কলেজে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের সদস্য হিসেবে নির্বাচন লড়ে যুক্তফ্রন্টের সদস্যের কাছে পরাজিত হন। তবুও তিনি ধর্মান্ধ রক্ষণশীলদের হাত থেকে নিস্তার পাননি।

"সকল প্রকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ বর্জিত হইয়া সাহিত্যকে শুধু সাহিত্যের দিক হইতেই আলোচনা ও প্রসার করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত 'বঙ্গ সাহিত্য সংসদের' মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা হন বেগম মাহমুদ। সংসদের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয় এভাবে — "ধর্ম বিরোধিতা বা রাজনীতিকে এড়াইয়া চলা এই সংসদের উদ্দেশ্য নহে। ধর্মভাব ও রাজনীতি লইয়া যদি কোথাও সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাহা যেমন এই সংসদের আলোচনা ও প্রচারের বিষয়, অন্যদিকে ধর্ম-রাজনীতি পরিবর্জিত হইয়া যদি কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তবে তাহাও এই সংসদের প্রচারের বিষয়।" ১৯৩৯ সালের ছয় ও সাত মে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা শাখার সভাপতিত্ব করেন বেগম শামসুন্নাহার। অধিবেশনটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। অনেকের মধ্যে বক্তৃতা করেন সরোজিনী নাইডু ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর সপ্তম অধিবেশনের (১৯৪৩ সালের আট মে) শিশু সাহিত্য শাখাব সভাপতিত্ব করেন নাহার। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহনবীশ, আবু মহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ প্রমুখ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন তিনি বহু আগেই। কলকাতা থাকার সময় কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু শামসুন্নাহারের সাহিত্যজীবনেব সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি ও পাওনা কবির মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবে মহিলা শাখার সভানেত্রীত্ব করার আমন্ত্রণ লাভ এবং ১৯৪১ সালের প্রথমে তাঁর শান্তিনিকেতনে গমন এবং তিনদিনের জন্য উত্তরায়ণের আতিথ্যগ্রহণ। সেখানে মৃত্যুপথযাত্রী কবি, শ্রীমতি ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, শ্রীমতি সরলা দেবীচৌধুরাণী সহ কবির পরিবার-

সদস্যদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

শামসুন্নাহারের বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার সব হদিশ আজও পাওয়া গেছে, তা নয়। মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন — "মুসলমান নারী সমাজ শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহান্বিত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক সংস্কার ও অবরোধ প্রথার কারণেই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও তারা শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।" ১৯৫৯ সালে আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল পরিচিতি' গ্রন্থে নজরুলের প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে যাঁরা লিখেছিলেন বেগম মাহ্মুদ তাঁদের একজন।

শামসুন্নাহার 'নওরোজ' ও 'আত্মশক্তির' মহিলা বিভাগের সম্পাদনা করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। ১৯৩৩ সালে ভাই বাহারের সাথে যুগ্ম সম্পাদনায় 'বুলবুল' নামে একটি উন্নতমানের পত্রিকা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অন্নদাশঙ্কর, আবুল ফজল, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী, কাজী আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ পত্রিকার সুখ্যাতি করেন এবং লেখেন। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি 'শুভবুদ্ধির আহ্বান' নামে ছাপা হয়। কবি সেখানে বলেন — "আত্মবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিদ্বেষে দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে, সেই পরম দুর্যোগের দিনে নিষেধের বাণী কোথাও ধ্বনিত হতে পারল একে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি।.... এই দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে দেশের নির্বোধ জড়ত্বে যে বেদনার সঞ্চার আরম্ভ হয়েছে তোমাদের পত্রে এ তারই লক্ষণ সূচিত।"

উপসংহারে একটা কথা বলতেই হয়। আমরা যখন কোন মহৎ ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করি, তাঁর কালের মাপকাঠিতেই তাঁকে বিচার করি, তখন বর্তমানকে সামনে রাখা দরকার। বেগম রোকেয়া বা বেগম নাহারের কাল আজ আর নেই। আজকের বাংলার মুসলমান মহিলারা অবরোধের অমানবিক পীড়নের প্রাচীর ভেঙ্গে বের হয়ে এসেছে। আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করে আজ তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। এঁদের কাছে রোকেয়া ও নাহারের কাল ইতিহাস মাত্র। কিন্তু আজকের পৃথিবীর অপর জাতি, অন্যদেশ বা অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের অগ্রযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে বাঙালি মুসলিম সমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে একটি কঠিন প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাহল, গর্ব করার মত আমরা সত্যি কি কিছু গড়তে পেরেছি?

[জানুয়ারী ৩০, ১৯৯৪ সালে মৌলালী যুবকেন্দ্রের হলঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য প্রেরিত। লেখক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।]

রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা — ৫

'ইদানীং' ও তার প্রায়-বিস্মৃত লেখক পরিমল রায়

ইন্দ্রানী চক্রবর্তী

কোন এক ভীল রমণী একদা একটি গজমুক্তা কুড়িয়ে পেয়েছিল। যখন সে টিপে দেখল সেটি পাকা কুল নয়, তখন ছুঁড়ে ফেলে দিল। অরসিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপমাটি ধার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে অরসিককে বর্বর রমণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এমনতর একটি ভূমিকা করার প্রয়োজন হয়েছিল 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থটির জন্য। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের সমাপনেও ছিল এক বিস্তৃত কৈফিয়ৎ। কারণ দুটি গ্রন্থেই কাজের কথা বা জ্ঞানের কথা বলতে তেমন কিছু ছিলনা; ছিল লেখকের নিজস্ব অনুভবের কথা বা 'বাজে কথা'; যে 'বাজে কথা'র মধ্যেই মানুষকে যথাযথভাবে চেনা যায় বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবন্ধ যখন এমনি লেখকের অনুভবের রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে লিরিকের মতো — তখনি তা হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

কিন্তু বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে ভয় পায়না এমন বালক এবং সমালোচনার চাবুক হাতে সমালোচককে ভয় পাননা এমন লেখক বোধহয় নেই। তাই নিজের অনুভবের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতির্ময় রায়, এমনকি অতি স্পষ্টবাদী বিনয় ঘোষও বড়সড় একটি কৈফিয়ৎ দিয়ে রেখেছেন। আমাকেও দিতে হল।

তবু বলি, একটি গজমুক্তা বা একখণ্ড স্ফটিক কেজোদের জগতে নেহাৎই অকেজো মনে হলেও প্রিয়জনকে উপহার দিতে গেলে এদেরই ডাক পড়ে। কয়লায় বিস্তর কাজ চললেও এক ঝুড়ি কয়লা উপহার দেবার রেওয়াজ নেই। পরিমল রায়ের 'ইদানীং' এমনি একটি স্ফটিক খণ্ডের মতো সুন্দর ও অমূল্য। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের এই প্রায়-বিস্মৃত সংকলনটির দ্যুতি যে আজও অম্লান তা একটু নাড়াচাড়া করলেই বোঝা যায়।

'ইদানীং' প্রসঙ্গে যাবার আগে একটু বলে নিই কেন এই গ্রন্থটিকে আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হল।

কোন প্রায়-বিস্মৃত লেখককে স্মরণ করা হয় সাধারণতঃ চারটি কারণে — (১) সাহিত্যের কোন একটি শাখার ঐতিহাসিক ধারা রক্ষায় তাঁর ভূমিকার জন্য, (২) কোন বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য যুক্ত বলে অর্থাৎ সমাজ-ইতিহাসের ধারাটি বুঝে নেবার জন্য, (৩) বর্তমানের প্রেক্ষিতে তিনি প্রাসঙ্গিক তাই, (৪) এখনও পড়তে ভালো লাগে বলে।

পরিমল রায় সম্পর্কে একদম শেষের যুক্তিটিকে প্রথমে আনতে চাই; পরিমল রায়ের লেখা পড়তে এখনও ভালো লাগে। কিন্তু ভালো লাগা, বিশেষতঃ আমার ভালো যুক্তি হিসেবে শেষ কথা তো নয়ই, মজবুতও নয়। তাছাড়া, সাহিত্য শুধু ভালোলাগার বিষয় নয় — শুধু রম্য নয় — তার মধ্যে অনুভবের গভীরতা না থাকলে — তাকে রূপসর্বস্ব, অন্তঃসারশূন্য মানুষের মতো আমরা হেয়জ্ঞান করবো। ঠিক 'শেষের কবিতা'র সিসি লিসির মতো সে সাহিত্য সুন্দর হবে, ব্যক্তিত্বময়ী হবেনা। সিসি লিসির সঙ্গে লাবণ্যের আসল পার্থক্য যেমন ঐ ব্যক্তিত্বে — তেমনি পার্থক্য রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধে। পরিমল রায়ের রচনায় সেই ব্যক্তিত্ব রয়েছে। তাই শুধু ভালোলাগা নয়, তাঁর রচনা আমাদের ভালোবাসায় এবং ভাবায়।

এই যুক্তির সূত্র ধরেই চলে আসছে তার আগের যুক্তি। পরিমল রায়ের রচনা এখনও প্রাসঙ্গিক কিনা! আমার মনে হয়েছে প্রাসঙ্গিক। কেন মনে হয়েছে — তাঁর লেখা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করবো।

কোন বিশেষ সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে পরিমল রায়ের সাহিত্য যুক্ত নয়। তবু মানতেই হয় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের ধারায় এ রচনার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। আছে বলেই আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর লেখা প্রাসঙ্গিক।

এবার ফিরে যাই প্রথম যুক্তিতে। সাহিত্যের কোন শাখার ইতিহাসের ধারা বুঝে নেবার জন্য তাঁর সাহিত্য কর্ম বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন কিনা। এক্ষেত্রেও উত্তর 'হ্যাঁ' এবং সাহিত্যের সেই বিশেষ শাখাটি হল ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা Personal essay। পরিমল রায়ের গ্রন্থ বিশ্লেষণে যাবার আগে আরেকটি কথা বলার আছে। এই আলোচনার শুরুতে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আসায় আমার একান্ত বন্ধু খুবই ক্ষিপ্ত হন — 'শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ কেন? রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কি বাঙালী কথা শুরু করতে পারেনা!' মনে হয়েছে এর একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। উত্তরটি

এ আলোচনায় প্রাসঙ্গিকও।

এক তো আলোচনা হচ্ছে ইদানীং নামক ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন নিয়ে তাই রবীন্দ্রনাথ। কারণ বঙ্কিমের হাতে বাংলা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সূচনা হলেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম সচেতনভাবে এই সাহিত্য প্রকরণের স্বরূপ নির্ণয় করেন এবং তাঁর অনুভব ও উপস্থাপনায় এ জাতীয় প্রবন্ধকে সার্থক করে তোলেন।

দ্বিতীয়তঃ যতোদিন কোনো কথা বলতে গেলেই রবীন্দ্রনাথ এসে পড়বেন — ততোদিন বুঝতে হবে — তঁকে বাদ দিয়ে কথা বলার ক্ষমতা আমাদের নেই। — প্রয়োজনও নেই।

এই সবে সবে বিভূতিভূষণ জন্মশতবর্ষ পালিত হল। বিভূতিভূষণ আজও আমাদের কাছে কতো প্রিয় — নূতন করে বুঝলাম। তার প্রধান কারণ বিভূতি ভূষণ ভীষণ সৎ নিজের চেতনার কাছে।

আসলে স্বতন্ত্র হবার একটা কৃত্রিম চেষ্টা আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। কারণ, বুদ্ধির লক্ষণই হল স্বাতন্ত্র্য। আর বুদ্ধি কম আছে এমন কথা স্বীকার করতে আমরা কেউ রাজি নই। কিন্তু, খতিয়ে দেখলে দেখবো বুদ্ধির থেকেও বড়ো একটা একটা শব্দ আছে 'বোধ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো বলা যায় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা দরকার। বুদ্ধি দিয়ে অবুদ্ধির কাঁটা তুলে বুদ্ধি, অবুদ্ধি দুটিকে বিসর্জন দিলে আমরা বোধে পৌঁছতে পারি।

রবীন্দ্রনাথকে কথায় কথায় আমরা স্মরণ করি। কারণ তিনি সেই বোধের সঞ্চার করেছেন তাঁর সাহিত্যে। এই বোধের প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ এমনকি পরিমল রায় সহমর্মী। এঁদের প্রথম তিনজনকে আমরা ভালোবাসি আজও গভীরভাবে। কারণ, জীবন যতো জটিল, দ্রুতগামী, সংকীর্ণ, স্বার্থপর হয়ে উঠছে — ততোই আমরা বুঝছি বোধের গভীরতায় স্থিত হওয়া আমাদের প্রয়োজন। নয়তো আমরা শুধুই ক্লান্ত হবো, ফুরিয়ে যাবো। পরিমল রায় আমাদের এই বোধের ঠিকানা দেবেন।

মনে হতে পারে সেই বোধে পৌঁছনো বুঝি সহজ নয়; তা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধর সাহিত্যিক বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো যোগীর পক্ষে সম্ভব — আমজনতার পক্ষে অসম্ভব। তা কিন্তু একেবারেই নয়। আসল কথা আমাদের একটু সৎ ও সাহসী হওয়া প্রয়োজন। জীবনের অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত একটি জীবনদর্শন আমাদের সকলের আছে; কিন্তু আমাদের কজনের সৎ-সাহস আছে সেই অভিজ্ঞতাকে যুগের চল্‌তি হাওয়া, পাণ্ডিত্যের তাচ্ছিল্য বা মূর্খের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে অকপটে প্রকাশ করার? অর্থাৎ

মূল কথাটি হল সততা; নিজের অনুভবের কাছে, অভিজ্ঞতার কাছে সৎ থাকা, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ এবং পরিমল রায় তা ছিলেন।

মানুষের সুখ বা তৃপ্তি আসলে খুবই ছোট ছোট উপকরণের ওপর নির্ভরশীল — এই সত্য বুঝতে, মানতে ও প্রকাশ করতে কোন দ্বিধা ছিলনা পরিমল রায়ের। এই সততাই মানুষকে অনায়াসে পৌঁছে দেয় জীবনের গভীরতম বোধে। জীবনের গভীরতম প্রাপ্তি ঘটে — সহজতম পথে।

পরিমল রায়ের রচনা থেকে এ জাতীয় সততাকে একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। কারণ, আজ আমরা ক্রমে সরে যাচ্ছি সততা, শান্তি, বোধ থেকে। জীবন যে উপভোগের বস্তু — শুধু প্রতিযোগিতা বা ভোগের নয় সেকথা ভুলে যাচ্ছি। জীবনে ভোগ্যবস্তুর আয়োজন যেমন বেড়েছে — তেমনি বেড়েছে ভোগের অস্বাভাবিক স্পৃহা, সর্ব বিষয়ে মানুষের লুব্ধ সঞ্চরণ। পরিমল রায় ভোগ আর উপভোগের সীমারেখাটি ভারি সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন —

"যেখানে কোনো ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ নাই, কেবল দেহের কতকগুলি কৌতূহলগ্রাহী কোষের স্ফূর্তিমাত্র আছে, সেখানে উহা নিছক উপভোগশক্তির বিকার। 'উপভোগ' শব্দটির মধ্যে ভোগের একটি মুখ্যরূপের ইঙ্গিত আছে। ভোগ্যের মধ্যে একটি প্রধান হইলেই অপরগুলি উপভোগ্য পর্যায়ে পড়ে। উপভোগ সেখানে উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তির পরিচয়, প্রাচুর্যের নিদর্শন। কিন্তু যেখানে একমুষ্টি মনোহীন সজীবতা হাজার খানেক বদ্ধ জলাশয়ে ব্যাঙের ন্যায় লাফালাফি করিতেছে মাত্র, সেখানে হৃদয়দিগন্তে সমুদ্র রেখার ইঙ্গিত কোথায়? এধরণের সর্বগ্রাসী উৎসাহে কোনো মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। কোনো মূলের সন্ধান নাই। কারণ ইহাতে কোনো প্রকৃত শক্তির কিংবা সাধনার ইঙ্গিত নাই।"

উপভোগ করাও যে একটা আর্ট — তা সাধনা সাপেক্ষ এবং তার জন্য প্রয়োজন প্রখর আত্মসচেতনতা — আমরা কি চাই আর কি চাইনা সে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিন্তা — এসব কথা আজ আমাদের নূতন করে ভাবা প্রয়োজন।

পরিমল রায় ভীষণ ভাবে অপছন্দ করতেন বহু বিষয়ে লুব্ধ সঞ্চরণ। সাধনা, একাগ্রতা ও অনুরাগে বিশেষ কিছুকে আয়ত্তে করাই ছিল তাঁর স্পৃহনীয়। এই সাধনা একাগ্রতা এক বিশেষ ধরনের মন ও চরিত্র ছাড়া সম্ভব নয়। সে মন হওয়া প্রয়োজন অন্তর্মুখী, মননকেন্দ্রিক। পরিমল রায়ের সে মন ছিল। তিনি ছিলেন আত্মসচেতন। নিজের পরিধি, ক্ষমতা, অক্ষমতা সম্বন্ধে ছিল দৃঢ়, স্পষ্ট ধারণা। তাঁর চোখের দৃষ্টি যে খুব সজাগ নয় সে সম্পর্কে তিনি খুব সজাগ। কারণটাও

তাঁর অজানা নয়। আসলে ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত চর্মচক্ষুর ব্যবহার তাঁর অভ্যাস নয়। তিনি নিজেই অনুভব করেন, তাঁর স্বভাব অন্তর্মুখী এবং বাইরের জগৎ অপেক্ষা মনোজগতে তাঁর চেতনা অধিকতর জাগ্রত। মনোজগতের বাসিন্দা বলেই জানেন সে জগতের অনির্বচনীয় আনন্দকে। তাই নির্দ্ধিধায় বলেন—

"চক্ষুষ্মানের জীবন বৈচিত্র্যহীন। তিনি যে চোখের একদৃষ্টিতে সবই দেখিয়া সারিয়াছেন। কিছুই তাঁহার অজানা নাই। কিন্তু আমার মত চক্ষুহীনের নিকট দু'দণ্ড বসিলে নানাবিধ সম্পদের অকুণ্ঠ দানে মনের ভাণ্ডার ভরিয়া ওঠে। অপরে যখন তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, 'আচ্ছা, অমিয়বাবু, আপনার শরীরটি এত রোগা কেন? কিছু চিকিৎসাপত্র করুন।' তখন সহসা উপলব্ধি হয় ইনি হাড়পাঁজরা বাহির করা চামচিকা সদৃশ অতি কৃশকায় ব্যক্তি। অথচ আমার নিকট তাঁহার যে পরিচয়, সেখানে দেহসৌষ্ঠবের কোনো সম্পর্ক নাই। তাঁহার আবয়বিক দিকটা কোনদিন নজরেই পড়ে নাই। বলা বাহুল্য, অমিয়বাবু মুগুর ভাঁজেন না, তাঁহার মধ্যে অপর এক পর্যায়ের এমন সুস্থ, দৃঢ় ও দুর্ধর্ষ শক্তি আছে যে, বাহুবল বৃদ্ধি করিবার কথা তাঁহার কোনোদিন মনে আসে নাই।"

আগেই বলেছি, সাধনা নিষ্ঠা ছাড়া যেকোন বিষয়ে বাহ্য খানিকটা লম্ফঝম্প করা তাঁর ভীষণভাবে অপছন্দ ছিল। তাঁর নিজের চিত্রবোধের অভাব ছিল বলে আর্ট এগ্জিবিশন দেখতে যাওয়ায় তাঁর গভীর অনীহা। তিনি জানেন শুধু চোখের দৃষ্টিতে যে জিনিস দেখা যায় — তা গ্রাহ্য নয়।

তাছাড়া, "পরধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহা আত্মশ্রদ্ধারই বিকল্প। যেকোনো বিদ্যা, যে কোন শিল্প — পারদর্শিতার ক্ষেত্রে বহু নিষ্ঠা ও সাধনাসাপেক্ষ। যে সাধনায় একটি গোটা জীবন কাটিয়া যাইবার কথা। এক জন্মের আয়ু নিঃশেষ করিয়া কতটুকুই বা জানা যায়। জ্ঞানের অসীমতা ও বিদ্যার বৈচিত্র্য হইতেই অধিকার ভেদের প্রশ্ন ওঠে।"

তাঁর ব্যক্তিত্বের গুরুগম্ভীর দিকটি ছাড়াও আমরা খবর পাই — তিনি স্টেশনে অতিথিকে আনতে গিয়ে কোনদিন তাঁকে খুঁজে পাননা এবং বাড়ী ফিরে দেখেন ঃ

"মাননীয় অতিথি ঘণ্টাখানেক পূর্বে পৌঁছিয়া স্নানের উদ্দেশ্যে বাথরুমে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।"

চা-খাওয়া যে তাঁর কাছে কত বিলাসের, সে তথ্যও মেলে ঃ

"আমার চা খাওয়া আবার একটু সময়ের ব্যাপার। হুড়াহুড়ি করিয়া সারিতে

পারিনা। অনেকের চা পানের রকম দেখিলে মনে হয়, একটা বিষম উৎপাতের হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ফুঁ লাগাইয়া, মুখ খিঁচাইয়া, জিভ ঝলসাইয়া দুই মিনিটের মধ্যে আধার হইতে আধেয় নিঃশেষিত; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর বাহিয়া অকথ্য ঘর্ম নির্গম, রুমালে ঘাড়গলা মুখ মুছিয়া অস্থির, বীভৎস। ইহাদের কে যেন বলিয়া দিয়াছে, চা গরম গরম খাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া গলিত লৌহ গলায় ঢালিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতাই বা কী আছে? চাখিয়া চাখিয়া না খাইলে আর চা খাওয়া কেন?"

অপূর্ব ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তাঁর আঁকা জীবনের নিখুঁত, বাস্তব কয়েকটি ছবি দেখলেই সেই ক্ষমতার প্রমাণ মিলবে। স্টেশনে রেলওয়ে বুকস্টল আমরা সবাই দেখি। কিন্তু পরিমল রায়ের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে রেলওয়ে বুকস্টলের ব্যতিক্রমী চরিত্রটি ঃ

"কোনো দিন দেখি নাই, রেলওয়ে বুকস্টলে কেহ বই কিনিতেছে। সকলেই দেখে, পাতা ওল্টায় কচিৎ দাম জিজ্ঞাসা করে, তারপর চলিয়া যায়। দোকানী নির্বিকার চিত্তে বসিয়া থাকে। কাহারো হাতে কোনো পুস্তকের অবস্থান অবিন্যস্ত হইলে, ঠিক করিয়া রাখে। আমার মনে হয়, জলসত্র খুলিয়া অপরের তৃষ্ণাহরণে যেমন পুণ্য, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বই-এর দোকান খুলিয়া নিষ্কর্মার কালহরণেও তেমন পুণ্য। রেলওয়ে স্টলের মালিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই পুণ্য সঞ্চয়। যদি কখনো দু'একটি বই বিক্রি হয়, তাহা অধিকন্তু অর্থাৎ ন দোষায়।"

আজ আমরা দোকানে দোকানে যে অভ্যর্থনা পেয়ে থাকি সেল্স্ম্যান বা সেল্স্গার্লদের কাছ থেকে — আগে সে সম্বন্ধে ব্যবসায়ীরা এতোটা সচেতন ছিলেন না। সবে সবে যখন এই সচেতনতা দেখা দিচ্ছিল — তখন তা খানিকটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের ছিল। এই বাড়াবাড়ি যেমন কাম্য নয়, তেমনি কাম্য নয় দোকানীর নিস্পৃহ নৈর্ব্যক্তিক হাবভাব। এ প্রসঙ্গে আবার একটি অসামান্য ছবি আঁকেন লেখক ঃ

"আচ্ছা অন্য একরকম দোকানের কথা ভাবিয়া দেখুন। ছাতাটি বন্ধ করিয়া দোকানে গিয়ে উঠিলেন। আপনাকে দেখিয়া কেহ সম্ভাষণও করিল না, আগাইয়াও আসিলনা। যে যাহার স্থানটিতে মহাবৈরাগ্যভরে উপবিষ্ট হইয়া রহিল। আপনি নির্বোধের মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপর দ্বিধা সহকারে একজনের দিকে অগ্রসর হইতেই সে প্রকাণ্ড এক হাই তুলিল। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক দ্রব্যটি আছে?" হাই তখনও শেষ হয় নাই। সেই আলজিহ্বা প্রদর্শিত মুখব্যাদানের বিকৃত ভঙ্গিটি না মিলাইবার পূর্বেই কণ্ঠ হইতে

একটি মিশ্রধ্বনি উদ্গত হইয়া আসিল। উহা যে নঞবোধক তাহা মালুম হইল সমসাময়িক হস্তসঞ্চালনের ইঙ্গিতে। বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।''

এতো গেল সবাক্ চিত্র। নির্বাক চিত্রটি আরও সরস। অনেকেরই অভ্যাস আছে হাত পা নেড়ে কথা বলা। কথাটুকু বাদ দিলে শুধু হাতনাড়া কেমন হাস্যকর হতে পারে — তাও ধরা দিয়েছে তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে। একটি আসরে ঃ

''দূরের একটি কোণের টেবিলে একজনের কাণ্ড দেখিয়া হাস্যসম্বরণ কঠিন হইল। তাঁহার কথা কানে আসিতেছে না, কিন্তু হস্তসঞ্চালন এবং হস্তের অঙ্গুলি-সংকেত চোখে দেখিতেছি। সেই বাহুভঙ্গী ও মুদ্রার বৈচিত্র্য এত বিবিধ যে একটি সুসংবদ্ধ বক্তৃতায় তাহাদের প্রত্যেকটিকে ক্রমানুযায়ী অঙ্গীভূত করা মুশ্‌কিল। হঠাৎ দক্ষিণ বাহু উর্ধ্বে উত্তোলিত হইয়া উহার তর্জনী শূন্যে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল, পরক্ষণেই বাহুখানি নামিয়া আসিয়া দুইহাত একত্র হইল এবং হাতের তেলোয় তেল মাখিবার পদ্ধতিতে যুক্তহস্ত পরস্পরের গাত্রমার্জনা করিতে লাগিল। আবার মুহূর্তমধ্যে হাত বিচ্ছিন্ন হইল এবং মৃদঙ্গে বোল ফুটাইবার ভঙ্গীতে দুই হাত শূন্যে পাখা ঝাপটাইতে লাগিল। কোনো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বোঝানো হইতেছে মনে করিলাম। কাছে আসিয়া শুনি, জাতীয় সঙ্গীতের তর্ক হইতেছে।''

মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বৈচিত্র্যময়। সমাজের বিভিন্ন চরিত্র তাই সজীব হয়ে ওঠে তাঁর বর্ণনায়। তাঁর বর্ণনায় আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে চিনতে পারি আমাদের সবজান্তা প্রতিবেশীটিকে; যিনি —

''সমস্ত জ্ঞানের পিণ্ড কবে দুই হাতে চটকাইয়া হাত দুখানি ধুইয়া রাখিয়াছেন। এখন অগণিত তত্ত্বতালাসের সৌগন্ধ, দশ আঙ্গুলের বিবিধ মুদ্রায় নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে। যেকোন প্রসঙ্গের অবতারণা হোক না কেন, ভদ্রলোকের সে বিষয়ে অতি সুনিবদ্ধ ও সুচিন্তিত একটি মতামত আছে। বিষয়টির আদ্যোপান্ত ইতিহাস তিনি জানেন, বহু তথ্য নখদর্পণে ঝলসাইতেছে। জিজ্ঞাসার অতীত এবং সংযমের উর্ধ্বে যদি কোনো মনোজগৎ থাকে, তিনি তাহার অবিসম্বাদিত অধিবাসী। যেন গোটা পৃথিবীটাকে বাটিয়া চাটিয়া খাইয়া, তর্কের ও সন্দেহের মশামাছি তাড়াইয়া নিশ্চিন্ত মতামতের মশারীর তলায় অবসর লইয়াছেন।''

চিত্রপ্রদর্শনীতে যে অগণিত নরনারী ভিড় করে যান তাঁরা প্রত্যেকেই চিত্রের অনুরাগী নন। তাঁদের চরিত্র মনোভাব এমনকি যাবার কারণও ভিন্ন। একটি চিত্রপ্রদর্শনীর ছবি আঁকতে গিয়ে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে এমনি বিভিন্ন কটি চরিত্র

ফুটিয়ে তোলেন তিনি ঃ

"একটি দল অবশ্যই সেই হৈ হৈ সম্প্রদায়ের সভ্য, তাঁহারা রবিবারটা সকলে মিলিয়া একটু হৈ হৈ করিতে আসিয়াছেন। কোনো ছবিতে শরীর মাত্রায়ণ অতি 'উদ্ভট', ইঁহারা হাসিয়া অস্থির; কোনোটিতে মনুষ্যমূর্তিটি অবিকল দুলালের পিশেমহাশয়ের মতো, — হাসি আরো উচ্ছ্বসিত। অপর একদল আছেন, তাঁহারা 'কালচার' তাড়িত হইয়া জুটিয়াছেন। একটি ছবির সম্মুখে ইঁহাদের একজন স্থির দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান। মাঝে মাঝে এপাশে ওপাশে দাঁড়াইয়া নানা দৃষ্টিকোণ হইতে ছবিটি দেখিতেছেন। একবার হয়তো ঘাড় উঁচাইয়া উবু হইয়া বসিয়াই পড়িলেন। মুখে চোখে সর্বক্ষণ একটি মিশ্র অভিব্যক্তি, তাহাতে আনন্দ আছে, চিন্তা আছে, আবার প্রশ্নও আছে। আসলে অবশ্য কিছুই নাই, মনে মনে ভাবিতেছেন, যথেষ্টক্ষণ যথাযোগ্য ভঙ্গীতে দেখা হইল তো? প্রদর্শনীর এখানে ওখানে দু'একটি যুবজনের দৃষ্টি ঈষৎ চঞ্চল। কিন্তু চঞ্চল হইলেও খুব সুদুরের পিয়াসী নয়। কারণ কলহাস্য মুখরিত তরুণীর দলটি অদূরেই।"

নারী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বেশ খানিকটা মিশ্র ধরনের। একদিকে আছে, নারীর আচরণ, চঞ্চলতা, মানসিক স্থৈর্য্যের অভাব প্রভৃতির প্রতি বেশ খানিকটা অবজ্ঞা অপরদিকে নারীর মোহময়তার প্রতি আকর্ষণ। নারী চরিত্র নিয়ে অনেক লেখকই পরিহাস করেছেন। তবে পরিমল রায় একটু বেশি অহংবোধ সম্পন্ন। তাঁর পুরুষালি অহং তাই কখনওবা বেশ রূঢ় অবজ্ঞাই প্রকাশ করে বসে নারীজাতির বিরুদ্ধে। অবশ্য, এও সত্য, অবজ্ঞার কারণগুলি সব নারীর ক্ষেত্রে না হলেও, বেশ কিছু নারীর সম্বন্ধে দুঃখজনকভাবে সত্য। নারীপুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর মতে সম্পূর্ণ পৃথক ঃ

"একটি ভদ্রমহিলার সহিত আপনার আলাপ হইল। বাড়ীতে ফিরিয়া বলিতে পারেন, তিনি কী রকম শাড়ি পরিয়াছিলেন, কিংবা তাঁর কর্ণে স্বর্ণাভরণ ছিল কিনা? আপনি যদি পুরুষ হন, কিছুতেই পারিবেন না — যতই চক্ষুষ্মাণ হন না কেন। কারণ পুরুষের দৃষ্টি সমগ্র মানুষটির উপর, যেমন স্ত্রীলোকের দৃষ্টি মানুষ ব্যতীত আর সমস্ত কিছুর উপর। ভদ্রমহিলাটি চলিয়া গেলে মেয়েমহলে তাঁর বেশভূষা সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইয়া যাইবে। আপনার হয়তো কেবলমাত্র মনে হইবে, মহিলাটি কথা বলেন ভারী চমৎকার।"

মহিলারা মানুষ বাদ দিয়ে গয়না, শাড়িই দেখেন — এটা যেমন সর্ব্বৈব সত্য নয়, তেমনি পুরুষের দৃষ্টি সর্বদাই মানবাত্মার প্রতি এমন ধারণারও কোন কারণ নেই। তবু, এই বিশিষ্ট উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গীটি লেখকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং

সেইজন্যই আলোচ্য। বিকিকিনির ক্ষেত্রেও মেয়েরাই বেশি নির্লজ্জ বলে মনে হয়েছে তাঁর। কারণ, প্রথমতঃ

'ইঁহারা কী চান তাহা জানেন না, কী চান না, তাহাই কেবল বলিতে পারেন।''

দ্বিতীয়তঃ, ''মেয়ে মাত্রেরই ধারণা, তাহার চটকে (সে যে কারণেই হউক) ষোলো আনা হইতে বারো আনাই ঠকিরাইয়া পড়িবে।''

তারা সেইজন্যই ঃ 'আপনি যদি ইহার সাথী হইয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যদি একটা কিছু সমাধা তাড়াতাড়ি করাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় বলেন, 'এই শাড়িটাই নাও না', শুনিবেন, উহার পাড়টি অত্যন্ত বোকা বোকা। 'তাহলে এটা?' উহার রং-এর বোকামিটা আরো ঘোরতর। শাড়ির অরণ্যের মধ্যে চালাক শাড়িটি — আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।''

লক্ষণীয় কথার ভঙ্গীটি। মেয়েদের এই 'বোকা বোকা' বলার স্বভাব এখনও প্রায়ই নজরে পড়ে। মেয়েদের সঙ্গে কলহ করাও লেখকের স্বভাববিরুদ্ধ। কারণ তাঁর মতে মেয়েরা মাঝে মাঝে চীৎকার করেন এবং করবেন। আর সে চীৎকারের উদ্দেশ্য কণ্ঠ কণ্ডুয়ন। তাছাড়া, তাঁর বক্তব্য ঃ

''গলা বলিতে আসলে কিন্তু মনের চীৎকার অর্থাৎ মনটি অশান্ত, এবং এই মানসিক স্থৈর্য্যের অভাবেই বলা হয়, নারী রহস্যময়ী। রহস্য আর কিছুই নয়, ইহাদের মতি স্থির নাই, এবং এজন্য ইহাদের কার্য্যক্রমে কোনো পুর্বাপর, কোনো বিধি কিম্বা রীতি আবিষ্কার করা কঠিন। কখন যে কী করিয়া বসে বলা যায় না।''

এতো অসঙ্গতিময় চরিত্র হলেও প্রতিটি নারীর স্বামী নিন্দা কিন্তু একই সুরে বাঁধা — প্রত্যেকেই নিন্দাস্থলে স্বামীর অসাধারণত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। লেখকের স্ত্রী এবং স্ত্রীর বাল্যসখীর মধ্যে যখন স্বামী নিন্দা শুরু হয়, তখন ঃ

''সখিদ্বয়ের একজন মহাদুঃখ জানাইয়া বলিলেন, ইহাকে দিয়া সংসারের এক কানাকড়ি কাজও হইবার নয়, অপর কোনো পুরুষকে তিনি এতখানি নিষ্কর্মা হইতে দেখেন নাই। এই উক্তির কালীপক্ষে ও বিদ্যাপক্ষে দুই তাৎপর্য্য। প্রথম অর্থের পিছনে অনতিপ্রচ্ছন্ন দ্বিতীয় অর্থ, আমার স্বামী তোমারটির মতো সংসারের আলু পটল গুনিয়া সময় কাটান না, তাঁহার বিদ্যা ও রুচি উচ্চশ্রেণীর এবং ভিন্নধর্মী। দেখা গেল, অন্য সখীটিরও তাঁহার নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে ঠিক একই অভিযোগ। তিনিও অষ্টপ্রহর পুস্তক মুখে লাগাইয়া পড়িয়া আছেন। অন্য কোনদিকে যদি এতোটুকু খেয়াল থাকে। অর্থাৎ প্রমাণ হইয়া গেল, আমরা

উভয়েই অতি উচ্চশ্রেণীর পুরুষ, সংসারের কাদামাটির বহুউর্ধ্বে কোঁচা সামলাইয়া বসিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসায় নিমগ্ন আছি এবং ইঁহারা দয়া করিয়া সংসারটা চালাইয়া দিতেছেন বলিয়াই সংসার চলিতেছে। অর্থাৎ, ইঁহাদের বিবাহ না করিলে আমরা মরিয়া যাইতাম।"

ঠাট্টা করে কথাটা বললেও লেখক কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন — পাশে নারী আছে বলেই জীবনে চলার পথ এত সুন্দর। স্বীকার করেন ঃ

"আমাদের সমসাময়িকাগণ যে চিরকালই আমাদের সমসাময়িকা বয়োবৃদ্ধির ক্ষোভ ইহাতেই মন্দীভূত। ইঁহারাও প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ চলিয়াছে। এই মহাযাত্রায় যে সখ্যতার ইঙ্গিত, তাহা বার্ধক্যের সঞ্জীবনী, কালের অপরূপ দাক্ষিণ্য।" আরেকটি মধুর অনুভূতির কথা বলেন সামান্য দ্বিধা নিয়ে ঃ

"আরেকটি কথাও হয়তো নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। সমবয়সীদের পত্নীদের দেখিয়া ইদানীং বড় আনন্দ হয়। ইহারাই আমাদের সে যুগের তরুণী আমাদের সেই প্রাক্তন পুরুষ তারুণ্যের ইহারাই পুষ্পশোভা। ইহাদের কুন্তলসৌগন্ধ এখন নানা অন্তঃপুর সুবাসিত করিতেছে, কিন্তু ঘ্রাণ মাত্র উহাকে যেন চিনিতে পারি। এই সুরভি, তরুণ বয়সে কত বিচিত্র রজনীর শ্লোক বিন্যাসে উৎসারিত হইয়াছে।"

শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের চরিত্রটিও ভারি সুন্দর ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। শিক্ষিত বাঙালী লেখাপড়া জানা নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁরা পড়েন সংবাদপত্র, লেখেন চিঠি। মাঝে মাঝে দুএকটা মাসিক পত্রাদি বা গল্প উপন্যাস যে পড়েন না তা নয় — তবে তা পড়েন সময় কাটাবার জন্য, সাহিত্যানুরাগের জন্য নয়। অবশ্য সাহিত্য বিষয়ে মতামত দিতে এঁরা সর্বদা প্রস্তুত — রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র কারুর বিষয়েই মন্তব্য করতে তাঁরা পিছপা নন। শিক্ষিত বাঙালীর আরেকটি অদ্ভুত দুর্বলতা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে ঃ

"ইদানীং লজ্জা, নম্রতা, স্থিরতা ইত্যাদি সেকেলে সদগুণগুলি শিশুদের উপর আরোপ করিলে তাহাদের মাতাপিতাগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। মেয়েরা চিঠি লেখেন, বাবলুটা অত্যন্ত দুষ্ট হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। অর্থাৎ দুষ্টুমিটা বুদ্ধির লক্ষণ, ছেলেটি ধীর স্থির প্রকৃতির হইলে বিশেষ আশঙ্কা থাকিয়া যাইত। উহা হয়তো আসলে বুদ্ধিহীনতারই নিদর্শন।"

হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা পরিমল রায়ের অতুলনীয়। চিত্র প্রদর্শনীর চিত্র বা দোকানে হাইতোলারত দোকানীটির সরস চিত্রে আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। তবু আরেকবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। তাঁর ভাষা স্বভাবতই সরস। তবে সর্বত্র

একটা গাম্ভীর্য বজায় থাকে। তিনি নিজে গম্ভীর হয়ে অপরকে হাসান। তাঁর বিদ্রূপও এত মার্জিত যে, যাকে বিদ্রূপ করেন — তিনিও প্রথমে হেসে ফেলবেন। পরে বুঝবেন খোঁচাটা কোথায়। যেমন — ঐতিহাসিক জ্ঞান বা ইতিহাসবোধ না থাকা সত্ত্বেও বারবার কুতুবমিনার দেখতে যাওয়ার কি সার্থকতা তিনি বোঝেননা, বলেন ঃ

"একটি উঁচু পদার্থ একবার দেখিবার হয়তোবা অর্থ আছে। বার বার নিরর্থক। অনেকে অবশ্য দেখার বেশিও অগ্রসর হন, অর্থাৎ উহার মাথায় চড়িয়া নাম খোদাই করিয়া আসেন। তারপর বাড়ীতে ফিরিয়া ফুসফুসের কম্পিটিশনে কে কতদূর উঠিয়াছিলেন তাহা লইয়া মহাকলরব। কুতুবমিনার অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য তৈরী হয় নাই। কিন্তু উপায় কী? যে বন্দুক ছুঁড়িতে জানে না, সে বন্দুক দিয়া লাঠি খেলে।"

বিদ্রূপটা যে কতখানি তীক্ষ্ণ তা বুঝতে একটু সময় লাগে — বোঝার পর ধার সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। জনৈক 'ভেগোলজিস্ট'-এর (যিনি ভেগ কথাবার্তায় সিদ্ধবাক) ভাষণটি একধারে হাস্যরসসৃষ্টি ও অসাধারণ ভাষা-প্রয়োগ ক্ষমতার নিদর্শন। ভাষণের মধ্যে কিছু শব্দ দৃঢ় রেখায় ছাপা — শব্দগুলি ভাষণের সময় জোরের সঙ্গে উচ্চারিত বোঝানোর জন্য। ভাষণটি শোনা যাক ঃ

"মানে, আপনারা এদিক থেকে এই করতে থাকুন। আর আমরা ওদিক থেকে ওই করতে থাকি। আপনারা যদি এতটুকু বলেন, তাহলে আপনাদের কাছ থেকে আমাদের এতে একটা সত্যিকারের সাহায্য হবে। মানে, বাংলাদেশের যে অবস্থা বুঝতে পেরেছেন, এখন যদি আমরা এটা না করি তাহলে — মানে, এদের ব্যাপারটি তো বুঝতে পারছেন? এরা দেবে না। কিন্তু দেবে না বললেই তো আর আমরা এ করতে পারিনা। আমাদের কেড়ে নিতে হবে। আর তাহলেই বুঝতে পেরেছেন, ওটা বিশেষ করে দরকার। তাই বলছিলাম, আপনারা এদিক থেকে এই করতে থাকুন, আর আমার ওদিক থেকে —। মশাই, ছেপে বার করবো। হাজার, দু'হাজার, দশ হাজার. দু'লাখ, দশ লাখ --- যত লাগে।

ইহা ভেগোলজির সঙ্কেতময়ী ভাষা। বুঝিতে হইলে বহু কালের কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন।"

নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতেও তিনি পেছপা নন। অধ্যাপক হিসেবে ক্লাসরুমে তিনি বীরপুরুষ। সব অধ্যাপকই ক্লাসরুমে যথেচ্ছাচারী। ব্যক্তিগত কারণে মেজাজ গরম থাকলে ছাত্রছাত্রীর ওপর চোটপাট। ক্লাস থেকে বার করে দেওয়া, কার হাজিরা কেটে নেওয়া — এসবই অধ্যাপকদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু

সবল বাইসেপধারী ছাত্রের বাড়ীর সম্মুখে যখন বাড়ী ভাড়ার জন্য দাঁড়াতে হয়, তখন অধ্যাপকের মনের অবস্থা কি হয় তা তিনি নিজের জবানীতেই বলেছেন ঃ

"গতকল্য এতগুলি ছাত্রীর সম্মুখে বিনা কারণে তাহাকে যে অপমানটা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ লইবে না? অধ্যাপকেরা চালাকি পাইয়াছে নাকি? ছাত্রদের মানসম্মান নাই? দোষের মধ্যে হাজিরা ডাকিবার সময় একটু বিকৃত স্বরে উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। তাহাতে হইয়াছিল কি? আমারই বা এমন কি বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর? অথচ উহা লইয়াই তো দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বেচারীদের জ্বালাইয়া মারিতেছি। কই, উহারা তো কেহ কোনদিন আমাকে ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দেয় নাই? যদি দিত তাহা হইলে করিতামই বা কি? বলিবারই বা থাকিত কি?"

'ইদানীং' — আগাগোড়া আন্তরিক ভঙ্গিতে লেখা। আড্ডার ভঙ্গিটি এখানে সুস্পষ্ট এবং তিনি সরাসরি পাঠককে সম্বোধন করেই প্রতিটি প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর ভাষাজ্ঞান ছিল প্রখর। তাই বইটির সর্বত্র গাম্ভীর্য ও হাস্যরসের এমন সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া উপন্যাসিক বা নাট্যকারের মতো যে কোন চরিত্রকে তিনি তাঁর ভাষায় জীবন্ত করতে পারতেন, চরিত্রানুগ সংলাপে চরিত্রটি হয়ে উঠতো প্রাণময়। যেমন — বাল্যসখীর চিঠি পেয়ে তাঁর স্ত্রীর উচ্ছ্বাস প্রকাশের ভাষা ঃ

"ওমা বাণীটা এখানে নাকি? বাণী এখানে? উঃ কী মজা, কত দিন পর দেখা হবে। জানো আমার বিয়ের ঠিক সাতদিন পরে ওর-ও বিয়ে হয়ে গেল। তারপর আর দেখা হয়নি। ইস, কত দি-ই-ন পরে যে দেখা হবে। ঠিক বারো বছর। ওর বর এখানে কী করে? কী মজা। তুমি যাবে তো?"

এ সংলাপ যে কোনো নারীর, তা বলে দেবার কোন প্রয়োজনই হয় না, সংলাপের ভাষাগত চরিত্রই তা বলে দেয়। কিংবা সেই দোকানীর ছোট্ট দুখানা সংলাপই ধরা যাক্‌না কেন। দাম জিগেস করলে দোকানী উত্তর দেয় ডেট্টাকা' আর দরাদরি করলে বলে "দরাদরি কশ্চেন? এখানে ওসব নেই।"

ভাষার মধ্যে অনুপ্রাস সৃষ্টি, নূতন শব্দ ব্যবহার বা শব্দের দ্ব্যর্থ অর্থে ব্যবহারের খেলাও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

যেমন ঃ

ক) "তাঁহার চরণের বিচরণ স্বামীর শ্রীচরণের ছায়া বহুদিন পরিত্যাগ করিয়াছে।" (র ও ণ-এর অনুপ্রাস)।

খ) "নিমন্ত্রণ বাড়ীটি বহু দূরের পাল্লা, এবং আমরা বে-কার।" (ইংরাজী ও

বাংলার সংমিশ্রণে নূতন শব্দ)

গ) "দেখিলাম একটি কাষ্ঠফলকে গৃহস্বামী নামাঙ্কিত হইয়া আছেন। নামের পিছনে বহু বিলাতী অক্ষর, আমার মতো নিরক্ষর নয়।" (দুই অর্থে অক্ষর শব্দের ব্যবহার)

উপমা সৃষ্টিতেও তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। যেমন ঃ (একটি মাত্র উৎপাত, নাসাগ্রে মাছি বসিবার মত।"

বা আরেকটি উপমা —

"আমরা কোথায় যাবো, জানো? আমরা যাবো — আমরা যাবো — আমরা কোথাও যাবো না।" একটা দেশলাই কাঠি যেন দপ করিয়া আলো হইয়া উঠিয়া ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল।"

[জানুয়ারী ২১, ১৯৯৫ সালে ভারতীয় ভাষাপরিষদের সীতারাম নাকসেরিয়া হলে প্রদত্ত। বক্তা ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজের অধ্যাপক।]

আলোকের দূতী রোকেয়া

রেজাউল হক

নারী-স্বাধীনতা ও নারী-স্বাধিকার প্রচেষ্টাকে ইসলাম শুধুমাত্র অনুমোদনই দেয়নি বরং উৎসাহ যুগিয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম নারীদের বর্তমান দূরবস্থা দেখে অমুসলমানদের কথাটা মানতে কষ্ট হবে। ততোধিক আঁতকে উঠবেন মুসলিম সমাজের I.S.I. ছাপমারা অভিভাবকগণ। সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করে অমুসলিমদের অবিশ্বাস যদিও বা দূর করা যায়, মাতব্বরদের টলানো যাবে না কিছুতেই কেননা অমুসলিমদের শুধু জানতে হবে -- আর মুসলিমদের হবে মানতে। আর বলাই বাহুল্য জানা নয়, মানাই বন্ধন।

সপ্তম শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে নারী কিরূপ নির্যাতিতা ছিলেন, একথা বোঝানোর জন্য বেশি কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজন নেই। বিশেষভাবে প্রাক্ ইসলামী আরব সমাজে নারীর প্রতি নৃশংসতা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মানর পর তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর সেই অবহেলিত নারীরা স্বীয় অধিকার রক্ষার ব্যাপারে এত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সামান্য সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠতেন। সামান্য সময়ের ব্যবধানে অবস্থার এই আমূল পরিবর্তনকে বৈপ্লবিক বলতে বাধা নেই। কোন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আকার ও প্রকার স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

''একদা ওমর ফারূক রাছুলুল্লাহর মিম্বরে উঠিয়া, উপস্থিত মুছলমানগণকে অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, অতঃপর কেহ চারিশত দেরহামের অধিক মোহর দিলে, আমি সেই অতিরিক্ত টাকা বাজেয়াফত করিয়া নিব এবং তাহা মুছলমানদিগের বায়তুলমালে দাখিল করিয়া দিব।' খোৎবা শেষ করিয়া নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, —

''আমীরুল মুমেনীল। আপনি এই অন্যায় নির্দেশ দিলেন কি করিয়া?'

'কেন অন্যায়টা কোথায় হইল?'

'অন্যায় নয়! আল্লাহ্ নারীদিগকে যাহা দিয়াছেন, আপনি তাহা কাড়িয়া নিতে

চাহিতেছেন?'

'নারীদিগকে কোন অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলাম?'

'দেখুন খলিফা, আল্লাহ বলিতেছেন, ''স্ত্রীদিগকে তুমি কেন্তার বা স্তূপ পরিমাণ স্বর্ণও মোহর হিসাবে প্রদান কর।'' সুতরাং স্ত্রীদিগকে স্তূপীকৃত স্বর্ণ মোহরে দেওয়ার স্পষ্ট অনুমতি আল্লাহ্র কালাম হইতে পাওয়া যাইতেছে। অথচ আপনি মোহরের উচ্চতর পরিমাণ বাঁধিয়া দিতেছেন মাত্র চারিশত দেরহামে।''

''ঠিক কথা মহিলা! ওমর অসঙ্গত নির্দেশ দিয়াছিল, আর তুমি তাহা সংশোধন করিয়া দিলে। দেখিতেছি মদিনার নারীরাও ওমর অপেক্ষা বেশি অভিজ্ঞ।''

উপরোক্ত ঘটনাটি উদ্ধৃত করার পর মওলানা আকরাম খাঁ মন্তব্য করেছেন — ''প্রাক ইসলামী যুগে আরবের নারী সমাজের মর্যাদা শৃগাল কুকুর অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল ছিল না· ·। সেই সমাজের একজন নারী নির্ভীক মনে দৃঢ় ভাষায় প্রকাশ্য জনসম্মেলনে প্রতিবাদ করিতেছেন — প্রবল প্রতাপান্বিত খলিফা, মোছলেম জাহানের প্রধানতম আমীর হযরত ওমর ফারূকের বিরুদ্ধে — যুক্তি প্রমাণ সহকারে। অন্যদিকে ফারূক আজম হযরত ওমর, অর্ধপৃথিবী যাঁহার নামে কম্পিত হইত — সেই ওমর নিরীহ শিশুর ন্যায় নারীর প্রতিবাদ শ্রবণ করিতেছেন। সেই নারীর মহিমা কীর্তন করিতেছেন। আবার মিম্বরে আরোহন করিয়া নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন, নিজের পূর্ব নির্দেশ বাতিল করিয়া দিতেছেন। কিন্তু হায়! আজ চন্দ্র সূর্যের প্রদীপ নিয়া মোছলেম জাহানের দিকে দিকে সন্ধান করিয়া দেখ, কুত্রাপি এই আদর্শের সামান্য একটু আভাসও খুঁজিয়া পাইবে না।''

আকরাম খাঁর এই আক্ষেপের অনুরনন শুনি সম সময়ের এক নারী কণ্ঠে; — ''এই বিশাল জগতে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন ধর্ম নারীকে কিছুমাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক, নারীর আত্মাকেও স্বীকার করে নাই। একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম নারীর দুর্দশার একশেষ হইয়াছে।'' সপ্তম শতাব্দীর সেই বেদুইন নারীর ন্যায় সমাজের স্বনিয়োজিত অভিভাবকদের প্রবল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে তিনি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। ''পাঠিকাগণ, আপনারা কি কোনদিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি? দাসী। পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই। কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা দাসী কেন? কারণ আছে।

আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ···আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই; তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছি···"

গত শতাব্দীর শেষপাদে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী অসূর্য্যম্পর্শা হিন্দু রমণীরা মুক্ত না হলেও তাদের বন্ধন শিথিল হতে শুরু করেছে। প্রতিবেশী মুসলিম নারীদের ক্ষেত্রে এই বন্ধন তখনও অটুট। অবরোধের বদ্ধ অন্ধকারে "তাদের নারীহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে।" যখন তাদের "স্বাধীনতা ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না" — আলোকের দূতী বেগম রোকেয়া — মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন — মুক্তির আকাঙ্খা সৃষ্টি করলেন অবরোধবাসিনী নারীদের মধ্যে। "সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে" জেনেও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কেননা "সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই।"

এই মহীয়সী নারীর সামগ্রিক কীর্তি বিচার করে মোহিতলাল মজুমদার না বলে পারেন না; "বাংলার মুসলিম সমাজে এখনও যে যুগ চলিতেছে, হিন্দু সমাজের সেই যুগে একজন নারী জীবন ও চরিত্রে এমন শক্তি ও সাহস, এমন নিষ্ঠা ও সত্য-পিপাসা বিরল ছিল বলিয়া মনে হয়।······ একালে হিন্দু সমাজেও এমন নারীচরিত্র বিরল।" রোকেয়ার কর্ম ও চিন্তার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের পর আমরা মানতে বাধ্য হব, কবির এই মন্তব্য এমনকি আজকের বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলনের যুগেও সত্য।

১৯০৪ সালে 'নবনূর' পত্রিকায় 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর সমকালে বিরল মনন ও প্রজ্ঞা এবং সাহসের পরিচয় মেলে এই বলিষ্ঠ উচ্চারণে —

"আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ······

তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত

তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। ……যাহা হউক ধর্মগ্রন্থ সমূহ ঈশ্বর প্রেরিত কিনা তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেনা। ঈশ্বর যদি কোন দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। …… যাহা হউক এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে নরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য করা উচিত নহে।"……

সত্য এমন সরল আর বলিষ্ঠভাবে আর কোনও বঙ্গ-রমণীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি। "পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।" একথা যিনি বলতে পারেন, তাঁর বলিষ্ঠতা কখনও পুরুষ বিদ্বেষে পরিণত হতে পারেনা। তাঁর ভাষায়, "আমি কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটুশব্দ ব্যবহার করি নাই। …… কেবল রমণী হৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে 'বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়'; …… ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভ্রাতৃ নিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।" বিদ্বেষের অন্ধ আবেগ নয়, নির্মোহ সমাজবিজ্ঞানীর মুক্ত দৃষ্টিতে তিনি নারী জাতির অবনতির কারণ খোঁজেন, "পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না; তখন আমরা এরূপ দাসী ছিলাম না। মানুষ যেমন ক্রমে সভ্য হইয়াছে, গায়ে রঙ মাখা ছাড়িয়া কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, তেমনই ক্রমে বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে নারী জাতির উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঈশ্বর এমন পক্ষপাতি নহেন যে, এক জাতিকে অন্য জাতির অধীন করিবেন। …… যে সমাজ রাজা ও প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে, পুলিশ প্রভু ও বড়লাট প্রভুদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সমাজ নারীকে নরের অধীন করিয়াছে।"

এই যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তিনি কিভাবে অর্জন করলেন — তা বুঝতে হলে তাঁর বেড়ে ওঠার কাহিনী জানা দরকার। যে কালে তিনি জন্মেছিলেন, তখন তাঁর পক্ষে স্কুল, কলেজের শিক্ষাগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। বাঙালী তথা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলন তো দূরের কথা, এর প্রতি বিরূপতাই কাটেনি। সেই ঘোর অন্ধকার যুগে তিনি জন্মেছিলেন অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতা জহীর মোহাম্মদ আবু আলী সাবের অত্যন্ত রক্ষণশীল মানুষ ছিলেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দু শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হলেও তিনি কন্যাদের বাংলা, ইংরাজী শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। নিজ কন্যাদের কঠোর পর্দা রাখার ব্যাপারে তিনি যত সতর্ক ছিলেন, তাদের লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিলেন ঠিক ততটাই উদাসীন। "অবরোধবাসিনী"র ২৩ সংখ্যক ঘটনায় এবং 'নার্স নেলী'

গল্পে তিনি তাঁদের পারিবারিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন।

দিদি করিমুন্নেসা ও দাদা ইব্রাহিম সাবেরের উৎসাহ ও প্রেরণায় রোকেয়া বাড়িতে বাংলা, ইংরাজী চর্চা করতে পেরেছিলেন। দিদি করিমুন্নেসা তাঁর শ্বশুর বাড়িতে এক মেম সাহেবের কাছে রোকেয়ার পড়ার ব্যবস্থা করেন — কিন্তু তাঁর পিতা জানতে পেরে কন্যাকে কলকাতা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। বাড়িতে দাদা ইব্রাহিমের সাহায্যে গোপনে তাঁর বিদ্যাচর্চা অব্যাহত ছিল।

সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহের পর শিক্ষাচর্চার যাবতীয় বাধা অপসারিত হল এবং লেখক হিসাবে রোকেয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটল। সাখাওয়াত স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহে রোকেয়ার আধুনিক জ্ঞানচর্চার সুযোগ ঘটে। সুতরাং প্রথাগত শিক্ষা তিনি না পেলেও, নিজ অধ্যবসায় বলে তিনি যথার্থ অর্থেই একজন স্বশিক্ষিত মানুষ। তিনি নিজেই বলেছেন, "পাশ করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিনা।" শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এইভাবে, 'ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা।" T. S. Eliot যাকে Universal intelligence বলেছেন, তার জোরেই 'সাধারণের সহজবুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়' তাই বলতে পেরেছেন। তিনি নিজেই বলছেন, "একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোন পুস্তকে ছিলনা।" তিনিও তদ্রূপ অদম্য জিজ্ঞাসা নিয়ে সহজবুদ্ধিতে নারীজাতির অবনতি ও তার কারণ সনাক্ত করতে চেয়েছেন। নারী মুক্তি প্রশ্নে যে সমস্যাগুলি আজকেও আলোচিত হচ্ছে, সেই সমস্যাগুলি তাঁর চোখেও ধরা পড়েছিল। নারী আন্দোলনের বর্তমান আলোচ্য বিষয়গুলির সঙ্গে যারা সম্যক পরিচিত, রোকেয়া রচনাবলী পাঠ করলেই তারা অবহিত হবেন। আজকের মূল্যবোধ নিয়ে যদি আমরা তাঁর চিন্তাকে বিশ্লেষণ করি তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে আপোষকামী মনে হতে পারে। আজকের নারীবাদীদের তুলনায় তাঁর চিন্তাভাবনার অসঙ্গতি এবং সুক্ষ্মতার অভাব ধরা পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না; যে কোন মহৎ প্রতিভার মত তিনিও সমকালের সীমাবদ্ধতার দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। যে কোন মহৎ প্রতিভার মত স্ব-বিরোধিতা তাঁর ক্ষেত্রেও অনিবার্য। রোকেয়ার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই সহজ সত্যগুলি বিস্মৃত হন বলেই আজকের চোখ দিয়ে বিচার করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে পান, আবিষ্কার করেন ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ। কিংবা সমসাময়িক প্রেক্ষাপটবহির্ভূতভাবে এবং তাঁর সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে, নিজের প্রয়োজন ও খুশিমত ব্যাখ্যা করেন। ধর্মীয় কর্তৃত্বকে

অস্বীকার করে, মানবিক প্রজ্ঞার প্রয়োগ তিনিও করেন — "আমরা ধর্মগ্রন্থের কোন মতামত লইয়া আলোচনা করিব না — কেবল সহজবুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।" কিন্তু আমরা জানি নারী মুক্তির যাবতীয় প্রশ্নের সাক্ষ্য প্রমাণ তিনি ইসলামীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সন্ধান করেছিলেন। তাঁর সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলতে হয়, তিনি বাস্তববুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। প্রায় সমসাময়িক কাসিম আমিনের (১৮৬৫-০৪) সঙ্গে তুলনা করলে, তাঁর এই বাস্তববুদ্ধির তারিফ করতে হয়। মুফতি মোহাম্মদ আবদুহ্‌র এই অনুগামীর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে যে তিনি অবহিত ছিলেন তা বলা যায় — কেননা নারীমুক্তি প্রশ্নে বিশ্বব্যাপী বিশেষত মুসলিম জগতের আন্দোলনের প্রতি অনুসন্ধিৎসার পরিচয় আমরা তাঁর রচনাবলীতে পাই। ইসলামী ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে, তিনি ইউরোপীয় আদর্শের অনুকরণের কথা বলেছিলেন। ফলে তাঁর নারীমুক্তি আন্দোলন কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনি। রোকেয়াও যদি তাই করতেন — তবে তিনিও ব্যর্থ হতেন। শাস্ত্রে নারী স্বাধীনতার যে সীমিত স্বীকৃতিটুকু আছে — যার পরিচয় বক্তব্যের শুরুতেই দেওয়া হয়েছে — তাকেই পাথেয় করে তিনি সামনে চলেছেন। ধর্মীয় প্রভাব আচ্ছন্ন একটি সমাজে, স্বধর্ম নিষ্ঠা তারপক্ষে অনিবার্য ছিল।

কিন্তু এই স্বধর্ম নিষ্ঠা, কখনও তাকে সাম্প্রদায়িক করে তোলেনি। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের 'নিবেদন' অংশে তিনি বলছেন, "ধর্ম একটি ত্রিতল অট্টালিকার ন্যায়। নীচের তলে অনেক কামরা, হিন্দু — ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা; মুসলমান — শিয়া, সুন্নী, হানিফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়; ঐরূপ খ্রীষ্টান-রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট ইত্যাদি। তাহার উপর দ্বিতলে দেখ, কেবল মুসলমান, সবই মুসলমান; হিন্দু — সবই হিন্দু, ইত্যাদি। তাহার উপর ত্রিতলে উঠিয়া দেখ; — একটি কক্ষ মাত্র। কামরা বিভাগ নাই; অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু কিছুই নাই — সকলে একপ্রকার মানুষ এবং উপাস্য কেবল এক আল্লাহ্।" সম্প্রদায়িক রাজনীতির উন্মেষকালে এই উদার মানবিক দৃষ্টিতে ধর্মের ব্যাখ্যা প্রায় বিরল। মওলানা আজাদের কোরানের ভাষ্য যারা পড়েছেন তারা ধর্মের অনুরূপ ব্যাখ্যা পাবেন। তাঁর কালে বিরল অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ছিল বলেই, জনৈক হিন্দু লেখক হিন্দু নারীদের উচ্চ অবস্থান প্রমাণ করতে গিয়ে যখন বলেন, 'ভারতে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী, তাঁহারা নারীরই উপাসক," তার উত্তরে তিনি বলতে পারেন, "বেশ! বলি হিন্দুর আরাধ্য দেবতা কোন জিনিসটি নহে? পূজনীয় বস্তু বলিতে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ ইহার কোন পদার্থটি বাদ দেওয়া

যায়? হনুমান এবং গো-জাতিও কি উপাস্য দেবতা নহে? তাই বলিয়া কি ঐ সকল পশুকে তাঁহাদের 'উপাসক মানুষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে?" একথা বলার পর একবারও মনে হয়না যে তিনি স্বধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার জন্য প্রতিযোগী একটি ধর্মের ত্রুটি নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন — যা সে সময় ভারতবর্ষে খুবই চালু ছিল। নির্যাতিতা নারী সমাজের স্বাভাবিক মুখপাত্রের অধিকারবলেই তিনি অপর একটি ধর্মের সমালোচনা করতে পারেন। তাঁর সহজবুদ্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতাব সবচেয়ে বড়ো শিকার মেয়েরাই। তিনি জানতেন বিশেষ কোন এলাকার নারীদের আপাতভাবে যতই স্বাধীন মনে হোক পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই, এমন কোন জাতি নাই যেখানে নারীরা মুক্ত হয়েছে। "ডেলিশিয়া হত্যা" নামক একটি রচনায় তিনি বলছেন. "দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলাভূমি লণ্ডন নগরীতে শত শত 'ডেলিশিয়া বধকাব্য' নিত্য অভিনীত হয়। হায়! রমনী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা।"

কিন্তু মুসলিম নারীর যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করেছে সব থেকে বেশি — এ যন্ত্রণা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ছিল। মুসলিম নারীর পশ্চাদগামিতাকে সামগ্রিকভাবে মুসলিম নারী-পুরুষের পশ্চাদগামিতা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না — এটা তিনি তাঁর প্রখর বাস্তববুদ্ধি থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের বিকাশের ভাবনাটিও তাঁর চেতনাতে ছিল। মুসলিম সমাজ তখন ধর্মের এক অনড়, ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা চালিত হত। এখনও হয় না কি? যাই হোক, মুসলিম মানসের আধুনিকীকরণের জন্য ধর্মের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিতে এবং মুক্তচিন্তার প্রসার ঘটাতে যেসব মনীষীর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে — বেগম রোকেয়া সেইসব ধর্ম-সংস্কারকদের অন্যতম হবার দাবি রাখেন। শুধুমাত্র নারীমুক্তিকামী একজন হিসাবে দেখলে, তাঁকে খণ্ডিত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের এক সেমিনারে পঠিত একটি নিবন্ধে গৌতম নিয়োগী আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, "কোন ঐতিহাসিক গবেষকই তাঁর সমসাময়িক যুগের প্রেক্ষাপটে বেগম রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনা ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন নি, দুই বাংলাতেই।" মুসলিম নারীমুক্তির তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক সমসাময়িক কিছু ঘটনাবলীর প্রতি, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে, সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মুসলমানদের তৎকালীন অবস্থায়, নারীমুক্তির চেতনা আশা করা যায় না। ইউরোপীয় সভ্যতার secular চিন্তার প্রভাবে নর-নারী সম্পর্কের নতুন মূল্যায়ন

শুরু হয়েছিল। হিন্দু নারী জাগরণে এই সংস্কৃতির প্রভাব আগেই দেখা গিয়েছে। ইউরোপে নারী প্রগতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতে প্রথম এসেছিলেন মির্জা আবুতালিব খাঁন। ১৭৯৯ সালে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে "প্রাচ্য নারীর স্বাধীনতা" বিষয়ে ফারসী ভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা "Vindication of the liberties of the Asiatic Woman" শিরোনামে অনূদিত হয়ে Asiatic Annual Register-এ ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আবু তালিবের নারী স্বাধীনতা বিষয়ক চিন্তা মুসলমানদের ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি বিমুখতার কারণে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু আশা করতে পারি, একজন মুসলিমের চোখে ইউরোপীয় নারী প্রগতির সপ্রশংস বর্ণনা রোকেয়াকে সাহস যুগিয়ে থাকতে পারে। আবু তালিব শেষ জীবন কলকাতায় অতিবাহিত করেছেন — তাঁর ফারসী রচনার সঙ্গে রোকেয়ার পরিচয় খুবই স্বাভাবিক। কেননা, তখন মুসলিম অভিজাত পরিবারে ফারসী চর্চা অব্যাহত ছিল।

ইসলামী শাস্ত্রকে নারী স্বাধীনতার সহায়ক হিসাবে ব্যবহারের নজীর রোকেয়া কি পেয়েছিলেন? মুমতাজ আলীর কথা উল্লেখ করতেই হয়, যিনি ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে নারী মুক্তি অন্বেষণের পথিকৃৎ। বিখ্যাত দেওবন্ধ মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষালাভের পর তিনি সৈয়দ আহমদের অনুগামী হন। আহজীব-আল-নিসওয়ান" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তাঁর নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু করেন। "হুকুক-ই-নিসওয়ান" নামক গ্রন্থে তিনি নারীপুরুষের সমানাধিকারের দাবি পেশ করেন। মুমতাজ আলীব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে রোকেয়ার চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে রোকেয়ার চেয়েও তাকে Radical মনে হয়। এই বাংলা দেশেই নারী সমাজের উন্নতির জন্য অন্তহীন প্রয়াস চালিয়েছেন লুৎফর রহমান। এজন্য "নারীতীর্থ" নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, যেখান থেকে প্রকাশিত হত 'নারীশক্তি' নামে একটি পত্রিকা। মওলানা আকরাম খাঁ নারীপুরুষের সমান মর্যাদার কথা বলেছিলেন এবং তিনি রোকেয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

প্রকৃত নারীমুক্তি, শুধুমাত্র পুরুষদের একক প্রচেষ্টায় আসতে পারে না। রোকেয়া বলেন, "আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি, একস্থলে আমি বলিয়াছি, "ভরসা কেবল পতিতপাবন"; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে। ("God

helps those that help themselves'')। তাই বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোল আনা উপকার হইবে না।'' বাঙলার নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব পুরুষদের হাত থেকে, রোকেয়াই প্রথম নারী, যিনি নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে হিন্দু নারী জাগরণের শেষ দিকে নেতৃত্বে কিছু নারী এগিয়ে আসলেও তারা কেউই রোকেয়ার মত প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতায় নিজেদের উন্নীত করতে পারেননি। রোকেয়ার বিশিষ্টতা এখানেই।

যাই হোক, রোকেয়া বলেছিলেন, ''মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ, স্ত্রী শিক্ষার ঔদাস্য।'' এই উদাসীনতার বিপদ সম্পর্কে তিনি সতর্ক করেন, — ''যাহারা নিজেদের অর্দ্ধেক লোককে মুর্খতা ও ''পর্দা'' রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখে — তাহারা অন্যান্য জাতির, যাহারা সমানে সমান স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছে, তাহাদের সহিত জীবন সংগ্রামে কিরূপে প্রতিযোগিতা করিবে?''

অবরোধ প্রথার নির্মমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও সরাসরি এর বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেন নি। কেননা তিনি দেখেছেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু রমণীরা অবরোধ মুক্ত হয়েছেন। এও তো তিনি দেখেছেন যে সমাজের প্রান্তিক সীমায় অবস্থিত রমনীরা অবরুদ্ধ না হলেও মুক্ত নয়। নারীশিক্ষা বিস্তারে তাই তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত ''সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'' মুসলিম মেয়েদের জন্য প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। তবে বেথুন স্কুল যেমন বাঙালী হিন্দু নারী শিক্ষার পথিকৃৎ, মুসলিম নারী শিক্ষার পথিকৃৎ তেমনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল।'

শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। কুসংস্কার, পশ্চাদগামী চিন্তা এবং নারীসমাজের বিরুদ্ধে বিরাজমান আক্রোশের বিরুদ্ধে নারী সমাজকে সংগঠিত করার জন্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন, 'আনজুমান-ই-খাওয়াতীলে ইসলাম।' এই সমিতি গড়ার পিছনে তিনি দেশপ্রেমিক আব্দুর রসুলের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এই সমিতি স্বদেশী ও খেলাফত আন্দোলন কালে, মুসলিম নারীকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছিল।

বেগম শামসুর নাহার লিখছেন, ''সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি ভবিষ্যৎ নারী জাতির স্বাধীনতার যে গৌরবোজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহারই কথঞ্চিৎ বাহ্যপ্রকাশ দেখা যায় তাঁহার কর্মজীবনে।'' তাঁর সমগ্র সাহিত্যকীর্তি এবং বাংলা

সাহিত্যে তাঁর নির্দিষ্ট স্থান নিয়ে আলোচনা না করলেও তাঁর একটি অসামান্য সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করতেই হয়। Sultana's Dream এর কথা বলছি। ইংরাজিতে রচিত এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদও তিনি করেছিলেন। এস্থলে একটু বেমানান হলেও অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে একটি ফরাসী প্রবাদ স্মরণ করছি — অনুবাদ কর্মে রোকেয়ার সার্থকতা প্রমাণের জন্য। প্রবাদটির বাংলা মর্মার্থ — 'অনুবাদ নারীর মত, যদি সুন্দরী হয়, তবে বিশ্বস্ত নয়, এবং যদি বিশ্বস্ত হয় তবে সুন্দরী নয়।'' রোকেয়ার অনুবাদ সুন্দর হয়েও বিশ্বস্ত, কিংবা বিশ্বস্ত হয়েও সুন্দর।

Sultana's Dream খুব সম্ভবত বাংলা রচিত প্রথম science fiction। যাই হোক Sultana's Dream-এর বিশেষভাবে উল্লেখের কারণটি বলি। একটা ধারণা খুব চালু হতে শুরু করেছে যে, সমাজে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় ধর্মই একমাত্র দায়ী। কিন্তু বিজ্ঞান এবং আধুনিক দর্শনও যে পুরুষ প্রাধান্য বিস্তারে কম যায় না, একথা আমরা অনেকে ভেবেই দেখিনা। নীটশে, ফ্রয়েড প্রমুখ অনেকেই নারীকে পুরুষের চেয়ে প্রকৃতিগতভাবে নিকৃষ্ট, এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন। আধুনিক জীববিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর চেষ্টাও দেখা যায়। Sultana's Dream-এ রোকেয়া এসব তত্ত্বের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন।

'সুরাহা-সম্প্রীতি'র গত এক অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় হাসান আজিজুল হক রোকেয়ার কর্মস্থল পশ্চিমবঙ্গে রোকেয়ার চিন্তার প্রভাব কতটুকু পড়েছে জানতে চেয়েছেন। উত্তরটা কি হবে তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। তাঁর এই প্রশ্নের জবাব দেবার যোগ্যতা না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে জবাব দেবার দায় এড়াতে পারিনা।

প্রথমতঃ স্বীকার করি, বেগম রোকেয়া পশ্চিমবঙ্গে একজন বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং, বলাই বেশি, তাঁর রচনাবলী বহুপঠিত নয়।

তবে রোকেয়ার চিন্তাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা আবার সৃষ্টি হয়েছে। না হলে, বহু দেরীতে হলেও, তাঁর সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক ঔৎসুক্য এপার বাংলায় জাগ্রত হত না। তবে যে মুসলিম নারীদের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার বেশিটা ব্যয় করেছেন, তাদের সম্পর্কে বলতে গেলে সতর্ক হতেই হয়। সাধারণভাবে, ইতঃস্তত মুসলিম নারী শিক্ষার প্রসার হলেও কিছুতেই তাকে সন্তোষজনক বলা যায় না। যে বিদ্যালয় তিনি রেখে গেছেন, সেখানে মুসলিম ছাত্রীর স্বল্পতা ইতিবাচক কোন ইঙ্গিত বহন করেনা। আজকের কোন রোকেয়ার পক্ষে ''অবরোধবাসিনী'' এবং ''বিয়ে পাগলা বুড়ো''র আধুনিক সংস্করণ বের করার

জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা সংগ্রহে বেগ পেতে হবে না।

গত ১২-১১-৯৪ তারিখের আনন্দবাজারের একটি খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাহ্যিক অনেক স্বাধীনতা ভোগ করলেও সমাজে নারীদের নিরাপত্তা যে এখনও বাড়েনি তার জন্য বিস্তারিত পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। ঐ খবরে বলা হচ্ছে — ইউনিসেফের সহযোগিতায় মালদহ টাউন হলে আয়োজিত Social Defence শীর্ষক এক আলোচনাচক্রে পুলিশের বড় কর্তারাই স্বীকার করেছেন যে, নারী নির্যাতনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান। সুতরাং নারীদের দুঃখের এখনও অবসান হয়নি।

নারীমুক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গে এখন অনেক সংগঠন কাজ করছে। তবুও অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে কৈ? এটা কি খুব অসঙ্গত হবে, যদি বলি আজকে অনেক নারী সংগঠন গড়ে উঠেছে — কিন্তু একজনও রোকেয়া আমাদের মাঝে নেই। তাই এই ব্যর্থতা।

রোকেয়ার চিন্তা তাই ছড়িয়ে দেবার আজ খুব দরকার। এ কাজের সর্বোত্তম উপায় রোকেয়ার রচনা পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তি। সুধী সমাজ এগিয়ে আসবেন কি?

বক্তব্য আর স্ফীত করতে চাই না। রোকেয়ার বিশাল ব্যক্তিত্বকে আমার মত অর্বাচিনের পক্ষে প্রকাশ করতে চাওয়া অন্ধের হস্তি দর্শনের মত। তবুও অন্ধের অংশ বর্ণনায় যদি সুধীজনের পূর্ণ দর্শনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে — সেই আশাতেই এই প্রচেষ্টা।

রোকেয়ার মৃত্যুর পর এ. কে. ফজলুল হকের দেওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে শেষ করছি।

"She was one of those gifted people who raised their own memorial by their own hands in their own lifetime."

[পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তরুণ গবেষক প্রদত্ত ভাষণ]

উপেক্ষিত ব্যক্তিত্ব

ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম যে উপদেশটি এখনও আমরা বহু প্রসঙ্গে নানা উপলক্ষে উচ্চারণ করে থাকি — সেই পরম বাণীটি হল —

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাং সি জানতাম্"

অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে কাছে টেনে নেবার, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে ঐক্যবদ্ধ হবার, পরস্পরের চিন্তাধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার প্রকৃষ্ট সামাজিক আদর্শকে এখানে ঘোষণা করা হচ্ছে।

মানুষের প্রগতির সবচেয়ে বড় লক্ষণ যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী আর মানুষে মানুষে মেলবন্ধন — এ অভিজ্ঞতা আমরা বহুকাল ধরে ইতিহাস থেকে, জীবনের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষা থেকে অর্জন করে চলেছি। তবু এখনও আমরা ভুল করি, ভুলে থাকি সবচেয়ে কাছের জনকে। আর সেইজন্যই সহৃদয় সামাজিক বাঙালী পাঠক ও গবেষকমহলে আজ কোন প্রবাসী বাঙালীনীর ইংরেজিতে লেখনী চর্চায় ব্যুৎপত্তি যতখানি উল্লাসকর অথবা বিদেশী সাহিত্যের গলিঘুঁজিতে অন্বেষণ যতটা আত্মপ্রসাদক, সে তুলনায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বা সম্প্রদায়ের একই ভাষাচর্চার গতিপ্রকৃতিকে সাধারণ্যে পরিবেশনের দায়িত্ববোধ ততখানিই ক্ষীণ। দেশভাগের মতই একই ভাষাভাষী হয়ে সাহিত্যেও আমরা মেনে নিয়েছি এই বিচ্ছিন্নতার সুউচ্চ প্রাচীরকে। সেইজন্যই বঙ্গীয় সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের প্রধান উদ্যোক্তা এবং মূল পরিপোষ্টারূপে রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কিংবা প্যারীচাঁদ ভূদেব বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে আলোচিত হন কখনই সেই সময়ের কোন মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকের অবদান সেই একই সারণীতে উল্লিখিত হয় না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে আমরা কখনো কখনো স্মরণ করে থাকি মীর মোশারফ হোসেন, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বা বেগম রোকেয়ার মত সাহিত্য সেবী সমাজ সংস্কারক ভাবমূর্তিকে কিন্তু কখনই আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে চিহ্নিত হন না এঁদেরই সমকালীন মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক মনস্বী সাহিত্য

স্রষ্টা ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মত দিশারী ব্যক্তিত্ব। অবশ্য এই বিস্মৃতির জন্য কেবল দেশভাগই দায়ী নয়, একদিকে উনিশ শতকীয় হিন্দু অধ্যুষিত নবজাগরণ অন্যদিকে ওহাবী ফরায়েজীর মত রক্ষণশীলতার ধ্বজাধারী মুসলমান আন্দোলনগুলিরও এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির দায়িত্ব রয়েছে। মোটামুটি ১৮৭০-এর পরেও ইংরেজী শিক্ষিত সাহিত্য রচনায় নবউদ্যোগী বাঙালী মুসলমান লেখকের কাছে সাহিত্য ক্ষেত্র ছিল হিন্দু মুসলিম শক্তি পরীক্ষায় আক্রান্ত। ভূদেব-বঙ্কিমের সাহিত্যে ঘোর মুসলমান বিদ্বেষ লক্ষ্য করে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মত লেখকরা উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক নির্মাণে বঙ্কিম অনুকারী হয়ে দুর্গেশনন্দিনীর দাঁতভাঙা জবাব হিসেবে "রায়নন্দিনী" লিখে যে বঙ্কিম বিরোধী সাহিত্য ধারাটির সূত্রপাত করলেন, তার সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া এবং স্বধর্মের গৌরব প্রচারই অশিক্ষা ও অসতর্কতার দৌলতে ক্রমশঃ হিন্দু বিদ্বেষেই ইন্ধন জোগাতে শুরু করে। অবশ্য ব্যর্থ অনুকারকদের বিরোধের এই নিষ্ফলা সময়কে কাটিয়ে উঠে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের তিক্ততা, সমকালীন মুসলমান সমাজের অশিক্ষা, বহুবিবাহ, পীর-ফকিরের ভণ্ডামি সম্পর্কে একাধিক সচেতন শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিত্বকে সোচ্চার হতে দেখা গেল। রবীন্দ্রযুগের এবং শরৎচন্দ্রের সমকালীন এই সমাজসচেতন মুসলমান লেখকগোষ্ঠীর এক অন্যতম নক্ষত্র মনীষীতুল্য সাহিত্যসেবী মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। ১৯২৬-এর জানুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে 'বুদ্ধির মুক্তি'কে মূলমন্ত্র করে যে "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয় যার মুখপাত্র পত্রিকা "শিখা"কে প্রজ্জ্বলিত করার আগের সলতে পাকানোর দায়িত্বটি বহন করেছিলেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া বা নজীবর রহমানের মত লেখকরাই। তখন অবিভক্ত বাঙলার বুকে ছুরি না চললেও উনিশ শতকীয় কলকাতা কেন্দ্রিক নবজাগরণ যেমন বাঙালী মুসলমানের মননশীলতাকে আলোড়িত করেনি সেইভাবেই বিংশ শতাব্দীর এই মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলন অতিক্রম করতে পারলো না সাম্প্রদায়িকতার বাধাকে। তবু মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে সামগ্রিক বঙ্গসংস্কৃতির শুভানুধ্যায়ী রূপেই অগ্রবর্তী আলোকবর্তিকাটির ধারক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান।

সাহিত্যিক হিসেবে শরৎচন্দ্রের এমনকি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়েরও সমতুল্য ছিলেন না মোহাম্মদ লুৎফর রহমান কিন্তু ছিলেন দুর্লভ নৈতিক সচেতনতার অধিকারী। তিনি সমস্ত বাঙালীকে যথার্থ "অমৃতের পুত্র" রূপে বিশ্ব

পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। শুধু লেখার কাল্পনিক বাতাবরণের মধ্যেই নয়, ব্যক্তি জীবনে অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে বহু প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন চিন্তনের উপাসক লুৎফর রহমান মানবতাবাদেরই কেতন ওড়াতে চেয়েছেন।

১৮৮৯ অথবা '৯১-তে যশোরের মাগুরা মহকুমার পারনান্দুয়ালী গ্রামে মামারবাড়িতে জাত লুৎফর রহমানের ১৯৩৬ পর্যন্ত স্বল্পায়ু জীবৎকালে কাজের পরিধি ছিল যেমন প্রসারিত তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথম কবিতার বই "প্রকাশ" বেরিয়েছিল ১৯১৫-তে এবং বছর পাঁচেকের মধ্যেই প্রকাশিত হয় একাধিক উপন্যাস ও প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রকাশকালের দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর এই লেখক সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে — যে বিশ্বাসকে, জীবনবোধকে, সামাজিক আবেদনকে উৎকীর্ণ করেছিলেন সমাজ সংস্কারক হিসেবে নানা কর্মোদ্যোগের মধ্যে সেগুলিকেই মূর্ত করে তুলতে আজীবন যুদ্ধ করে গেছেন। পিতৃ ও মাতৃকূল সম্ভ্রান্ত ধনী হওয়া সত্ত্বেও হাজীপুরের দরিদ্রকন্যা আয়েশা খাতুনকে জীবনসঙ্গিনী বেছে নিয়েছিলেন — তার জন্য ত্যাজ্যপুত্র হবার অভিশাপকেও বরণ করে নেন। অশেষ আর্থিক অনটনের মধ্যেও শুধু জীবিকানির্বাহের তাগিদে নয় বরং পরহিতার্থেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘকাল। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে, ছোটগল্পে 'পথহারা' নামক উপন্যাসে বারংবার যে পতিতা মেয়েদের সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে — হিন্দু ও মুসলিম মেয়েদের অশিক্ষা-অসহায়তাজাত বন্দীত্বকে আঁকা হয়েছে তাঁদের জন্য যেমন লেখার মধ্যেও উত্তরণের পথ খুঁজেছেন সেই সঙ্গে কলকাতার মির্জাপুরস্থ ৫১নং বাড়ীটিতে পতিতাদের মঙ্গলার্থে "নারীতীর্থ" ও "নারী শিল্প শিক্ষালয়" কেন্দ্রও খুলেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্যই "নারীশক্তি" নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করতে শুরু করেন। যে সময়ে "সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি" প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র বলেন, "তাই বলে আমরা সমাজ সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের ওপরে নাই।" — সমকালীন এবং সম্ভবত শরৎচন্দ্র অনুপ্রাণিত লেখক হয়েও লুৎফর রহমান কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে এবং ব্যক্তি হিসেবেও সমাজসংস্কারকের গুরুদায়িত্বটিই তুলে নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর লেখা ছিল যেসব তত্ত্বের আধার — ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টা ছিল সেইসব তত্ত্বেরই পরীক্ষাগার। তাই সমাজের বৈরিতা এবং আর্থিক অনটনে যখন তাঁর সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যর্থতা নেমে আসে তখনই নিদারুণ অর্থাভাবে যক্ষ্মারোগের আক্রমণে তাঁর লেখনীও স্তব্ধ হয়ে যায় চিরতরে। সর্বমানবের কল্যাণসাধনই

যেহেতু ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সেইজন্য সম্প্রদায়, সমাজ বা ধর্ম তাঁর কর্মগতিতে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ত্যাজ্যপুত্র হয়েও যেমন আয়েশা খাতুনকে বরণ করে নিয়েছিলেন সেইরকমই এবং এফ. এ. পড়ার সময় যে এণ্টালী হোস্টেলে থাকতেন সেখানের নিকটবর্তী গীর্জার পাদ্রীদের কর্মপ্রণালীতে উৎসাহিত হয়ে উঠে দীক্ষা গ্রহণের জন্যও মনস্থ করেছিলেন। জীবনের এতবড় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে কারণটি ছিল গীর্জার পাদ্রীদের বারবণিতাদের পুনর্বাসনের আন্তরিক প্রয়াসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। পরবর্তীকালে লুৎফর রহমানের নারী সেবা কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং সাহিত্যচর্চায়ও এই ঘটনার যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলেই মনে হয়।

বিদূষী মা এবং ইংরেজী শিক্ষিত বাবার প্রভাবে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডীকে অতিক্রম করে য়ুরোপীয় সাহিত্য দর্শন এবং সমাজজীবন সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠেন। ফলে য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি তথা — যুক্তিবোধ, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ স্বদেশপ্রীতি ইতিহাসচেতনার স্পর্শে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানও ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির প্রবক্তা পুরুষদের মতই বহুমুখী প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত হয়ে ওঠেন।

লুৎফর রহমানের রচনার শিল্পরীতি এবং বিষয় চয়নের মধ্যেও অনেকাংশে উনিশ শতকীয় গদ্য লেখকদের সাযুজ্য অনুভব করা যায়। ১৯১৯ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যেই প্রকাশিত তাঁর আটটি প্রবন্ধগ্রন্থ উন্নতজীবন, মহৎজীবন, মানবজীবন, সত্যজীবন, উচ্চজীবন, ধর্মজীবন, যুবকজীবন, মহাজীবনের মধ্যে উনিশ শতকীয় উপযোগবাদী বাঙলা গদ্যের লক্ষণ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। প্রতিটি একাধিক প্রবন্ধের সংকলন, গদ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে লেখক যদিও প্রধানত মুসলিম পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন, সংস্কৃতির আদর্শের মূল্যায়ণ করেছেন তথাপি সম্প্রদায়গত গণ্ডীকে পেরিয়ে লেখাগুলির মধ্যে 'মানুষ' গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটিই ধরা দিয়েছে। যেমন 'উন্নতজীবন' প্রবন্ধ গ্রন্থটির মধ্যে 'জাতির উত্থান' 'ব্যক্তিত্ব ও শক্তির সফলতা', 'জীবনের মর্যাদা' ইত্যাদি শীর্ষক রচনার মধ্যে ছোট ছোট কাহিনী বর্ণনার মধ্যে দিয়ে শিরোনামাঙ্কিত বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইংলণ্ডের একাধিক বিজ্ঞানী মনীষীর জীবনবৃত্তান্তের পরিচিতি দিয়ে লেখক সম্প্রদায়নির্বিশেষে পাঠকের কাছে প্রশ্ন রাখেন — "ইংলণ্ডের বহু মনীষীর জন্ম বৃত্তান্ত খুবই হীন। পরিশ্রম ও জ্ঞানার্জন দ্বারা তাঁরা মানুষ হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তুমি কেন পারবে না?" যে সময় বিলেৎ ফেরত যুবকদের

ঠাট্টা করে বলা হোত তাঁরা বিলিতী ধরনে হাসে ফরাসী ধরনে কাশে। পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসে। তখন সবরকম রক্ষণশীলতাকে দূরে ঠেলে লুৎফর রহমান তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধে কেন এই ধরনের গল্প বলার ভঙ্গীকে গ্রহণ করেছেন তার সপক্ষে যুক্তি উত্থাপিত করতে গিয়ে বলেছেন — ''জীবন্ত আদর্শের মূল্য বেশী। অশরীরীভাবে ভাল কাজ হয় না। বিলেতে গেলে বড় বড় উন্নত ব্যক্তির জীবন্ত আদর্শে আমরা নিজদিগকে শক্তিমান করতে পারি, তাই সেখানে যাই। শক্তির স্পর্শে এসে নিজের শক্তি জেগে ওঠে। সেই কোরআন আছে। তবু মুসলমানজাতি উন্নত হল না কেন? অতীত হিন্দু-মুসলমান মানুষ হই না কেন? যত কথা শুনি আর পড়ি, কিন্তু কই, তাতে ভাল কাজ হয় কই? চাই মানুষ, জীবনীশক্তিময় আদর্শ। যার স্পর্শে প্রাণে জাগরণ আসে।''

''উন্নত জীবন'' প্রবন্ধগ্রন্থটি পড়তে গেলে অবশ্যই স্থিতধী পাঠকের মনে পড়ে যাবে বিদ্যাসাগর মশাই-এর 'আখ্যানমঞ্জরী''-র কথা। ১৮৬৩-তে প্রকাশিত আখ্যানমঞ্জরীর একাধিক খণ্ডে একইভাবে 'প্রভুভক্তি', 'নিঃস্পৃহতা', 'রাজকীয় বদান্যতা', 'মাতৃবৎসলতা' প্রভৃতি শীর্ষক রচনায় দেশবিদেশের কাহিনী কিংবদন্তীর প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরও জীবনচর্যার প্রতিটি দিককে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন।

লুৎফর রহমানের 'উচ্চ জীবন' গ্রন্থটির সঙ্গেও বিদ্যাসাগর মশাই-এর ১৮৪৯-এ লেখা ''জীবনচরিত'' এবং ১৮৫৬-তে প্রকাশিত চরিতাবলীর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। সংক্ষেপে সরল ভাষায় এই রচনাগুলির মধ্যে বিদ্যাসাগর য়ুরোপীয় মনীষী দার্শনিক এবং গ্যালিলিও নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জীবনাদর্শকে চিত্রিত করেছিলেন। 'উচ্চজীবন'-এর মধ্যে লুৎফর রহমানও 'নারী-পুরুষ', 'শহর ও পল্লীজীবন', 'জীবনের ব্যবহার', 'পিতৃ মাতৃভক্তি' শীর্ষক লেখাগুলিতে বিভিন্ন য়ুওরোপীয় সাহিত্যিকদের জীবনকেই মানুষ হওয়ার পথে লক্ষ্যবিন্দু রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আবার 'ছোটকথা ছোট উপদেশ' নামে বইটিতে বিদ্যাসাগর বিরচিত 'কথামালা' অথবা ঈশপের গল্পের মতই নীতি উপদেশাত্মক ক্ষুদ্র গল্পসম্ভার পরিবেশন করেছেন শিশু-পাঠকদের উদ্দেশ্যেই। কিন্তু তার মধ্যে কোন কোন নীতিগল্প শিশুমনকেই শুধু নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের সচেতন করে তোলারও যথেষ্ট উপযোগী। এমনকি ছদ্ম রসিকতার আবরণে যেভাবে অপ্রিয় সত্যকে কোন কোন গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন তা এখনকার জনপ্রিয় হাস্যরসিক তারাপদ রায়ের কাণ্ডজ্ঞানকেও মনে পড়িয়ে দিতে পারে। যেমন এই গল্পটি শুনুন ঃ এক ব্যক্তি

এক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একদা তিনি আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার গৃহে লইয়া গেলেন। অতঃপর পুস্তকের মূল্য নিরূপণের জন্য প্রণীত পুস্তকখানি আমার নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন। উৎসাহ দিবার জন্যই হউক অথবা মন্দ পুস্তক হয় নাই বলিয়াই হউক — আমি পুস্তকের প্রশংসা করিলাম। অতঃপর সে আমার গ্রীবা ধারণ করিয়া তাহার বিছানা হইতে উঠাইয়া দিল। তিনি কহিলেন ঃ আমার বিছানায় বসিবার তোমার কোন অধিকার নাই। আমি যে এত বড় তাহা আমার জানাই ছিল না।"

আপাত নিরিখে লুৎফর রহমানের সঙ্গে সমকালীন লেখকদের তেমন ভাবের আদানপ্রদান ছিল বলে মনে হয় না কিন্তু ইসলামের শিক্ষার সূত্রেই লুৎফর রহমান ছিলেন নিপীড়িত মানবতার জন্য সমব্যথী, সেই প্রেক্ষিতে নিজের সময়ের লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরোক্ষ গ্রন্থনা ঘটে গিয়েছিল। 'ধর্মজীবন' গ্রন্থের 'আজগুবী গল্প' নামক প্রবন্ধটিতে তিনি যেমন তথাকথিত ধর্মের ধ্বজাধারী মোল্লাদের আক্রমণ করে লেখেন — "মুসলিম জগতে হযরতের জীবনীপাঠ মুসলিম গার্হস্থ্যজীবনের একটা মস্ত বড় উৎসব, মোল্লাদের দৌরাত্ম্যে একেবারে মাটি হয়ে যাচ্ছে। এদিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহৎ ব্যক্তিদের অগ্রণী হওয়া উচিত। বাংলাদেশে কিন্তু যারা অশিক্ষিত, অপদার্থ ভিক্ষুক তারাই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে কর্মকর্তা হয়ে ওঠে।"

ভারতী-প্রবাসী-সবুজপত্রের সময়ের জনপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী পত্রিকা 'সওগাত'-এর অন্যতম লেখক ছিলেন লুৎফর রহমান। তাঁর সহমর্মী সওগাতের আরও একজন লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর — "মোল্লাদের প্রভাব ও শিক্ষিত সমাজ" রচনাটিতেও একইভাবে মোল্লাদের সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারিত হতে দেখা যায় — সেখানেও লেখক বলেন, মোল্লাদের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট সংস্কারগুলিকে বর্জন করিয়া স্বাধীন মুক্ত হৃদয় লইয়া কোরআন বুঝিতে চেষ্টিত হইলে তাঁহারা দেখিবেন, কত বড় বড় উদার সত্যকে মোল্লারা নানাবিধ আবর্জনার স্তূপে আবৃত করিয়া সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়েছেন।"

কিংবা নামাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যখন লুৎফর রহমান বলেন, "শুধু দিন রাত্রি ঘরে বসে উপাসনা করাই আল্লাহর উপাসনা নয়। দুঃখী মানুষের সেবা করে জগতের পাপ ও অন্যায়ের সংস্কার করে প্রেম ও আত্মীয়তার পরিচয় দিতে হবে। যে মানুষের আত্মীয় সেই মহাজন ঈশ্বরের আত্মীয়।" এই উপলব্ধির মধ্যে যেন ইসলামের মর্মবাণীটিই ধ্বনিত — যেখানে বলা হয় ইসলাম কেবল ধর্মবিশ্বাসই নয়, তা এক সামগ্রিক জীবনচর্যা। ইসলামের এই শিক্ষার্জিত বোধ

থেকেই 'ধর্মের জীবিত উৎস' প্রবন্ধটিতে লেখক অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবেই নামাজ রোজার প্রতি মুসলমানের অতিরিক্ত আনুগত্যকে কটাক্ষ করে বলতে পারেন ঃ নামাজের জন্যই এই অতিরিক্ত ভীতিপ্রদর্শন মুসলমান সমাজের ধর্মজীবনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। তার আধ্যাত্মিক জীবন চূর্ণ হয়ে গেছে। নামাজ-রোজা হয়ে পড়েছে তার কাছে দুই সশরীরী দেবতা। সে এইভাবে প্রাণে মূর্তিহীন প্রতিমা পূজো শুরু করেছে।" আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে ধর্মীয় উপাসনা পদ্ধতি সম্পর্কে লুৎফর রহমান যে উদারনৈতিক আধুনিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন সাম্প্রতিককালের বুদ্ধিজীবীর লেখাতেও কিন্তু সেই একই উপলব্ধির প্রতিবিম্ব পড়তে দেখা যায়, আর তখনই অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে আজকের দিনেও লুৎফর রহমানের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা। একালের লেখকও পৌত্তলিকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "পৌত্তলিকতা বলতে শুধু পুতুল পুজো নয়, ...সীমাবদ্ধ যে কোন বস্তু বা সমষ্টির প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ স্থাপন করার নামই পৌত্তলিকতা। জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ শ্রেণী সংগ্রামের বিশেষ তত্ত্ব এসবেরই পরিণামে এ যুগে আমরা পেয়েছি কোন না কোন রূপে সীমাবদ্ধ পুজো আর সংঘবদ্ধ অসহিষ্ণুতা, পূর্ণ মানবতার সঙ্গে যার সামঞ্জস্য নেই। মুক্ত মানুষের জীবনদর্শন এসব হতে পারে না।" প্রথম জনের আশঙ্কা আর দ্বিতীয় জনের সিদ্ধান্ত যেন সাম্প্রতিক সর্বনাশের ছবিটিতে রক্ত মজ্জা গ্রথিত করে দেয়।

লুৎফর রহমান জীবনের এইসব উচ্চ পর্যায়ের বিশ্লেষণের পাশাপাশি একেবারে দৈনন্দিন চলার পথের বাধাবিঘ্নগুলিকেও এড়িয়ে যাননি। যেমন — 'যুবকজীবন' বইটিতে গল্পচ্ছলে কৈশোর ও যৌবনকালের মনস্তত্ত্বের ছবিটি আলোচিত হয়েছে। এমনকি হাদিসে যে সমমিথুনকে কঠিন শাস্তিযোগ্য পাপাচার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, ডাক্তার রহমান কিন্তু একজন মনস্তত্ত্ববিদের মতই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং সুরাহার পথ দেখিয়েছেন।

সমাজের প্রতিটি দিকেই তাঁর অতন্দ্র নজর বলেই 'মানবজীবন' গ্রন্থে গল্পের ভঙ্গীতে দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ এবং রেলওয়ে স্টেশন মাস্টারের পাশাপাশি এক সৎ যুবক পুলিশের নৈতিক প্রশংসাচিত্র তুলে ধরেছেন যা আমাদের দুই বাংলার পুলিস-প্রশাসনকে আজও সচেতন করে তুলতে পারে।

লুৎফর রহমান যে সময়ে সাহিত্য জগতে পা রাখেন তখন থেকেই মুসলিম সাহিত্য গোষ্ঠীর মধ্যে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতনতা দেখা দিচ্ছে। যদিও ঐতিহাসিক তথ্যের খাতিরে ১৮৯১-এর 'প্রেমদর্পণ'-কে বাঙালী মুসলমানের প্রথম সামাজিক উপন্যাস বলতে হয়, কিন্তু

লুৎফর রহমানের সমকালীন লেখক শেখ নজিবুর রহমানের 'আনোয়ারা'ই বলা চলে বাঙালী মুসলমানের লেখা প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস। অবশ্য আজকের দিনের সমালোচক বাহারউদ্দিনের অভিজ্ঞতায় কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' উপন্যাসটিই প্রথম মুসলিম সমাজের একটি নিরপেক্ষ দলিল চিত্র। সমস্ত কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা, পীরবাদ, আশরাফ-আতরাফ দ্বন্দ্ব সবই এই সমসাময়িক দর্পণটিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক হিসেবে লুৎফর রহমান ছিলেন এই সমস্ত লোকদেরই অনুপন্থী। তাঁর 'রায়হান', 'সরলা', বা 'পথহারা'-র মধ্যে যেমন লেখকের সময়কে চেনা যায়, একই সঙ্গে লেখকের ব্যক্তি জীবনের নানা অনুষঙ্গও পাঠক মনকে ইতস্তত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। অবশ্য এদের মধ্যে সমালোচকের বিশ্লেষণী মাপকাঠিতে একমাত্র 'সরলা'ই উপন্যাসলক্ষণাক্রান্ত। উপন্যাসটিতে দেখা যায়, ধর্ম ও দেবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত সরলা চারিত্রিক স্খলনের জন্যে পারিবারিক স্নেহাশ্রয় ত্যাগ করে পথে বেরিয়ে পড়ে। ক্রমে আহমদ নামিত এক আদর্শবাদী মুসলমান যুবকের সংস্পর্শে এসে জীবনের নতুন স্বাদ অনুভব করে। শিক্ষিত হয়, হাতের কাজ শিখে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। আধুনিক উপন্যাসের গঠনগত সৌকর্য এ লেখায় অনুপস্থিত তবু সরলার জীবন উপাখ্যান আজও এমন পথহারা মেয়েদের দিশারী অবশ্যই হতে পারে।

অন্যদিকে 'পথহারা' উপন্যাসটির মধ্যেও বহু স্বতন্ত্র উপকাহিনীর সমাবেশ কিন্তু যথাযোগ্য গ্রন্থনার অভাবে উপন্যাসের শৈলী দুর্বল-নায়ক-নায়িকাহীন গল্পে প্রায় প্রতিটি চরিত্রই লেখকের কোন না কোন লক্ষ্য পূরণের অবলম্বন বা বক্তব্যের বাহক। হারিয়ে যাওয়া মেয়ে সরযূর পতিতাগৃহে বড় হয়ে উঠে বহু সংগ্রাম করে লেডী ডাক্তার হওয়া এবং আদর্শবাদী আবু রহমানকে বিবাহ করার মধ্যেই উপন্যাসের উপসংহার। কিন্তু এর মধ্যে দেখা দিয়েছে নারীলোলুপ ব্রাহ্মণ, পাশাপাশি লেঠেল মুসলমানের মহত্ত্ব, সরযূর চেষ্টায় পথভ্রষ্টা ফুলীর পুনর্বাসন। অন্যদিকে রয়েছে সমাজ লাঞ্ছিতা শান্তার হৃদয় বিদারক পরিণতি। যার জন্য লেখক হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই অভিযুক্ত করেছেন।

একসময়ে ঐতিহাসিক মুসলমান চরিত্রের বিকৃতির জন্য বাঙালী মুসলমান লেখকরা ভূদেব বঙ্কিম বিরোধী হয়ে উঠলেও লুৎফর রহমান এবং তাঁর সময়ের ঔপন্যাসিকদের লেখায় কিন্তু হিন্দু মুসলমান নরনারীর প্রেমই অন্যতম উপজীব্য হয়ে ওঠে। এবং তা রূপায়ণের মধ্যে ধরা দিচ্ছিল যেমন সমাজ সচেতক দৃষ্টি একই সঙ্গে এক নিরুদ্ধ বেদনাবোধ। ''ক্ষুধিত পাষাণ'', ''দুরাশার'' মত ছোটগল্পে

যে যবনীর প্রেম আমাদের রোমান্টিক আবিলতায় বিহ্বল করে, অন্নদাদিদি শাহ্‌জীর সম্পর্কের জটিল বিবর্তন অথবা কমললতা গহরের নিরুচ্চার প্রেম কিংবা অনুরূপা দেবীর 'মা'-তে নায়িকা মনোরমার সমদরদী ভাগ্য বঞ্চিতা রাবেয়ার ভালবাসা, বা শৈলবালা ঘোষজায়ার 'শেখ আন্দু' কাহিনীটি যেমন এখনও আমাদের ভাবিত করে, সমস্যার স্থিতাবস্থায় চিন্তিত করে, লুৎফর রহমানের উপন্যাসগুলিও সেই একই গুরুত্বের আসনে রয়েছে। শুধুই প্রেমের সীমাতে এদের মূল্যস্থিরীকৃত হয় না, কেননা দেখা যায় 'রায়হান' উপন্যাসে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রথানুসন্ধানই মূল প্রতিপাদ্য। খোরশেদের রক্ষণশীলতা যেখানে গিরিবালার প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে সেখানে উপন্যাসের একবিংশ পরিচ্ছেদে রায়হান সুষমাকে বলে —

"দেখ, আমাদের দুই জাতির ভিতরে সদ্ভাব স্থাপনের পথ এইভাবে তৈরী করলে মন্দ হয় না। হিন্দু বা মুসলমান পরিবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর নামকরণের সময় তার জন্য একটা ধর্মভাই বা ধর্ম বোন ঠিক করতে হবে। উচ্চস্তরের দশজনের চেষ্টায় এটাকে সকলে সামাজিক রীতিবলে গ্রহণ করতে পারে। হিন্দু বালিকা মুসলমান ধর্মবোন গ্রহণ করবে, মুসলমান বালিকা হিন্দু ধর্মবোন গ্রহণ করবে। পুরুষদের সম্বন্ধেও একই কথা। কেউ কারো সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করে মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধনকে সম্মানের চোখে দেখবে। দুই বিরুদ্ধ জাতির মধ্যে সখ্য স্থাপন অসম্ভব। ......অথচ হিন্দু মুসলমানের প্রণয় না হলে চলবে না। উভয়ের বাঁচবার পথ এই।"

'প্রীতি উপহার' এবং 'বাসর উপহার' উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হলেও উদ্দেশ্যমূলক যুগল রচনা প্যারীচাঁদ মিত্রের "অভেদী", "আধ্যাত্মিকা"-র মতই কাহিনী রূপকের আড়ালে পরিবেশিত নীতি উপদেশের ডালি। প্রীতিউপহারে ভাবী কুলসুম, ননদ হালিমাকে প্রাকবিবাহ পর্বে পরিবারে নারীর দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে এবং বাসর উপহার-এ দুই বন্ধুর কথোপকথনে পরিবারে পুরুষের কর্তব্যগুলি নির্দেশিত রয়েছে।

উনিশশতকের শেষদিকে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য প্রবন্ধে বলেছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে স্ত্রীগণেরও সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু সমকালীন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর পারিবারিক প্রবন্ধে 'স্ত্রীশিক্ষা' নামক রচনাটিতে মেয়েদের গার্হস্থ্যধর্ম শিক্ষার কথাই বলেছেন কিংবা অক্ষয় কুমার দত্ত ও স্ত্রীলোকের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারিনী হওয়া

মঙ্গলজনক মনে করেন নি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদিকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও স্পর্শ করে। আবার সেই সঙ্গে ১৮৯৫-তে বেথুন স্কুলে একটি মুসলমান মেয়েকে ভর্তি করাও হয় না। বস্তুতঃ ১৮৮৬ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত সময়সীমা ছিল প্রাথমিক ভাবে মুসলিম নারীজাগরণের জন্য উল্লেখযোগ্য — যে পর্বে অগ্রগণ্যা ছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। 'শিখা' পত্রিকায় সওগাতের পাতায় এমনকি বামাবোধিনী পত্রিকাতেও নিয়মিত মুসলমান লেখিকাদের রচনা প্রকাশের কথা জানা যায়। স্বভাবতই এসময়ের লেখক হিসেবে লুৎফর রহমানও অনুভব করেছেন শক্তি, ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের স্বাধীনতা ব্যতীত নারীর শরীরী রূপের কোনো মূল্য নেই। তাঁর কাছে মুসলমান নারীর পর্দার অর্থ বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা নয়, পর্দার অর্থ শরম -- পুরুষ হতে একটু দূরে থাকা। তাঁর মতে, প্রয়োজন হলে মেয়েমানুষের পুরুষের মতো মাঠে কাজ করা উচিত। এমনকি তিনি নারী সম্পর্কে এতখানি ঝুঁকি স্বীকার করতেও সম্মত, যে বলেন, "কেউ খারাপ হয় — হোক — পুরুষও তো খারাপ হয়।" সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি সব নারীকেই পরামর্শ দেন — সংগ্রাম করে বিবাহের সময় শর্ত করে নিতে হবে যে যাতে স্বামী লম্পট হয়ে স্ত্রীকে অপমান করতে না পারে। যাতে নারী ইচ্ছা করলে পুরুষকে তালাক দিতে পারে। অথচ এই লেখকই বাসর উপহারে বলেন — "নারী একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এই পবিত্রভূমিতে মনুষ্যরূপ অমৃত বৃক্ষের উদ্ভব হয়। নারীর পক্ষে ক্রোধ অমার্জনীয় অপরাধ। আঁখি জলই নারীমুখের শোভা। স্বামী যদি ভাল নাও বাসে তবু নারী স্বামীকে প্রেম করবে।" আবার বাসর উপহারেই দাম্পত্য জীবনের অত্যাধুনিক ছবি এঁকে পাঠককে চমৎকৃত করে লেখেন, "স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই স্বতন্ত্র শয্যা থাকা চাই। যদি পাশাপাশি দুইটি প্রকোষ্ঠ হয় তবে তাই খুব ভাল। প্রত্যেক মানুষের স্বভাবে একটা স্বাতন্ত্র্য এবং বিশিষ্টতা আছে — সেটাকে বজায় রেখেই স্বামী-স্ত্রীতে বাস করবে।" কিন্তু এই লেখকই হাদিসের বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন অতি ফিনফিনে বস্ত্র পরা মেয়েদের উচিত নয়। বস্তুত মনে হয় কোথাও কোথাও ডা. রহমান পুরুষানুক্রমিক পালিত প্রথার দাবীকে অস্বীকার করতে পারেননি। আবার যিনি বিবাহ বিচ্ছিন্না বা স্বামী বিতাড়িত মুসলমান নারীর স্বাধীন জীবন যাপনের সুবিধার্থে কাবিনের আর্থিক পরিমাণ বৃদ্ধিরও দাবী করেন, স্বামীকে ভয় পেতে বারণ করেন কিন্তু তিরিশের দশকে স্বল্প সংখ্যক হলেও মুসলমান নারী যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেছেন তখনও নারীর এই নতুন অভিযানকে কোনভাবে স্বীকৃতি

দেননি। যেহেতু ইসলাম একটি সমগ্র জীবনচর্যা তাই লুৎফর রহমান দাস-দাসীর প্রতি ব্যবহারের নির্দেশে কোরাণ এবং হাদিসের বাণী যেমন উচ্চারণ করেছেন সেই সঙ্গে সচেতন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণের পরিচয়ও দিয়েছেন। সে সময় দাসদাসীর প্রচলিত পারিশ্রমিক ছিল তিন/চার টাকা, লুৎফর রহমান ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্দেশ করেছিলেন ৪০/৫০ টাকা।

আবার বাসর উপহারে সন্তান পালনের নির্দেশগুলির মধ্যে একজন আধুনিক শিশু মনস্তত্ত্ববিদের পরিচয় যেন পাওয়া যায়। শিশুকে কোন কারণ দেখিয়ে কাজ করতে বলতে যেমন বারণ করেছেন সেই সঙ্গে বলেছেন শাসনের জন্য প্রহারেরও প্রয়োজন আছে তবে মারার সময় কথা বললে প্রহারের গুরুত্ব কমে যাবে। বর্তমানে যখন কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান সেই প্রেক্ষিতে লুৎফর রহমানের উপদেশ যেন সমস্যা সমাধানের পথ দেখায়। তিনি বলেছেন, ছেলেমেয়ের বয়স যখন ১৪/১৫ বৎসর তখন তাদের দিয়ে দিবারাত্র কাজ করাবে নাহলে রক্ষা নেই। এই বয়সে ছেলেমেয়ে গোপন পাপ করতে শেখে। সোনার হৃদয় পাপ কলঙ্কে ছাই হয়ে যায়। তোমার সহানুভূতি তোমার গভীর স্নেহ ও পুণ্যশক্তির প্রভাবে সে পাপকে জয় করতে শিখুক।"

লুৎফর রহমানের উপন্যাস বা প্রবন্ধ যতখানি প্রয়োজন সিদ্ধির বাহক তাঁর ছোটগল্প কিন্তু সেদিক থেকে অনেক বেশি স্বাধীন শিল্প প্রচেষ্টা। তা কতখানি সার্থক শিল্প হতে পেরেছে তা অবশ্যই বিতর্কের বিষয় কিন্তু ছোটগল্পে লুৎফর রহমান অনেক বেশি কলাকৈবল্যবাদী। এবং লেখকের ব্যক্তিজীবনের আসঙ্গ গল্পগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর প্রতিটি গল্পই শেষ হইয়াও হইল না শেষ শর্তেরই অধীন — পাঠকের কৌতূহলকেও জাগিয়ে রাখে. ভাবতে সাহায্য করে কিন্তু ছোট গল্পের যে মূল প্রতীতি বা Pointing finger যা একটি মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সামগ্রিক দ্যোতনাকে উদ্ভাসিত করে তা তাঁর সব গল্পে পাওয়া যায় না। তবু "অমাবস্যা" গল্পের অমা ও কিরণের দাম্পত্য জীবনের দূরত্ব উত্তমপুরুষে কথনরীতি, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক গল্পের আবহ রচনা করে। আবার 'পলায়ন' গল্পে অসহায় দরিদ্র আবির কুলত্যাগের মিথ্যা কলঙ্ক মাথায় নিয়ে বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান হোসেনকে দায়মুক্ত করার মধ্যে শরৎচন্দ্রের নায়িকার আত্মত্যাগ ছায়াপাত করে যায় অথবা 'রাজপথ' গল্পে ঘটনাচক্রে জীবনের জটিলতায় দুই গ্রাম্য বধূর শহরের পতিতায় পরিণত হওয়ার কাহিনী বর্ণনায় লেখক শুধুই শিল্পী — কখনই তাদের পুনর্বাসনের প্রচেষ্টায় সমাজসংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন না। বিশেষ করে বিবৃতিধর্মী 'ফিরে যাও' গল্পটিতে

মানবতার অপমানের বেদনা পাঠককে তীব্রভাবে বিদ্ধ করে।

"ফিরে যাও" গল্পের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আক্রান্ত দ্বীপটিকে ত্রাণ সাহায্য দিতে গিয়ে শুধু বৃথা প্রস্তুতির কালক্ষেপে সাহায্যের সমস্ত আয়োজনই অর্থহীন হয়ে যায় সেইরকমই যেন আজও আমরা দুই প্রতিবেশী একভাষী দেশ সাহিত্য সংস্কৃতির সংযুক্তির আন্তরিক প্রয়াসী হয়েও শুধু বৃথা তর্ক-বিতর্কে কালক্ষেপ করে চলেছি, ব্যবধানের সাঁকোটা আর অতিক্রম করা হয়ে ওঠে না। যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে মুসলমানবিদ্বেষী বলে একদা চিহ্নিত করা হয়েছিল তিনিই কিন্তু 'সামাজিক' প্রবন্ধে লিখেছিলেন —

"আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্যমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুনিলাম " উও ইয়ে হ্যায়" আমার বোধ হইল যেন "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটি কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।" মুক্ত বুদ্ধি আন্দোলনের প্রবক্তারাও শেষে অনুভব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও মিলন প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। ছিল না রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মধ্যেও, হয়তো কোথাও কোথাও পথ নির্বাচনের মধ্যে ছিল মতদ্বৈধতা কিন্তু উদ্দেশ্য তখন থেকেই একটি পারস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি। স্বাধীন মতের উপাসক সওগাতের লেখক সমাজ সংস্কারক সাহিত্য-স্রষ্টা লুৎফর রহমানের জীবন রেখা'রও যেন দু'টি মেরু। একটি হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্ববোধ তথা মানবতাবোধের প্রতিষ্ঠা, অন্যটি নারীশক্তির জাগরণ। যে দুটি কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁর অবদান সমস্ত রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক বাধাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছিল। তবু কাজী আবদুল ওদুদকে 'এ যুগের মুসলমান' শীর্ষক অভিভাষণে ডা. রহমানের অবদানের নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ করতে গিয়ে স্বীকার করতেই হয় — "এ যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের আসন এই তিনজনের — মিসেস আর. এস. হোসেন, কাজি এমদাদুল হক ও লুৎফর রহমান। একালের মুসলমানকে কঠিন কটু কিন্তু জীবনপ্রদ অনেক কথা তাঁরা শুনিয়েছেন। সেসব কথা তাঁদের কানে তেমন যে প্রবেশ করেছে তা মনে হয় না। তবে ব্যর্থ যে হয়েছে তাও নয়। আর সাহিত্যের প্রভাব হয়ত এমনিভাবেই হয়।"

একেবারে ব্যর্থ যে হয়নি তারই প্রমাণ যেন উৎকলিত করে উত্তরসূরী লেখক নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদের এই উপলব্ধিটি — "এই বাঙলা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙালী না হয়ে আমরা অপর কোনো একটা

জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের কখনও উত্থান নাই-ই, অধিকন্তু চির মেঘাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে পতন অবশ্যম্ভাবী।"

তবু এরই পাশাপাশি স্বীকার করতেই হয় এখনও অনেক পথ বাকি থেকে গেছে। আর গেছে বলেই — বিংশ শতাব্দীর প্রায় উপান্তে এসে এবঙ্গের বাঙালী মুসলমান গদ্যকার আবুল বাশারকে মহরমের প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের তথা মানবতাবাদের সূত্রানুসন্ধান করতে গিয়ে স্মৃতিচারণায় লালবাগের যুবক নৈনিহাল মির্জার কবি নজরুলের কাণ্ডারী হুঁশিয়ারের ব্যাখ্যাকে উদ্ধৃত করে দিতে হয়, নৈনিহাল লেখককে বলেছিল, "আপনি নজরুলের কাণ্ডারী হুঁশিয়ার কবিতাটা স্কুলে পড়েছেন কি? তা ওই কবিতায়, বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর কথাটা মনে পড়ছে আপনার? ওই যে খঞ্জর, ওটা সিমারী খঞ্জর, এজিদের খঞ্জর। ক্লাইভ আর এজিদ একই লোক। সেইজন্যই আমাদের কাছে কারবালা আর পলাশী আলাদা যুদ্ধ ছিল না। সুন্নীরা ওই কবিতাটার মানে বোঝেনি, হিন্দুরাও বোঝেনি, খঞ্জর কথাটা নজরুল খামাকা লেখেননি, সেই অস্ত্র সিমারের হাতে ছিল, তা সেকথা বাংলা স্যারকে বলতে তিনি হেসেই আকুল। কী বুঝবেন তিনি? তিনি তো হিন্দু টিচার।"

সময়ের এই জলছবিকে সামনে রেখেই মনে হয় ইতিহাসের একটিমাত্র ভুলের খেসারত কি এখনও পূরণ হওয়ার সময় হয়নি? নাকি এই বিচ্ছিন্নতাতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলাম — সেই ১৯২৬-এ লুৎফর রহমানও তো এই একই দ্বিধার দোটানায় অনুভব করেছিলেন —

"আমরা কি সত্যই উন্নতির পথে চলেছি? তাহলে দেখতে হবে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হচ্ছে কি না। সমস্ত জ্ঞান সমস্ত সভ্যতা সকল ধার্মিকতার প্রাণ প্রেম। প্রেম ব্যতীত জাতির সাধনা ব্যর্থ। দেখতে হবে আমরা দেশের মানুষকে ভালবাসি কি না। দেশের মানুষের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখেছি কি না? তাহলে বুঝবো জাতির সত্যই উন্নতি শুরু হয়েছে। আমরা কি প্রতিবেশীকে আঘাত করি? আমরা কারো দাবী নষ্ট করি? জাতির দুঃখে কি আমাদের কোন সহানুভূতি নাই? পরস্পর কি আমরা মিথ্যা ব্যবহার করি? তাহলে বুঝবো কিছুই হয় নাই।"

বিস্মৃতপ্রায় মনীষী সাহিত্য স্রষ্টা মোহম্মদ লুৎফর রহমান বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন দেখা যাচ্ছে নব্বই-এর দশকের লেখক আবুল বাশার এখনও উত্তরগুলির অনুসন্ধানী। মানবতাবাদী সময়সচেতন মোহম্মদ লুৎফর রহমান সমস্ত জীবন দিয়ে যে সমস্ত বাধার দেওয়ালগুলোকে

ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন, দুঃখজনক হলেও একথা স্বীকার করতেই হয়, নতুন ইঁটপাথর যোগ হয়ে সেই দেওয়াল আজ যেন আরও মজবুত হয়েছে। তাই ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের মত সংস্কারক মনীষীতুল্য লেখক আজও আমাদের প্রাসঙ্গিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, নতুন করে শিকড়ের খোঁজে তাড়িত করতে পারেন।

[ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯৯৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইন্দুমতী সভাগৃহে প্রদত্ত। বক্তা ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজের অধ্যাপক।]

লুৎফর রহমানের আত্মপ্রত্যয় ও বাংলাদেশে সঙ্কট-মুক্তির দিশা

গৌরাঙ্গ মণ্ডল

কেন লুৎফর রহমান? এই জিজ্ঞাসা দিয়েই গাঁটছড়ার গোড়ার কথা শুরু করা যাক। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) এবং কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এই চারজন বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক সমসাময়িক হলেও — রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম এবং কাজী ইমদাদুল হক সম্পর্কে যতটা সকলে জানেন, লুৎফর রহমান সম্পর্কে কেউ ততটা অবগত নন। এখানে স্মর্তব্য, আজ থেকে ষাট বছর আগে লুৎফর রহমান এই কলকাতাতেই ছিলেন ; তাঁর জীবনের শেষ ১৫ বছর বসবাসও করেছিলেন এখানেই।

১৯৮৯-এ তাঁর জন্মশতবর্ষ হলেও কোথাও লুৎফর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়নি। অথচ বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ সদর্থক ভাবনার মূল বীজ তিনিই বপন করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁকে সামনে রেখেই — তাঁর অনুসরণে নতুন করে বীজ রোপন করবেন অনেক সৃজনশীল মানুষ। এই মানুষটি গ্রাম থেকে শহর কলকাতায় এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল জীবিকার অন্বেষণ এবং নিরন্তর সাহিত্য সাধনা।

'উন্নত নৈতিক চেতনা সম্পন্ন জীবন গঠনের ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন।'[১] তৎকালীন সমাজে নৈতিক অধঃপতনের যে ঘুণ ধরেছিল তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন। বর্তমান সমাজেও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় তাতে তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীদের, তাঁর গ্রন্থপাঠ করা জরুরী মনে হয়।

'ব্যক্তি-মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথই হল তার চরিত্র গঠন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন।'[২] মানুষ কোন ছাঁচে ঢালাই জীব নয়, তাকে অনন্তর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এগোতে হয়। তাঁর আদর্শ ছিল — কোন কাজের প্রতি অন্তহীনভাবে লেগে থাকা।

পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী যেভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহনন করছে, অথবা নেশাগ্রস্ত হচ্ছে — তাতে তাঁর 'উচ্চজীবন' গ্রন্থটির অনুষঙ্গ মনে আসে। গ্রন্থটি পাঠ করলে এ ধরনের জীবন-বিমুখ মানুষের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বাংলাদেশে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি তাঁর প্রবন্ধ পড়ানো হয়। আমরা আশা করবো পশ্চিমবঙ্গ, আসামের বরাক উপত্যকা এবং ত্রিপুরাতেও তাঁর প্রবন্ধ পাঠ্য হবে এবং ছাত্রছাত্রীরা উন্নত মানস গঠনে আত্মিক সহযোগিতা পাবে।

'সাধারণত কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন প্রমুখের "শিখা" গোষ্ঠীকেই মনে করা হয় বাঙালি মুসলমান সমাজে "মুক্তবুদ্ধি" আন্দোলনের পথিকৃৎ। কিন্তু কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে এঁদের তুলনায় কিছুটা আগেই ইউরোপীয় মানবতাবাদের চর্চা এবং ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণার গভীর অনুশীলন করেছিলেন লুৎফর রহমান।'[৪] তাঁব আটটি প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রত্যেকটির পাতায় পাতায় কী নারী, কী পুরুষ, সকলেরই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়গান করেছেন তিনি। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি কখনই 'তথাকথিত' মধ্যবিত্ত বনে যাওয়ার প্রচেষ্টা করেননি। বরঞ্চ তিনি ক্রমশঃ মধ্যবিত্তের পর্দা সরিয়ে বিত্তহীনদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। শেষ ১৫ বছর কলকাতায় থেকেও কখনো প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

'বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে কেউ কেউ বিস্ময়কর উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। এই মন্তব্যের সময়ে বিশেষ করে মনে পড়ছে লুৎফর রহমানের কথা। রেনেসাঁসের সাধনা যেমন আর সবকিছুর উর্ধ্বে মানুষকে স্থান দিয়েছিল, তাঁর (লুৎফর রহমানের) রচনায় সেই প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।'[৫] তাঁর যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধাবলী তৎকালীন শিক্ষিত সমাজেও বেশ সমাদর পেয়েছিল। ব্যক্তির বিকাশের মধ্য দিয়েই তিনি সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নতির কথা ভেবেছিলেন। 'কোন জাতিকে যদি বলা হয় — তোমরা বড় হও, তোমার জাগ — তাতে ভাল কাজ হয় বলে মনে হয় না। এক একটা মানুষ নিয়েই এক একটা জাতি।'[৬] এই একটি বাক্যের মধ্যেই ইউরোপীয় মানবতাবাদের সামগ্রিক ধারণার অভিঘাত ঘটেছে।

মানুষ যেদিন পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হল, সেদিন থেকেই মানুষের জীবনে সাদা সত্যের ন্যায় নেমে এল অন্তহীন সংগ্রাম। আর ঐ অনন্তর সংগ্রামই তাঁকে জীবনমুখী করে তুলল। লুৎফর রহমানের জীবনবাদী ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অস্তিবাদী চিন্তার নির্যাস। তিনি সর্বদাই সাংসারিক চিন্তার উর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক

চিন্তায় নিজেকে লীন করেছেন। হরদম জীবনের পক্ষে কথা বলেছেন ; জীবনের ইতিবাচক ও সদর্থক দিকগুলো নিয়ে তিনি সুপ্রচুর ভেবেছেন। জীবনের নঞর্থক ও নেতিবাচক দিকগুলোর আধিপত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তা থেকে জীবনের বিকাশ অসম্ভব — এটা বোঝাবার জন্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'পত্নীর দাবী শোধ দিবার জন্যে যদি পিতাকে অসন্তুষ্ট করতে হয়, তবে তা করতে হবে।'[৭] আসলে লেখক পিতৃত্বের পুং অহং এর প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে তাদের অযৌক্তিক দাবীর কাছে জীবন কীভাবে লাঞ্ছিত হয় সেকথা বলতে চেয়েছেন।

সমাজের 'তথাকথিত' ভদ্রলোকদের চিহ্নিত করেছেন তাঁর ভাষার নিজস্ব চিহ্ন দ্বারা। তাঁর প্রবন্ধে ফিরে ফিরে এসেছে চিহ্নক ও চিহ্নের ন্যাস। পরিবারের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে টানাপোড়েন সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে দেশের যে বিনির্মাণ সম্পর্ক — তার প্রতিটি গিঁট খুলে খুলে তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধের পলেস্তরা আলগা হতে হতে বেরিয়ে এসেছে জীবনের সারাৎসার ; জীবনের উচ্চমার্গীয় মহিমা, জীবনের সর্বজনীন সত্য।

'ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কাজ কর' এই নীতিতে গভীর ভাবে আস্থা স্থাপন করেছিলেন লুৎফর রহমান। তাঁর ''উচ্চজীবন'', ''উন্নত জীবন'' এবং ''মহৎ জীবন'' গ্রন্থ আলোচনার অনুষঙ্গে কোরানের পাশাপাশি গীতারও প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি ভাবতেন অন্তহীন কর্মযজ্ঞের মধ্যেই মানবজীবনের মুক্তির গূঢ়তত্ত্ব উপ্ত রয়েছে। তাই তিনি গোড়া থেকেই ছোটদের মধ্যে কাজের বীজ বপন করেছিলেন। 'যে কাজই কর না, তাতে যদি কোনরকমে তোমার মন ঢেলে দিতে পার, তা হলে আর কোন ভয় নেই।'[৮] পুনঃ পুনঃ তিনি সকল শ্রেণীর কাজকেই মহৎ কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল শুধু প্রতিভা থাকলে চলবে না, তাকে উস্‌কে দিতে হবে নিরন্তর শ্রম দ্বারা। তবেই জ্ঞানবৃক্ষ এই পৃথিবীতে ফুলে-ফলে বিকশিত হবে। 'যে জাতি সময়ের মর্যাদা জানে, কাজের মূল্য বোঝে ; যারা পরিশ্রম করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তাদের ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল।'[৯] তৎকালীন পিছিয়ে-পড়া বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়কে সব অজ্ঞতা ত্যাগ করে কেবল সময়-কাজ-পরিশ্রম এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলেছেন তিনি।

'প্রবন্ধ রচনার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা মুক্তি পেয়েছে। ভাষার ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতায় প্রকাশের কৌশল ও চিন্তার মৌলিকতায় তাঁর প্রবন্ধাবলী বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।'[১০] একটি জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করলেই বোঝা যায় সেই জাতি কতটা উন্নত। জাতির উন্নতির জন্য তাই সাহিত্যচর্চাকেই তাঁর জীবনের প্রধান কাজ বলে ভেবেছিলেন। সম্ভবত লুৎফর রহমানই বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে

প্রথম চলিত ভাষার লেখক। তাঁর বক্তব্য সর্বদাই ঊণকথনে বিবৃত, ভাষারীতি আঁটো, কিন্তু সহজ, সরল আটপৌরে। তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ তাঁর ভাষার অন্যতম কারুকার্য। শ্লেষ কটাক্ষ রয়েছে তবু প্রাঞ্জলতা অন্যতম দাবীদার। ভাবনায় গভীরতা থাকলেও তা কখনই পাণ্ডিত্যে প্রকাশিত হয়নি। শব্দ নির্বাচনও অসাধারণ। ''Smiles এর নীতি-উপদেশপূর্ণ লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার কিছু মিল আছে, কিন্তু তাঁব লেখায় জীবনবোধ আরও তীক্ষ্ণ, সেজন্য সাহিত্যিক সম্পদ Smiles-এর চাইতে বেশি।''[১১] এই উক্তির মধ্য দিয়ে লুৎফর রহমানের সাহিত্যিক মূল্যায়ন আংশিক হয় বটে ; কিন্তু অনেকাংশই বাকী থেকে যায়। 'সাহিত্য — চিন্তা, জ্ঞান ও দৃষ্টি দান করে। চিন্তা, জ্ঞান ও দৃষ্টি ছাড়া শুধু বিশ্বাসে কোন জাতি বাঁচিতে পারে না।'[১২] সাহিত্য সম্পর্কে লুৎফর রহমানের এই ধারণায় 'সাহিত্যের সংজ্ঞা'র সিংহভাগই বলে দেওয়া হয় বলেই মনে হয়। তাঁর মুখ ও মন এবং জীবন ও কর্মের মধ্যে যে কোন হেরফের নেই, এটা বুঝতেও অসুবিধা হয় না।

এখনও বাংলাদেশে শতকরা ৮৫ জন মানুষ গ্রামে বাস করে, যার অধিকাংশই কৃষক ও মজুর। তাই লুৎফর রহমান এ শতাব্দীর গোড়াতেই গ্রামোন্নয়নের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি শেষ জীবনে কলকাতায় বাস করলেও তাঁর প্রাণ পড়েছিল গ্রামেই। গ্রামেরই সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। 'জাতিকে বড় করতে হলে পল্লীর মানুষকে প্রথম জাগাতে হবে।'[১৩] বাংলাদেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মফস্বল শহরগুলোতে যে 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী' গুচ্ছ গড়ে উঠেছে তার চিন্তার প্রথম বীজ ছড়িয়েছিলেন তিনি। ইউরোপে গ্রামে বাস করেও যে নাগরিক সুবিধা ভোগ করা সম্ভব তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। গ্রাম ভেঙে শহর উঠছে, আসছে নাগরিক সভ্যতা। কিন্তু পল্লীর অর্থনীতি ভেঙে তলাহীন পাত্রে পরিণত হচ্ছে। 'ব্যবধানে-ব্যবধানে' আজ আমরা গ্রামের মানুষ শহরে এসে 'ঝামাপাথর ঘষা সাহেব' হয়ে যাচ্ছি। লুৎফর রহমান নামের আলোচ্য ব্যক্তিটি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রামে বসেই যে নাগরিক স্বাধীনতা পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার কতটুকু আমরা সফল করতে পেরেছি ? এই ব্যর্থতা কাদের ? আমরা সবাই আজ অতি বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বারা আক্রান্ত। তাই নতুন করে লুৎফর রহমানের চিন্তায় দীক্ষিত হওয়া জরুরি।

নারীকে ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীন স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি

সমসাময়িক ইউরোপীয় চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মানুষের প্রতি মানুষের এবং নারীর প্রতি পুরুষের ও সমাজের অপ্রেমের স্ফটিকশীলার ন্যায় স্বচ্ছ দৃষ্টান্ত বেগম রোকেয়া রচিত "অবরোধবাসিনী", "মতিচূর" এবং "সুলতানার স্বপ্ন" নামক গ্রন্থাবলী। অথচ লুৎফর রহমান নারীবাদী লেখক না হয়েও বাঙালি মুসলমান নারীদের নিয়ে গভীর ও ব্যাপকভাবে চিন্তাকে প্রোথিত করেছিলেন।

'আমার কথা নারী ইচ্ছা করলে পুরুষদের ন্যায় নিজের জীবনকে মূল্যবান ও শ্রদ্ধেয় করে তুলতে পারে।'[১৪] নারী ও পুরুষ আলাদা ব্যক্তি হয়েও যে মানুষ হিসেবে তারা একই সমান্তরালে অবস্থান করতে পারেন — এই কথাই লেখক বলতে চেয়েছেন। 'যে দেশে নারীর কিছুমাত্র সম্মান নাই, যেখানে সে হাসলে মানুষ তাকে চরিত্রহীন বলে সন্দেহ করে, সেখানে তার কর্মশক্তি, তার মনুষ্যত্ব, তার বিবেক ও ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হবে কেমন করে ?'[১৫] নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার এই প্রয়াস তাঁর সময়ে সহজসাধ্য ছিল না। লুৎফর রহমান পুরুষের স্বভাব ও ব্যবহার সম্পর্কে বলেছেন, 'পুরুষেরা যদি নিজেদের স্বভাব ও ব্যবহারগুলিকে সুন্দর না করেন তা হলে শুধু নারীকে ভাল হবার জন্য যতই কথা বলা হোক না কেন, কোন কাজ হবে না।'[১৬]

নারীস্বাধীনতার প্রতি ছিল লুৎফর রহমানের গভীর আস্থা। 'নারী স্বাধীনতার অর্থ নারীশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, তাকে শিক্ষিত করা, তার হাত-পা ও মুখের ব্যবহার করতে দেওয়া।'[১৭] 'নারীতীর্থ' এবং 'নারী শিল্প-শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠান খুলে তিনি পতিতা ও সমাজচ্যুত নারীদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছিলেন — যার সভানেত্রী ছিলেন বেগম রোকেয়া। এছাড়া 'নারীশক্তি' নামে একটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করতেন।

'তাঁর প্রবন্ধগুলিতে লুৎফর রহমান বিজ্ঞানসম্মত এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৮] তাঁর রচনায় পুনঃ পুনঃ ধর্মের অনুষঙ্গ এসেছে তা কেবল ধর্ম সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতাকে, কূপমণ্ডুকতাকে, কুসংস্কারকে আমূল উৎপাটন করার জন্য। তিনি বারবার ধর্মের উন্মাদনা দ্বারা আক্রান্ত হতে সাবধান করেছেন এবং কারণে-অকারণে বাঙালি মুসলমানদের কেবলামুখী হতে সতর্ক করেছেন। 'আল্লাহর কাজের অর্থ শুধু মসজিদ তোলা, কোরান পড়ান এবং কাবা শরীফে যাওয়া নয়।''[১৯] মানুষকে ভালবাসা, মানুষের সেবা করার মধ্যেই তিনি পরমপিতাকে খুঁজতে চেয়েছেন। 'ধর্ম মন্দিরের কথা ভাববার আগে আমাদের জ্ঞানপ্রচারের কথা ভাবতে হবে।'[২০] এখানে লুৎফর রহমান সক্রেটিসীয় চিন্তার অভিঘাতে অনুরণিত হয়েছেন। লেখক তাই ধর্মের

আগে জ্ঞানচর্চা এবং তাঁর বিকাশের পথ সুপ্রশস্ত করার জন্য স্বসম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন।

গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের পর ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর সম্ভবত বাঙালি জাতি আবার রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা অর্জন করে। ১৯৭৫-এর ১৫ই অগাস্ট শেখ মুজিবর রহমানের সপরিবারে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর সংবিধানের অন্যতম চেতনা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' উল্টে যায়। ধর্মই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক পাঁয়তারার অন্যতম হাতিয়ার। কোন অছিলা পেলেই ধর্মের জিগির ওঠে বাংলাদেশে। এই জিগির একটা জাতিকে মারাত্মকভাবে ধ্বংস পর্যন্ত করে দিতে পারে। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ বিদায় হজ্জ ভাষণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছিলেন, 'ধর্মের জন্য বাড়াবাড়ি করিও না, নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিও, কিন্তু বলপূর্বক তোমার ধর্ম অপর ধর্মাবলীর উপর চাপাইবার চেষ্টা করিও না। ধর্মপ্রচারের অন্যায় উন্মাদনা দুনিয়ায় বহু রক্তপাতের ও বহু সভ্যজাতির ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।'[১১] ধর্মকেন্দ্রিক মানুষ নয়, মানুষকেন্দ্রিক ধর্মই তাই লুৎফর রহমানের ভাবনার মূলস্রোতে স্থান পেয়েছিল।

১৯৭৫-৯০ এই পনের বছর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা জট পাকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু '৯০-এ যখন গণতান্ত্রিক সরকার এল তখন আশা জাগল — এবার বুঝি রাজনৈতিক সঙ্কটের অবসান হবে। তা কিন্তু হয়নি — তার দৃষ্টান্ত গত পাঁচ বছর বিরোধীদলের জোটবদ্ধ আন্দোলন এবং এ'বছর নির্বাচন নামের প্রহসন। এছাড়াও বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট জেগেছে। প্রশ্ন উঠছে — তারা বাঙালি না বাংলাদেশি ? মনে হয়, বাংলাদেশে নতুন করে লুৎফর রহমান চর্চার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কেননা লুৎফর রহমানের আত্মপ্রত্যয়ের মাঝেই হয়তো আমরা পেয়ে যাবো গুরুতর সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি।

সূত্রনির্দেশ

১. গাঁটছড়া শব্দবলয়টি প্রবন্ধের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত। বর্তমান লেখকের 'গাঁটছড়া গাঁট ছাড়া' নামক গাঁটছড়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে।
২. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', কলকাতা-১৯৫৬ ; পৃ. ১৯৪
৩. ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'লুৎফর রহমান রচনাবলী' ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩

৪. দুই শতাব্দীর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা : আব্দুর রউফ, 'পশ্চিমবঙ্গ' নববর্ষ সংখ্যা।। ১৪০১, কলকাতা, পৃ. ১০৬
৫. ড. আনিসুজ্জামান : 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ. ৫৬০
৬. 'রচনাবলী ১ম খণ্ড', ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫
৭. উক্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে সালেহা খাতুন সংকলিত ও সম্পাদিত 'উচ্চজীবন' (পৃ. ৬৬)গ্রন্থে। বাংলা একাডেমী সংস্করণ (১৯৬২) দ্রষ্টব্য। এবাদত হোসেন লিখিত, 'সাহিত্য-সাধক পরিচিতি গ্রন্থমালা ১০' 'ডাঃ লুৎফর রহমান' শীর্ষক নিবন্ধেও উক্তিটি উদ্ধৃত (পৃ. ৩৯) আছে। অবশ্য তার উৎস সালেহা খাতুনই মনে হয়।
৮. রচনাবলী ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২
৯. ঐ, পৃ. ৯৪
১০. ড আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', ঢাকা-১৯৬৪, পৃ. ৪২৭-২৮
১১. কাজী আবদুল ওদুদ, 'বাংলার জাগরণ', কলকাতা-১৯৫৬ ; পৃ. ১৯৪
১২. বাংলা সাহিত্য, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩১৬
১৩. ' ... রচনাবলী ১ম খণ্ড', ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৮
১৪. ঐ, পৃ. ৫
১৫. ঐ, পৃ. ৭৬
১৬. ঐ, পৃ. ৯১
১৭. ঐ, পৃ. ৮১
১৮. ড. অমলেন্দু দে, আধুনিক ভারতে ইসলাম, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৭০-৭১
১৯. '... রচনাবলী ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১২৩
২০. ঐ, পৃ. ১১১
২১. বাংলা সাহিত্য, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১৫৭ ;

। পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে তরুণ গবেষক পঠিত লুৎফর রহমান-বিষয়ক ভাষণ ।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর প্রাসঙ্গিকতা

অনসূয়া বসু রায়চৌধুরী

বাঙালী মুসলিম নারীমুক্তির অগ্রদূত হিসাবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলার নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। দেশের ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার অভিপ্রায়ে তিনি নারীসচেতনতা ও নারী স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে প্রথমেই চাই নারীস্বাধীনতা, তা দূরদৃষ্টিসম্পন্না বোকেয়া বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দেশের স্বাধীনতা চাইবার আগে তিনি চেয়েছিলেন স্বদেশের নারী সমাজের স্বাধীনতা। সমাজে নারী মর্যাদা ও নারীর মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি তাই শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন।

রোকেয়া রচিত প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাসে নারীসচেতনতা ও নারী জাতির উন্নতি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার মনে হয়েছে আজ বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও তিনি প্রাসঙ্গিক। তাঁর চিন্তাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা, যৌক্তিকতা বিচার করতে গেলে অবশ্যই আমাদের উন্নতি প্রসঙ্গে তাঁর মতামত নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রশ্ন জাগতে পারে, সব ছেড়ে উন্নতি কেন? কারণ 'উন্নতি' শব্দটি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে, রোকেয়ার সমসাময়িক রক্ষণশীল সমাজে যেমন উন্নতির প্রয়োজন ছিল বর্তমান সমাজেও তেমন রয়েছে। হয়তো স্থান, কাল এবং মাত্রার পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

'নারীমুক্তি' ছিল রোকেয়ার সর্বক্ষণের ধ্যান ও ধারণা এবং এই নারীমুক্তির মধ্য দিয়ে সমাজের তথা জাতির উন্নতি সাধন করাই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। রোকেয়া তাঁর লেখায় বলেছেন — "আজকাল সবাই উন্নতি করছে — যেদিকে তাকাই দেখি উন্নতি আর উন্নতি।" (এখানে বলা প্রয়োজন যে, উক্ত পংক্তিটি 'উন্নতির পথে' নামক তাঁর অসমাপ্ত প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে)। কোন রোগীর চিকিৎসা করতে হলে যেমন প্রথমেই রোগের প্রকৃতি জানা আবশ্যক, তেমনি অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিষ্কার করার আগে অবনতির চিত্র আমাদেব দেখতে হবে। এখানে অবলাজাতি বলতে বলাবাহুল্য স্ত্রী জাতিকে

বোঝানো হয়েছে। তাঁর কথার সূত্র ধরে বলা যায় সমগ্র নারীজাতিই দাসত্ব নামক এক রোগের শিকার। এই ভয়ানক রোগ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মজ্জায় মজ্জায় জড়িয়ে পড়েছে। ঘুণ ধরিয়েছে আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে সমাজ ব্যবস্থা রোকেয়ার মতে বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে নারীকে প্রতিপন্ন করেছে দাসীতে। তিনি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন — পৃথিবী থেকে দাস ব্যবসা উঠে গিয়েছে শুনতে পাই কিন্তু আমাদের দাসত্ব গেছে কি? এই চিন্তাশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

বাঙালী মুসলিম সমাজে নারীস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সমাজের প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। নারী কল্যাণ কামনায় রোকেয়া আজীবন লেখিকা, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী হিসাবে নিজেকে নিবেদিত করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে রেনেসাঁস হয় সেই প্রভাব প্রতিফলিত হয় রোকেয়ার চিন্তাচেতনায় ও সমাজকর্মে। তিনিই বাঙালী মুসলমান সমাজের বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক। শৈশব ও কৈশোরের অবরুদ্ধ নারী জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত হয়েছিল নিজের সমাজের নারীদের জন্য তাঁর গভীর দরদ ও কঠোর দায়িত্ববোধ।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলস্বরূপ হিন্দু নারীদের সামাজিক অবস্থান মুসলিম নারীদের থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নত ছিল। কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অভাবে তাদের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই ছিল। পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষেরা সামাজিক বিধি-বিধান, ধর্ম, শাস্ত্র সৃষ্টি করে শাসকের স্বার্থরক্ষা ও তাদের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আরও নিরাপদ করেছে। বিবাহ নামক সমাজবন্ধন মুসলিম সমাজে সম্পূর্ণ হয় প্রধানতঃ পাত্রীর সম্মতিতে। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষ যখন তখন তালাক দিতে ও বহু বিবাহেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। ভাগ্যহীনা, অবরোধবাসিনী, অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতাবোধের সূচনার মধ্যেই নারী মুক্তির বীজ লুক্কায়িত। এখানেই রোকেয়ার মৌলিক চিন্তাশক্তির প্রকাশ যা অতীতের সমাজব্যবস্থার অবনতির কারণ সমূহের সাথে বর্তমান সময়কালের মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছে।

রোকেয়ার মতে, নারীবাদ কোন ভাবেই উগ্র দাম্ভিকতা নয়। তা সমাজের নারীর অধিকারবোধ সম্পর্কীয় সচেতনতাকে বাড়ানোর সহায়কমাত্র। সেই আত্মসচেতনাকে বাড়ানোর জন্যই তিনি রচনা করেছেন — বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্র এবং সেই কল্পনার চারণভূমি তাঁর সমসাময়িক সমাজ। তাঁর সৃষ্ট কাল্পনিক

চরিত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে জেহাদ ঘোষণা করেছে সমাজের বিরুদ্ধে, অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে। নারী ও পুরুষ এই বিরাট সমাজদেহের দুটি ভিন্ন অংশ। বহুকাল থেকেই নারী পুরুষের দ্বারা লাঞ্ছিতা এবং তারা কেবল তা নীরবে সহ্য করেই আসছে। রোকেয়া ভাঙন ধরাতে চেয়েছেন সেই চিরাচরিত সমাজব্যবস্থায়। জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন অবলানারী জাতির অন্তঃশক্তিকে। তাঁর এই নবজাগরণের ঢেউ আঘাত হেনেছে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সকল মানুষ নির্বিশেষে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায়।

স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি বলতে তিনি কোন বিষয়ে শিক্ষায় অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা ও মূর্খতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। নির্বোধ স্ত্রীলোকের স্মর্তব্য এই যে, তারা প্রত্যেকে নিজেকে অবিশ্বাস করে স্বামীর আদেশ পালন করে। এই অবহেলিত, মেরুদণ্ডহীন নারীজাতির আত্মবিশ্বাসকে জাগাতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতে আদিমকালের ইতিহাস কেউই জানে না। তবু মনে হয় যে, পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না তখন অবস্থা এমন ছিল না। কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ মানবজাতির একাংশ (নর) উন্নতি করতে লাগল, অপরাংশ (নারী) তার সঙ্গে সঙ্গে সেইরকম উন্নতি করতে পারল না। তাই পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিনী না হয়ে দাসী হয়ে পড়ল। বেগম রোকেয়ার মতে সেই দাসত্বের শিকল ছিঁড়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হবার প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার হলো 'শিক্ষা।'

সে যুগেও রোকেয়া ঠিকই বুঝেছিলেন নারীর মুক্তি নারীকে নিজেকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্জন করতে হবে। আর তার জন্য চাই শিক্ষা। এখানে শিক্ষা মানে কেবল ধর্ম পালন, স্বামী ও গুরুজন সেবা, সন্তান প্রতিপালন কিম্বা সংসার পরিচালনার জ্ঞান নয় — সত্যিকার 'জীবন উদ্বোধক শিক্ষা।' "শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নয়। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ক্ষমতাকে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। এই গুণের সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য।"

রোকেয়া বলেছেন, স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের মতো উন্নত অবস্থাকে বুঝতে হবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য প্রকৃত শিক্ষা দরকার। যদি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করলে স্বাধীনতা লাভ হয় তবে তাই করতে হবে। কারণ স্বাধীনতার প্রথম অর্থ হলো অর্থনৈতিক মুক্তি। যে সমাজে স্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল সেখানে নারী স্বাধীনতার বক্তব্য অর্থহীন। আমরা বর্তমান প্রজন্মের মানুষ হয়েও আজও তাঁর এই মতের

প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করি কি করে? আজকের যুগেও 'উন্নতি' কথাটি বহুভাবে ব্যবহৃত। রোকেয়ার সময়কাল থেকে এখনকার সমাজ হয়তো অনেকটাই উন্নত কিন্তু প্রকৃতশিক্ষার প্রসার কি সত্যি ঘটেছে আমাদের স্বাধীন ভারতে? বিংশ শতাব্দীর শেষে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের প্রাধান্য। কিন্তু রোকেয়া তো আজকের মানুষ নন, তাঁকে সনাতনপন্থী, রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকেই মত প্রকাশ করতে হয়েছিল যা দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। নারী-শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে বিদ্যালয় ও 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' নামক সমিতি গঠন করেন।

রোকেয়া যে সময়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সময়ের তুলনায় তাঁর সমাজচিন্তা অনেক এগিয়ে ছিল। বিশেষ করে রক্ষণশীল সমাজের পটভূমিতে। তাঁর বক্তব্যে বর্তমানের চলতি নারীবাদী আন্দোলনের মতো কোন উগ্রতা লক্ষ্য করা যায় না। বরং তিনি মনে করতেন পুরুষ ও নারী একে অন্যের পরিপূরক। পাশ্চাত্যের অনুকরণের কথা না ভেবে নিজের দেশ ও সমাজের ভাবনা তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। নিজের সমাজ ও দেশের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে ও নারী জাতির উন্নতিকল্পে তাই তিনি অন্যত্র সমাধানসূত্র না খুঁজে নিজের সমাজের মধ্যেই তা খোঁজার চেষ্টা করেন। এখানেই তাঁর মহত্ব, এখানেই তাঁর লড়াই-এর বিশিষ্টতা।

[পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে পঠিত তরুণ গবেষকের রোকেয়া-চিন্তা

নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

একরাম আলি

মুক্তির জন্য, জীবনের আর জীবিকার সম-অধিকারের জন্য, প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার-বেষ্টনী ভেঙে পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি ও তার প্রভাব-জাল ছিন্ন করার জন্য আজও দেশে দেশে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে মেয়েদের। এবং, এই সূত্রে বিদেশের সিমোঁ দ্য বোভোয়া, কেইট মিলেট, মেরি এলম্যান, জুলিয়েট মিচেল, সাঁতাল সোয়াফের নাম নানা সূত্রে যেমন মনে পড়ে আমাদের, তেমনই রিগোবার্তা মাঞ্চুর কঠোর সংগ্রামের কথাও অনেকে আমরা জেনেছি। 'নারীমুক্তি' শব্দবন্ধটি চর্চিত হতে হতে অনেকের কাছেই রীতিমত একঘেয়ে হয়ে এল। তবু, মেয়েদের হাতে আর পায়ে দাসত্বশৃঙ্খলের কলঙ্ক হিসেবে আজও ব্যবহার হয়ে আসছে স্বর্ণালঙ্কারের — চুড়ির, ধ্বনিময় মলের !

যুগে যুগে শোষিত নারী যত বিদ্রোহ করে. শোষক পুরুষ ততই ধুরন্ধর হয়। শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে। এমনকী, সে নারীমুক্তিরও পক্ষে চলে যায়। অর্থাৎ নারীর হয়ে আর নারীর বিরুদ্ধে একাই যুগ্মরূপে লড়াইয়ের দখল নেয়। হতভাগ্য নারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধ উপভোগ করে। এক সময় ঘোর কেটে গেলে শোষিতকে এই নতুন শোষণ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে নিজস্ব লড়াই শুরু করতে হয়। পুরুষশাসিত এই সমাজে তাই মাঝে মাঝেই নারী-জাগরণের তরঙ্গ ওঠে। কখনও যৌথভাবে, কখনও এককভাবে।

তেমনই একজন সৈনিক ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। আজ থেকে ১৬১ বছর আগে জন্মেছিলেন এই তেজস্বিনী মহিলা। বাঙালি যে আত্মবিস্মৃত জাতি — সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তি অভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য আমরা তাঁকে মনে রাখিনি শুধু নয়, তাঁর প্রাপ্য সম্মানও তাঁকে আমরা দিইনি। হতভাগ্য যে দেশে আজও নিরক্ষরতা একটি জ্বলন্ত সমস্যা, সে দেশে সোয়াশো বছর আগে অজ পাড়াগাঁয়ের এক মহিলার কীর্তিকে — হোন না তিনি নারীশিক্ষার অগ্রনায়িকা — কে মনে রাখবে ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন চতুর্দশ বর্ষীয় কিশোর, মধুসূদন দত্ত ১০ বছরের

বালক মাত্র, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মাবেন তারও ৪ বছর পরে, সেই ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলার (তৎকালীন ত্রিপুরা জেলা) লাকসামের অদূরে পশ্চিমগাঁয়ে জন্মেছিলেন আমাদের আজকের আলোচ্য নারী।

কেন তিনি হঠাৎ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলেন ? এর উত্তর আমরা পাব নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে। জাতির দুর্দিনে অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন তেমনই আছে, যেমন আছে বর্তমানকে চিনে নেওয়ার প্রয়োজন। এবং, কে না জানে, আমরা এক অন্ধ এবং ঘোর লাগা সময়ের গোলকধাঁধায় আজ জড়িয়ে গেছি। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী যে যুগে আর পরিবেশে জন্মেছিলেন, সেই যুগটিকে আমরা বাংলার নবজাগরণের যুগ বলে চিহ্নিত করি। প্রকৃতপক্ষে তখন ছিল ঘোর অন্ধকার যুগ। সেই অন্ধকারকে ছিন্ন করার প্রবল বাসনা জেগেছিল সেই যুগের মানুষের সর্বসত্তায়। বাংলার তথা ভারতের মাথার ওপর তখন রামমোহন রায়। সারি সারি উঠে আসছেন বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারিচাঁদ মিত্র। আর, এসবের থেকে দূরে, পূর্ববাংলার এক অজ পাড়াগাঁয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন শিশু ফয়জুন্নেসা।

তিনি তাঁর ৪২ বছর বয়সে 'রূপজালাল' (১৮৭৬) গ্রন্থে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে — 'এই আধুনিক লেখিকার স্বীয় বংশতত্ত্ব ও যে জন্য এই পুস্তক রচিত হইল তৎসমুদয় ব্যক্ত করিতে গেলে দ্বিতীয় এক গ্রন্থ হওয়ার সম্ভাবনা। ... সম্রাট সাহা আলম যে দীল্লির সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার স্বগণমধ্যে কোবশবংশীয় আগণ খাঁ আমির উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অতি বিক্রমশালী ও ভূপতির নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র ছিলেন, সর্ব্বদা নির্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সচকিতমতে ও সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন।... হঠাৎ বঙ্গীয় প্রজেশদিগের পরস্পর স্বাধীনতাতত্ত্ব শ্রবণে তদ্বারণার্থ লক্ষ পদাতিক সমভিব্যাহারে বঙ্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় অধিক দিন বিলম্ব হইবে বিবেচনায়, স্ত্রী ও পুত্রকে আনিয়াছিলেন।' এইভাবে ফয়জুন্নেসা জানাচ্ছেন যে, আমির আগণ খাঁর পুত্র ভুরু (আব্রু) খাঁ আর এ দেশ ত্যাগ করেননি। বাদশা শাহ আলম আমিরপুত্রকে ত্রিপুরা জেলার হোসনাবাদ সহ কয়েকটি 'প্রদেশ' দান করেন। এই আমির আগণ (রাজমালায় 'আগোয়ান') খাঁর ষষ্ঠ বংশধর আহমদ আলি চৌধুরির জ্যেষ্ঠ কন্যা নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। মায়ের নাম আরফান্নেসা চৌধুরানী। ফয়জুন্নেসার জন্মের সময় পরিবারটি ছিল অভিজাত ও ধনী। ১৪টি মৌজা নিয়ে বেশ বড়সড় একটা জমিদারি ছিল তাঁদের।

শৈশবে পিতৃবিয়োগ, সপত্নীর কারণে দাম্পত্যে অসুখী ও পরে বিচ্ছেদ ইত্যাদি কারণে ফয়জুন্নেসার জীবন খুব সুখের ছিল না। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয় তাঁকে এবং পিতার অবর্তমানে এক বিশাল জমিদারির যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়। কোনও প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা তাঁর হয়নি। বালিকা বয়সে জনৈক তাজউদ্দিন নামে এক শিক্ষক তাঁকে বাড়িতে পড়িয়ে যেতেন। অনুমান করা হয়, ফয়জুন্নেসার প্রকৃত পড়াশোনার শুরু বাপেরবাড়ি ফিরে আসার পর। তখন তিনি দুই কন্যা-সন্তানের মা। সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করে নিজের বাড়িতে টোল খুলেছিলেন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শহর থেকে বহুদূরে এক বিচ্ছিন্ন গাঁয়ে অন্তঃপুরবাসিনী মুসলমান মহিলার পক্ষে এটা যে কত বড় বিদ্রোহ, তা আমরা এই সাম্প্রদায়িকতা-দোষে-দুষ্ট সময়কে অতিক্রম করতে করতে খানিকটা বুঝতে পারব আশা করি। তিনি কতটা সংস্কৃত শিখেছিলেন, আমরা জানতে পারছি না। তবে এই সূত্রে পাঠককে তাঁর বাংলা গদ্য পড়ে দেখতে বলি। গদ্যে ও পদ্যে রচিত আখ্যানকাব্য 'রূপজালাল'-এর একটি অধ্যায় শুরু হচ্ছে এইভাবে — 'দৈত্যেশ্বর কহিলেন, আমি যে আকিঞ্চনে তোমাকে আহ্বান করিয়াছি তাহা পশ্চাৎ বলিতেছি, অগ্রে তুমি সে মনস্কামনা পূর্ণ করিবে বলিয়া আমার করস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা কর। তাহা হইলে আমি বিশ্বস্ত হইতে পারি, কেননা আমি বয়সে তোমার পিতার প্রতিম। এই বাক্য শ্রবণে নৃপনন্দন কহিলেন, 'হে দৈত্যরাজ! আমি মানবতনয় হইয়া আপনার কি উপকার করিতে পারিব? বরং আপনি অনুগ্রহ করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে আমি স্বরাজ্যে উপনীত হইয়া, অথবা প্রিয়াসমাগত হইয়া, সফলাশ হইতে পারিব। যদি প্রভুর ইচ্ছায় আমাদ্বারা আপনার কোন কর্ম্ম সম্পাদিত হইতে পারে, তাহাতে আমি সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিব না। আপনিও স্বীকার করুন, যাহাতে সেই মনোহারিণী প্রিয়তমার বাসস্থানে উপস্থিত হইতে পারি তাহা করিবেন, অথবা তাহার আবাসসন্নিহিত উপবনে উদ্যানপালিকা যে এক বৃদ্ধা রমণী বাস করে, আপনার এক বিশ্বস্ত কিংকর দ্বারা আমাকে তথায় পাঠাইয়া দিবেন।'

'রূপজালাল' গ্রন্থের পাতায় পাতায় এই গদ্য। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় সুকুমার সেন জানাচ্ছেন, কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে। হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এই গ্রন্থটিই বাঙালি মহিলা লিখিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তারপর কৈলাসবাসিনী দেবীর 'বিশ্বশোভা' (১৮৬৯) ও অন্নদাসুন্দরী দেবীর 'অবলাবিলাপ' (১৮৭২)। আর, তারপরই চতুর্থ গ্রন্থ 'রূপজালাল' মুদ্রিত হয় ১৮৭৬-এ। উপরোক্ত তিনজনেরই

বাসভূমি ছিল কলকাতা। তৎকালীন কলকাতার নবজাগ্রত হাওয়ায় তাঁরা লালিত। অথচ দূর গ্রামে ফয়জুন্নেসার লড়াই ছিল একাকীর। এবং ফয়জুন্নেসার মত তেজস্বী গদ্য উপরোক্ত ৩ মহিলার কেউই লিখে যাননি। তাই, ফয়জুন্নেসার কৃতিত্বকে, সামান্য হলেও, তুলনায় আমরা বড় করে দেখতে পারি।

'রূপজালাল' ছাড়াও ঢাকার 'বাংলা প্রেস' থেকে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত'। 'সঙ্গীতসার' ও 'সঙ্গীতলহরী' নামে আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন ; কিন্তু সে দুটি এখন দুষ্প্রাপ্য। তা হলে, মোট চারটি গ্রন্থের রচয়িত্রী বলেই কি আজ তিনি আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছেন ? *

ফয়জুন্নেসার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের এক বছর আগে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১২৮১, ৫ মাঘ) 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা জানাচ্ছে, 'অদ্য আমরা আমাদিগের পূর্ব বাংলার একটি মুসলমান মহিলারত্নের পরিচয় দান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ... ইনি যেমন বিদ্যানুরাগিণী ও বিষয়কার্য্য পারদর্শিনী সেইরূপ সৎকার্য্যেও সমুৎসাহিনী। বাহিরে ইঁহার আত্মপর মাত্র নাই।... শুনিলাম ইঁহার আবাসস্থানে সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকেন, এখানেও (ঢাকা) সেইরূপ বিনাড়ম্বরে নিরুপায় দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছেন।'

যখন পালকি চড়ে, পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জমিদারি পরিদর্শনে যেতেন, তখন দেশ সবে সিপাহী-বিদ্রোহ পেরিয়ে এসেছে। মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডল তখনও বাংলার মাটিতে চেপে বসে আছে। অথচ, তিনি দেখছেন নারী-পুরুষের মিলিতভাবে তৈরি অন্য এক বাংলার স্বপ্ন। ধর্মীয় পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হয়েও কীভাবে নিজেকে এরকম করে তৈরি করলেন তিনি ?

নিজের শিশু বয়সের বর্ণনা ফয়জুন্নেসা দিয়েছেন এইভাবে — 'আমি বাল্যাবস্থায় বয়স্যাদিগের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে নিমগ্না থাকিয়াও যথাসময়ে শিক্ষক সন্নিধানে অধ্যয়নাদি সম্পন্ন করিতাম ; জনক-জননীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম সুতরাং বাঞ্ছিত বিষয় সম্পন্নের কোনও ত্রুটি ছিল না।'

কিন্তু, মানুষ তো শুধুমাত্র মস্তিস্কনির্ভর নয়। রক্তে-মাংসে তৈরিও। বিশেষ করে ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর রূপ ছিল চোখে পড়ার মত। তাঁকে অনেকেই তৎকালীন রামচন্দ্র বসাকের বাল্যশিক্ষায় মুদ্রিত মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছবির

* এখন অবশ্য বিতর্ক উঠেছে যে, 'সঙ্গীতসার' এবং 'সঙ্গীতলহরী' গ্রন্থ দুটি তার রচনা নয়। — লেখক

সঙ্গে তুলনা করেছেন। এবং এই রূপই প্রতিভাময়ী রমণীর ব্যক্তি-জীবনে পরবর্তীকালে এনেছে সর্বনাশ।

তখন ফয়জুন্নেসা অভিজাত মুসলিম পরিবারের পর্দানশীন এক বালিকা মাত্র। বাড়ির প্রথা অনুযায়ী পরিবারের বাইরের কোনও পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ছিল না। অন্দরেই ছিল খেলাধুলো, পড়াশোনার জীবন। এ সময় তাঁদের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল মাহমুদ গাজি চৌধুরী নামের তরুণ জমিদারপুত্রের। দূর সম্পর্কের ভাগ্নে মাহমুদ গাজিকে ফয়জুন্নেসার বাবা খুব স্নেহ করতেন। কেন না মাহমুদ ছিলেন বাবা-মা-হারা সন্তান। হঠাৎ একদিন বাড়ির মধ্যে ফয়জুন্নেসার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মাহমুদ গাজির। এবং ফয়জুন্নেসার রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়েন তিনি। এতটাই ছিল সেই মুগ্ধতা যে, শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন ফয়জুন্নেসার বাবা-মার কাছে। তাঁর মনে তখন সর্বদা ফয়জুন্নেসার মুখচ্ছবি। কিন্তু, নাবালিকা বলে ফয়জুন্নেসার মা সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় মাহমুদ একেবারে ভেঙে পড়েন। বিষয়কাজে তাঁর চূড়ান্ত অনাসক্তি দেখা দেয়। আত্মীয়রা বাধ্য হয়ে মাহমুদের বিয়ে দেন অন্যত্র। কিন্তু বিবাহের পরেও ফয়জুন্নেসাকে ভুলতে পারেননি মাহমুদ। সর্বদা পীড়িত হতেন ফয়জুন্নেসাকে না-পাবার বেদনায়। ইতিমধ্যে ফয়জুন্নেসার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। ফয়জুন্নেসাও বিবাহযোগ্যা হয়েছেন। নানা জায়গা থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাবও আসতে শুরু করেছে। মাহমুদ তখন শেষ চেষ্টা হিসেবে আবার বিয়ের প্রস্তাব পাঠান ফয়জুন্নেসার মায়ের কাছে। পাঠক, আসুন, এই সময়কার বর্ণনা আমরা স্বয়ং ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর কাছ থেকেই শুনি। ফয়জুন্নেসা লিখছেন, 'ঐ নরেশতনয় আমার পাণিগ্রহণাভিলাষে জননীকে অনেক স্তুতি করিলেন। এবং অমাত্যদিগকে ধনে বশীভূত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে আমার গর্ভধারিণীকে বহু প্রযত্নে সম্মত করাইলেন। ... স্বচক্ষে সপত্নী দেখিয়াও জননী আমাকে সলিলে ভাসাইলেন।'

এবং, এইভাবে তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল। বিয়ের পর কয়েকবছর এই দম্পতির জীবন সুখেরই ছিল। দ্বিতীয় স্ত্রী ফয়জুন্নেসার প্রতি মাহমুদের অনুরাগ ছিল প্রবল। পরে, ফয়জুন্নেসা নিজেই লিখেছেন, 'পতি আমাকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিতে লাগিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না।' ফয়জুন্নেসার দুটি কন্যা-সন্তানও হল। তাঁর সপত্নী নিঃসন্তান ছিলেন বলে একটি মেয়ে দেওয়া হল তাঁকে। এবং, ফয়জুন্নেসার কথা অনুযায়ী, এই সময় তাঁর সপত্নী নানান কৌশলে স্বামীকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা

করেন। সফলও হন। আর ফয়জুন্নেসার দুঃখের দিন শুরু হয়। নিজেকে চরম অবহেলিত, অপমানিত বলে মনে করতে শুরু করেন তিনি। ফয়জুন্নেসা লিখছেন, 'হায় ! কুহকের কি আশ্চর্য প্রভাব। যাহার ক্ষণ-অদর্শনে দেহ জীবনশূন্য বলিয়া বোধ হয়, তাহারই চিরবিচ্ছেদ অভিলাষ জন্মে।'

স্বামী মাহমুদ গাজি চৌধুরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হলে তিনি শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেন ও পশ্চিমগাঁয়ে মায়ের কাছে চলে আসেন। কিন্তু, পিতৃবিয়োগ থেকে শুরু করে দাম্পত্যজীবনের ছেদ পর্যন্ত সময়টুকু সারাজীবন তাঁকে তাড়িত করে। সমস্ত কিছু ভুলে নতুন জীবন শুরুর চেষ্টা করেন ফয়জুন্নেসা। ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই বিচক্ষণতায়, কর্মদক্ষতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হন এবং জমিদারির যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর ওপরই বর্তায়। এক কঠোর সুনিয়ন্ত্রিত জগতে ঢুকে পড়েন তিনি। প্রতিদিন শেষরাতে ঘুম থেকে উঠতেন। ভোরের নামাজ শেষে কোরানপাঠ করতেন প্রতিদিনই। এবং এটা চলত বেলা ৮টা পর্যন্ত। তারপর সকালের খাবার খেয়ে বসতেন জমিদারির দপ্তরে। একটি মোড়ায় বসে পরদার আড়াল থেকে এক এক করে ডাকতেন আমলাদের। প্রথমেই মুসাফিরখানার খবর নিতেন ; তারপর শুরু হত জমিদারির কাজ। ১১টা পর্যন্ত কাজ করে অন্দরের দিকে যেতেন। সেখানে মস্ত উঠোন। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা পুকুর, বাগান। স্নানের সময় নিয়মিত সাঁতার কাটতেন সেই পুকুরে। স্নান-খাওয়া-জোহরের নামাজ শেষে আবার বসতেন জমিদারির কাজে। বিকেলে আসরের নামাজের সময় কাজ থেকে উঠতেন। ব্যস্! তারপর শুরু হত অন্য জীবন। নিজের যত্নে. পরিশ্রমে বাড়িতে তৈরি করেছিলেন এক লাইব্রেরি। আসরের নামাজের পর ঢুকে পড়তেন সেই লাইব্রেরিতে, পড়াশোনার কাজে। এবং রাতে ঘুমোতে যাবার আগে পর্যন্ত নামাজ, টুকিটাকি পারিবারিক কাজ ব্যতীত বাকি সময়টা তাঁর কাটত লাইব্রেরির মধ্যেই! এই স্থানটিই ছিল তাঁর একার, একাকী নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রূপজালাল' পড়লে এই ছবি স্পষ্ট দেখা যায়। অনেকে মনে করেন, 'রূপজালাল' গ্রন্থটি পরোক্ষে ফয়জুন্নেসারই আত্মজীবনী। এখানে রূপবানু ও জালালের প্রেমাখ্যান যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সপত্নী হুরবানুর আগমন যেভাবে ঘটেছে, সেগুলির অংশে অংশে কবি স্বয়ং নিজের অতীত জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন যেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, 'গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য' অধ্যায়ে ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী কোনও রকম সঙ্কোচ না করে তাঁর বিবাহ ও বিবাহ-পরবর্তী বিচ্ছেদের কথা বলেছেন। শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এ রকম —' হে পাঠকগণ ! আমার এই ঘোর দুঃখের কাহিনী শ্রবণে, বোধকরি আপনাদের অন্তঃকরণও আর্দ্র হইবে।

যাঁহার চিত্তে এই মনঃপীড়া জন্মিয়াছে, তিনি যে খেদান্বিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বরং সময়ে ২ চক্ষুবারিও নিক্ষেপ করা সম্ভব। এই ক্ষণ পদ্য রচনাতে পরতত্ত্ব কিঞ্চিত বলিতে ইচ্ছা করি।' গদ্যের পর পদ্যেও তিনি একই কথা বলেছেন,

'এই খেদে মন, সদা উচাটন,
ভাবি কিসে হব শান্ত।
রচিনু পয়ার, করিতে নিবার,
এ বলিনু আদি অন্ত ।।'

'বলি অন্যের কাহিনী' বলে আখ্যান শুরু করলেও স্বামীপ্রেম ও দাম্পত্যজীবনের অশান্তি, বিচ্ছেদ বর্ণনাকালে মনে হয়, এ সবই আসলে ফয়জুন্নেসার জীবনের ছায়া ! 'রূপজালাল' পড়লে বোঝা যায়, তাঁর অন্তর্জগত ছিল রোমান্সে ভরপুর। আর, এ সবই ঘটত তাঁর লাইব্রেরির সীমানাটুকুতেই। জ্ঞানচর্চা ছাড়াও লাইব্রেরির নির্জনতা তিনি উপভোগ করতেন। কেননা সেই যুগে মুক্ত-মনা এক তেজস্বিনী নারীর বেঁচে থাকার চৌহদ্দি ছিল খুবই সীমিত।

লাইব্রেরির বাইরে কিন্তু অন্য ফয়জুন্নেসা। সেখানে তিনি প্রজানুরঞ্জক জমিদার। সব সময় প্রজাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতেন। দেশ-বিদেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নয়, সবার আগে এগিয়ে গিয়ে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। আর স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য করতেন কঠোর পরিশ্রম। লাইব্রেরির বাইরে তাঁর জীবন ছিল কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা। আর, গড়িমসিতে জীবন কাটিয়ে দেওয়া সাধারণ বাঙালিজনের কাছে তাই তিনি পেতেন একটা বাড়তি সম্ভ্রম। অথচ, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর অন্তর্জগতে অতীত দাম্পত্যজীবনের একটি সরু ধারা শুকিয়ে, শুধুমাত্র খাত হয়ে বালির ওপর এঁকেবেঁকে পড়ে ছিল সারাটা জীবন।

বিষয়কাজের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। মস্ত বড় এক জমিদারির কাজ তাঁকে পরিচালনা করতে হত। অথচ নিজে জীবনযাপন করতেন অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে। ইসলাম ধর্মের যাবতীয় নির্দেশ মান্য করতেন। পরদার অন্তরালে থাকলেও হিন্দু অমাত্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। এমনকী পালকি চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন প্রজাদের সুখদুঃখ নিজের চোখে দেখতে। শিক্ষাচর্চায় ধর্মপালন কোনও বাধা হয়নি তাঁর কাছে। বা, সমস্ত বাধা অতিক্রম করার মত ওজস্বিতা তাঁর ছিল। অবসর করে নিজের লাইব্রেরিতে বসতেন পড়াশোনা নিয়ে। যত্ন করে শিখেছিলেন আরবি. ফারসি, সংস্কৃত আর বাংলা।

যখন পড়লেই নরকবাসী হওয়ার ভয় দেখানো হয় নারীকে, নানা কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকার 'সুপরামর্শ' দেওয়া হত, তখন মেয়েদের অশিক্ষা তাঁকে পীড়িত করত। তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। আর সেই শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ও ইংরেজি। এবং শিখতে হবে নারী-পুরুষ — উভয়কেই। সমানভাবে। নিজের জমিদারি এলাকার ১১টি কাছারিতে সম্পূর্ণ নিজের খরচে তিনি ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজের গ্রামে তৈরি করেন একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা, যা এখন কালক্রমে 'ফয়জুন্নেসা সরকারি ডিগ্রি কলেজ'। ১৯০১ সালে ওই গ্রামেই স্থাপন করেন একটি মধ্য ইংরেজি স্কুল। কুমিল্লা শহরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য তিনি জমিদারির আয় থেকে তাদের হস্টেলের খরচও দিতেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তখনও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের জন্ম (১৮৮০) হয়নি। আমরা যদি তাঁর অন্য স্কুল-প্রতিষ্ঠার কথা ছেড়েই দিই, তাহলেও কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয় — যা ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৯৩১-এ হাইস্কুলের স্বীকৃতি পায় — প্রতিষ্ঠার ৩৮ বছর আগে মেয়েদের জন্য ফয়জুন্নেসা কুমিল্লায় হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নারীশিক্ষার জন্য বেগম রোকেয়ার ব্যাকুল প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সর্বদা শ্রদ্ধেয়। কিন্তু, ফয়জুন্নেসার আত্মত্যাগ যে কী করে বিস্মৃত হল বাঙালি — এ এক রহস্য। আমাদের মনে রাখতে হবে, তখনকার সর্বভারতীয় মুসলমান নেতা নবাব আবদুল লতিফ ও স্যর সৈয়দ আহমদ মুসলমান ছেলেদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যখন অনুভব করছেন, তখনই ফয়জুন্নেসা মুসলমান মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ঐ একই বছরে, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আর আলিগড় কলেজ স্থাপিত হয় তারও দু'বছর পর — ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে।

কুমিল্লার বাইরে, পশ্চিমবাংলার কৃষ্ণনগরেও একটি স্কুল স্থাপন করেন ফয়জুন্নেসা। এছাড়া সুদূর মক্কাতেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা রয়েছে। পরে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লায় কলেজ স্থাপনেও তাঁর দান বেশ মোটা অঙ্কের।

এ হেন মহিলার উল্লেখ পশ্চিমবাংলার সাহিত্যের ইতিহাসের বাইরে তো দেখা যায়ই না, বাংলাদেশেও ফয়জুন্নেসা যথেষ্ট কম আলোচিত। কলকাতার ঠাকুরবাড়ির 'সখী সমিতি'র তিনি ছিলেন সদস্যা। স্বর্ণকুমারী দেবীর নারী-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানেও অর্থসাহায্য করতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে, অসামান্য গদ্য

লিখলেও ফয়জুন্নেসা কোনও প্রবন্ধ রচনা করেননি। ফলে, দেশ, জাতি, শিক্ষা, নারীর পশ্চাদবর্তিতা বিষয়ে তাঁর চিন্তার পরিচয় আমরা পাই না। তাঁর যা কিছু পরিচয় — সবই তাঁর কাজে ছড়িয়ে আছে। শুধুমাত্র 'রূপজালাল' কাব্যাংশে তিনি লিখেছেন — 'পুরুষের মন, প্রভু নিরঞ্জন,/ পাষাণে নির্ম্মাণ করে।' পরে আবার বলছেন — 'এই তত্ত্ব সার, করিয়া বিচার,/ বলে শ্রীমতী ফয়জন।/ শুন মম বাণী, ওগো চন্দ্রাননি/ পুরুষ নহে আপন।।'

কবিতায় এ রকম বিক্ষিপ্তভাবে ফয়জুন্নেসার স্বামীবিচ্ছিন্ন জীবনের ঝঞ্ঝা প্রকাশ পেয়েছে এবং, দুই কন্যাসন্তানকে নিয়ে তিনি তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ধর্মীয় বা সামাজিক — কোনও বাধাই তাঁকে থামিয়ে দিতে পারেনি।

কিন্তু, নিজের এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনকে চির-আড়ালে রেখে এই মহীয়সী রমণী তৎকালীন মেয়েদের শিক্ষার সঙ্কট নিয়েই শুধু চিন্তিত ছিলেন না, মেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি ভাবিত ছিলেন। পারিবারিক আর সামাজিক চাপে মেয়েরাই যে বেশি রুগ্ন হয়, অভুক্ত থেকে আর ঘন ঘন সন্তানধারণে যে পুরুষের তুলনায় বেশি ক্লিষ্ট হয় মেয়েদের শরীর, এ তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। লাকসামে তিনি নিজ খরচায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালনা করেন। এছাড়া ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে শুধু মেয়েদেরই চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন কুমিল্লা শহরে। যদিও মুসলমান মেয়েরা ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে, তবু তিনি পৃথকভাবে মুসলমান মহিলাদের জন্য বিশেষ কিছু করেননি। তাঁর চিন্তায় ছিল নারী — হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। মুসলমান মেয়ের জন্য তাঁর বিশেষ দান মাত্র একটি ক্ষেত্রেই — কুমিল্লা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে হস্টেলে থাকার জন্য মুসলমান ছাত্রীদের তিনি একটা বৃত্তি দিতেন। এছাড়া সমস্ত কিছুই ছিল সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মেয়েদের জন্য।

নারীশিক্ষা, নারী-স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর যেমন চিন্তা ছিল, তেমনই নানা জনহিতকর কাজেও তিনি জড়িয়ে থাকতেন। গ্রামে গ্রামে জলাশয় খনন, রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন করেছিলেন।

কিন্তু, তখন তো বিদ্যাসাগর রয়েছেন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর আগেই ফয়জুন্নেসার কীর্তিকথা বিদ্যাসাগরের শুনতে পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। অথচ, সে রকমটা যে ঘটেছিল, তার কোনও প্রমাণ আমরা পাইনি। এমনকি, স্বর্ণকুমারী দেবীর নারী-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করে আর 'সখী সমিতি'র সদস্য হয়েও কলকাতা শহরে তিনি প্রায় অনালোচিতই ছিলেন।

তাঁর কাব্যবিচারও কোথাও হয়েছে বলে চোখে পড়েনি। যদিও ফয়জুন্নেসার 'রূপজালাল' আখ্যান কাব্য, তবু তা গদ্যে-পদ্যে রচিত। এবং গদ্যাংশ পড়ে অভিভূত হলেও আখ্যানটির কাব্যাংশের গঠনরীতি মধ্যযুগীয়। রূপ ও জালালের প্রেম ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্যা এ কাব্যের বিষয়। তিনি নিজেকে 'আধুনিক লেখিকা' বলে বর্ণনা করলেও, তাঁর কবি-অন্তরটি ছুঁয়ে আছে তৎকালেই হলুদ-হয়ে-আসা মধ্যযুগীয় আখ্যান কাব্যের পৃষ্ঠাগুলিকে। কিন্তু, তাঁর গদ্যনির্মাণ আমাদের শ্রদ্ধা জাগায়। সর্বোপরি, তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা এবং নিজকর্তব্যে অটল থাকার মানসিকতা তাঁকে নারীশিক্ষার অগ্রনায়িকা করেছে।

এ সব তো হল। কিন্তু, তিনি মহিলা হয়েও নবাব হলেন কি করে ? ইতিহাসের এই অধ্যায়টিও কম চমকপ্রদ নয় এবং ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর চরিত্রের ঔদার্য ও ওজস্বিতা এই অধ্যায়টিতেও বেশ উজ্জ্বল।

সে সময় কুমিল্লা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ ডগলাস। জেলার উন্নয়নে, বিশেষ করে রাস্তাঘাটের মেরামতির জন্য সরকারের বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। মিঃ ডগলাস জেলার জমিদারদের কাছে ঋণ হিসেবে টাকা চান। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় যখন তিনি হতোদ্যম, তখনই ফয়জুন্নেসার কাছ থেকে এল টাকা-ভর্তি একটি তোড়া এবং চিরকুট। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন, ধার হিসেবে নয়, এ টাকা তিনি পাঠিয়েছেন জেলার উন্নয়নের জন্য। তাই আর ফেরত তিনি নেবেন না।

সঙ্গে সঙ্গে ডগলাস সচকিত হন, কে এই মহিলা, যিনি এত এত টাকা জেলার উন্নয়নে এককথায় দান করতে পারেন। বিশেষত, মুসলমানরা যখন ইংরেজদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন, তখন এই অপ্রত্যাশিত দান ডগলাসকে অভিভূত করে। ফয়জুন্নেসার যাবতীয় কর্মপদ্ধতি ও কীর্তির কথা জেনে তিনি সরকারকে অনুরোধ করলেন এই মহীয়সী মহিলাকে যথাযোগ্য সম্মান জানানোর জন্য। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সরকার থেকে ফয়জুন্নেসাকে জানানো হল যে, তিনি 'বেগম' উপাধি পেতে চলেছেন। উত্তরে ফয়জুন্নেসা জানালেন, পূর্ববাংলার এই অঞ্চলের মানুষ তাঁকে 'বেগম' বলেই জানে। এই উপাধি তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। আবার তাঁর উপাধি নিয়ে বিবেচনায় বসে সরকার। অবশেষে যখন রানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ১৮৮৯-এর উপাধির তালিকা ভারতে এল, তখন দেখা গেল অখ্যাত গ্রামের অন্তঃপুরচারিণী ফয়জুন্নেসা হয়েছেন 'নবাব'। ব্রিটিশ ভারতের এটি একটি নতুন নজির। এই বছরই রানী ভিক্টোরিয়ার আগ্রহে পর্দানশীন ফয়জুন্নেসা একটি ফটোগ্রাফ দিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ

করেছেন। তাঁর সেই একমাত্র ফটোগ্রাফটি বাকিংহাম প্যালেসে রক্ষিত আছে বলে তাঁদের অনুমান।

কিন্তু এসব তো তাঁর মত মহিলার কাছে বাহ্যাড়ম্বর ছাড়া কিছুই নয়। জাতির অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ক্ষীণস্বাস্থ্য নিয়ে যিনি ভেবেছেন এবং যথাসাধ্য দান করেছেন, মৃত্যুর আগে যিনি তাঁর সমস্ত ভূসম্পত্তি দিয়ে গেছেন জাতির সেবার জন্য, তাঁর কাছে এই 'নবাব'-এর দাম কতটুকু? বরং মাঝে মাঝে ভুলে গেলেও বাঙালির মনে আবার উঠে আসবে তাঁর নাম। কেননা, সে যুগে তাঁর যাত্রা ছিল একাকীর। আর, তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজের যথাসর্বস্ব নিয়ে হেঁটে যেতে চেয়েছিলেন, অতি সাধারণ মানুষের কাছে, মূক রমণীদের কাছে।

তাঁর কাজ শুধুমাত্র নারীমুক্তি বা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন সেই নবজাগরণের মানুষ, যখন একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার সময় নয়। সমাজের সর্বক্ষেত্রে ফয়জুন্নেসা তাঁর কাজকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই ব্রিটিশ ভারতের একমাত্র মহিলা নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী নারী শিক্ষার বা নারীমুক্তির অগ্রগামী সৈনিক হিসেবে শুধু নয়, একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবেই আমাদের প্রণম্য।

তথ্যসূত্র ঃ

১। রূপজালাল। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। সম্পাদনা ঃ মোহম্মদ আবদুল কুদ্দুস।

২। বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা ঃ বাঙালির শিক্ষাচিন্তা। সুখময় সেনগুপ্ত।

৩। ভারতী ও বালক। ডিসেম্বর-জানুয়ারি, ১৮৯১-১৮৯২।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। সুকুমার সেন।

৫। নারী জাগরণের সূচনা। মালেকা বেগম।

৬। উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা/ডক্টর ওয়াকিল আহমদ।

[ফেব্রুয়ারী ১৫, ১৯৯৭ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের সভাঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য প্রেরিত। লেখক 'আজকাল'-এর সংবাদিক।]

রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা — ৮

হিরন্ময় ঘোষাল ঃ তাঁর পোল জার্নাল

সলিলকান্তি দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

দু খানি হারিয়ে যাওয়া বাংলা বই মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় আর কুলটুর কামপফ এবং তাদের বিস্মৃত লেখক হিরন্ময় ঘোষাল সম্বন্ধে পুরনো 'জিজ্ঞাসা' আর হালের 'ঐতিহাসিক' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্তা মানসী দাশগুপ্তের দুটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে বর্তমান আলোচনা।

হিরন্ময় ঘোষালের জন্ম ১৯০৮ সালের ৭ আগস্ট, ২৪ পরগণা জেলায়। পিতার নাম কালীসদয় ঘোষাল। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সাহিত্য দর্শন-ভাষাতত্ত্বে স্নাতক হয়ে ১৯২৯-এ তিনি ইংল্যাণ্ড যান। সুইৎজারল্যাণ্ডে মাস ছয় ইংরেজি ভাষার শিক্ষকতার পর ১৯৩৫-এ তিনি পোল্যাণ্ডের ভারশৌ (Warsaw) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্বের শিক্ষকতার কাজ পান। সেখানেই শ্লাভ সাহিত্যে আন্তন চেকভের অবদান সম্বন্ধে পোল ভাষায় লেখা নিজের গবেষণা পত্রটি তিনি জমা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পোল ছাড়া রুশীয় ভাষাও তিনি ভালই জানতেন, ফরাসিও। জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণ (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) এবং দুদিন পরে জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নাৎসি কবলিত পোল্যাণ্ডে আট মাস কাটিয়ে, সে-তাবৎ নিরপেক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লণ্ডনস্থ দূতাবাসের মাধ্যমে তাঁর পিতার নেপথ্য চেষ্টার ফলে, ১৯৪০-এর শেষে হিরন্ময় ভারতে ফিরে আসেন, স্বীয় বাগদত্তা পোল বালা হালিনা নভিয়েস্কাকে সঙ্গে নিয়ে। কলকাতার বেসামরিক আরক্ষা দপ্তরে এবং আকাশবাণীতে তিনি কাজ পেয়েছিলেন। ১৯৪১-এ পুত্র দেবদানের জন্ম। অতঃপর কলকাতায় ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ এর মধ্যে, অর্থাৎ যুদ্ধের বছরগুলিতেই, প্রকাশিত হয় তাঁর পাঁচখানি বই — (১) মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় (২) হাতের কাজ (৩) শাকান্ন (৪) দিবানিদ্রা আর (৫) কুলটুর কামপফ। মাঝখানের তিনটি বই ছোটগল্পের সংকলন। প্রথম ও শেষ বই দুখানি যুদ্ধকালীন পোল্যাণ্ডে অবস্থানের ভিত্তিতে লেখা স্মৃতিধর্মী গদ্য। সবগুলিই বহুদিন হল

হারানো বই এর তালিকায়। ভারত স্বাধীন হলে মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে হিরন্ময় বছর পাঁচ চাকরি করেছিলেন। হালিনার মৃত্যু ১৯৫৫-তে। অতঃপর শিলং থাকাকালে ভারশৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে তার উত্তরে হিরন্ময় লেখেন — "আমার পত্নী বিয়োগের পর থেকেই পোলদেশ এবং পোলীয় বাতাবরণের বিশেষ ছোঁয়াটুকুর জন্য আমার পিছুটান বেড়েই চলেছে। যে পোলদেশকে আমি দ্বিতীয় স্বদেশ, কখনও হয়তবা আদত আপন দেশ বলেই মেনেছি, সেই পোল ভূমিতে এখন প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনায় আমি খুবই আনন্দ বোধ করছি।" — সে দেশেই শেষ পর্যন্ত ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু ভারশৌ'তে ১৯৬৯ এর ২৪ সেপ্টেম্বর। ক্ষেইগা ভালহাল্লি — শিরোনামায় তাঁর যুদ্ধকালীন পোল্যাণ্ড অবস্থানের ভিত্তিতে লেখা বই দুখানি পোলীয় অনুবাদে গ্রন্থিত হয়েছে।

।। ২ ।।

আলোচ্য বই দুখানির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এইরকম।

১। মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়

কুখ্যাত মিউনিখ চুক্তিতে জার্মানির হাতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে কার্যত সঁপে দেয়া হল যেদিন (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮), হিরন্ময় লিখছেন, ভারশৌ'তে "সেদিন সন্ধ্যায় রাদিওর সমুখে বসি।·· ··· মনে পড়ে ··· চেক লেখক কারেল চাপেক কথা বলতে বলতে শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। সে কী বুক চাপা কান্না।" (পৃঃ ৩২) পোল ব্রিটিশ মৈত্রী চুক্তি উপলক্ষ্যে পোল আইন সভার বিশেষ অধিবেশনের দিনেই (৫ মে, ১৯৩৯) ভারতীয় দর্শনবিদ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সরকারী আমন্ত্রণে ভারশৌ পৌঁছলেন। তাঁর দুঘণ্টার বক্তৃতার আগ্রহী শ্রোতাদের সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য — "সম্মোহিত নরনারীর এই বিরাট সমাবেশের দিকে মাঝে মাঝে যখন তাকাই, তখন ভাবি, আদর্শ পাগল এই জাত জার্মানীর সঙ্গে বিরোধে তার মতো······বিবেকশূন্য হতে পারবে কি?" (পৃঃ ৬৮)

অতঃপর পোলদের সর্বাত্মক আরক্ষ প্রস্তুতির মধ্যে "১লা সেপ্টেম্বর আধো ঘুমন্ত অবস্থায় শুনছি, পাশের ঘর থেকে কে যেন চীৎকার করে বলে চলেছে, যুদ্ধ! যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ······ পাশের ঘরে রাদিও থেকে খবর আসছে।" (পৃঃ ৯৮-৯৯)

যাবতীয় মোটরবাস, ঘোড়ারগাড়ী সব যুদ্ধে গেছে, শুধু ঘড়ঘড়িয়ে ট্রাম

চলছে, তাতেও মানুষ বেশি নেই, পুরুষরা সব যুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আটকা পড়তে হয় সাইরেনের শব্দ শুনে। পাতানো পোলীয় দিদির খবর নিতে গিয়ে তাঁর 'বাঙালীপনায়' লেখকের 'ইউরোপীয় মন' টের পায় মানুষের উপর মানুষের স্নেহ ভূগোলের বাধা মানেনা। ৩ সেপ্টেম্বর বিকেলে ব্রিটেন, ফ্রান্সের জার্মানবিরোধী যুদ্ধ ঘোষণার খবর পেয়ে আনন্দোন্মত্ত জনতা ছুটল ব্রিতানী ও ফরাসি দূতাবাসে। ব্রিতানী রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের বারান্দায় এসে পোল ভাষায় জয় হুঙ্কার ছাড়লেন — 'ন্যেখ্ ঝিয়ে পোল্স্কা।'

৬ সেপ্টেম্বর মাঝরাতে বেতার বাহিত সরকারি নির্দেশ মেনে রাস্তায় বারিকাদ গড়ে তুলতে কয়লা তোলার শভেল খানা নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন লেখক। বান্ধবীর অফিসে গিয়ে দেখা গেল, বীরাঙ্গনাটি তখন সরকারি নির্দেশে ফাইল দহনে ব্যস্ত। পরবর্তী সরকারি বিজ্ঞপ্তি, — যুবকরা যেন ভারশৌ ছাড়েন, কারণ ধরা পড়লে জার্মানরা তাদের বাধ্য করবে স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে। অতএব শহর জোড়া মহাপ্রস্থানের মধ্যে, বাগদত্তার দিদি ও মায়ের নির্দেশে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই, রুশ সীমান্তের দিকে হাঁটা পথে যাত্রা করলেন হিরন্ময়। শুরু হল এক মরিয়া পদযাত্রা, ক্রোশের পর ক্রোশ, কখনো আপেল গাছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে, কখনো ছাইরঙা রেনকোটে গা ঢেকে মাটিতে শুয়ে জার্মান বিমানকে ফাঁকি দিতে দিতে। কৃষক-ঘরনীদের সরল আতিথেয়তায় বহুবার প্রাণ বেঁচেছে তাঁদের। ভল্‌দাভা শহরের কাছে এসে দেখা গেল, যে পরিমাণ লোক পূব মুখো চলেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লোক চলেছে পশ্চিমদিকে। কারণ — পূব দিক থেকে রুশী আক্রমণ। ফলে এবার শুরু হল উল্টোযাত্রা; এলো এমনও গ্রাম, "হপ্তাখানেক আগে জার্মানরা তা দখল করে। তার তিনদিন পরে এল রুশীরা। গত দুদিন ধরে গ্রামখানায় আবার পোলীয় পতাকা উড়ছে।" (পৃঃ২৭৭) ১২ অক্টোবর শোনা গেল সেই পরম দুঃখের বার্তা, দু-সপ্তাহ আগে ভারশৌ-এর পতন ঘটেছে। অতঃপর ১৪ অক্টোবরের ক্লান্ত, শীতার্ত সন্ধ্যায় পায়ে পায়ে আবার ভারশৌ, যার ৪৩ শতাংশ বাড়ি জার্মান বোমায় চূর্ণ, ২৮ শতাংশ দগ্ধ প্রায়। পোলীয় দিদি, তাঁর স্বামী ও মা বেঁচে আছেন। দিদির প্রাক্ বন্দোবস্তের ফলে জার্মানদের নজর এড়াতে হিরন্ময় এবার যেখানে আস্তানা পাতলেন "সেটি একটি ছোট্ট কামরা, ……পাঁচতলার উপরে, এবং তার চারিপাশের বাড়িগুলো নিশ্চিহ্ন …… দেওয়ালের গায়ে যে একটু ফাঁক আছে, তা দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে — ইঁট, কাঠ আর ভস্মের স্তূপ।" (পৃঃ ৩১০) এল দুর্ভিক্ষ, কয়লার অনটন। "দেখছি ভদ্র, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত মরা ঘোড়া বা অন্য পশুর মাংস কেটে

নিয়ে এসে আপন আপন পরিবারের আহার জোটাচ্ছেন।" (পৃঃ ৩১১) শোনা গেল ক্রাকুভ বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মগোপনকারী অধ্যাপকদের ক্লাশ খুলবার লোভ দেখিয়ে পাইকারী ভাবে গ্রেপ্তারের কাহিনী। "পোলরা উন্মত্তের মতো শূন্য আকাশের দিকে তাকায়, ফরাসি ও ইংরেজ বিমান তাদের মুক্তি দিতে এল বুঝি।" (পৃঃ ৩৩০)

২। <u>কুলটুর কাম্‌পফ</u>

প্রথম বইটির নামকরণের মধ্যেই লেখকের মনোভাব প্রতিফলিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)কে যদি মহাযুদ্ধ (great war) বলা হয়, তবে তার চাইতে ঢের বেশি অমানবিক আর হিংস্রতর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সরাসরি মহত্তর (greater) বলাটাই বিধেয়। যুদ্ধকে যারা 'মহা' থেকে 'মহত্তর' করেছে তাদের বহু বিজ্ঞাপিত সাংস্কৃতিক অভিযানের কিছুটা স্বরূপ পাওয়া যায় হিরন্ময়ের পরবর্তী বই কুলটুর কাম্‌পফ্‌-এ, যার ভূমিকার কিছু অংশ তাঁর ভাষা ও রচনাশৈলীর দৃষ্টান্ত হিসাবেও উদ্ধৃতির যোগ্য।

"কাতলিক যাজকদের কব্জা থেকে ধর্মস্থানগুলিকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়ে তৎকালীন জার্মান ফ্যুরার বিসমার্ক এমন একটি কাম্‌পফ্‌-কে চালু করলেন, যার মন্ত্রবলে ওদেশের পাদরীবৃন্দ অচিরেই ধরাশায়ী হলেন। ......Kampf বা সংগ্রামের সঙ্গে Kultur বা 'সংস্কৃতি' এই বীজমন্ত্রটি যুক্ত না থাকলে তিনি এই অভিনব ধর্ম-জেহাদে জয়লাভ করতে পারতেন কিনা, তা সন্দেহের বিষয়। Kultur-এর প্রসাদে তাঁর কাম্‌পফে্‌ আপামর সাধারণ সকলেরই আন্তরিক সহানুভূতি স্বতঃস্ফুরিত রূপে অবাধে বর্ষিত হলো। .....সহসা জার্মান জাতি আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেলো। শিক্ষা ও সভ্যতায় জার্মানীর অবদান আজ পর্যন্ত কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি অস্বীকার করেছেন বলে মনে হয়না। .....কিন্তু এই Kultur-এর সঙ্গে Kampf যুক্ত হয়ে এমন একটি সঙ্কর আদর্শ জন্মলাভ করলো, যার প্রসাদে সাধারণ জার্মানদের সদ্বুদ্ধির কিয়ৎ বিলোপ ঘটলো। Kultur-Kampf-এর ঐতিহাসিক অর্থ ক্রমে শব্দ-তাৎপর্যে পর্যবসিত হলো। অর্থাৎ উক্ত শব্দদ্বয় উচ্চারণ মাত্রেই হান্‌স্‌, পাউল্‌ বা হাইনরিশ্‌-এর মনে ধারণার উদয় হলো যে, সে একজন জার্মান, তার Kultur আছে, এবং সেই Kulturকে জগতের সর্বত্র বিস্তৃত করার জন্য Kampf চালানো তার জন্মগত অধিকার। ......জার্মান জাতির এই মিশনের নামই Kultur Kampf। কাম্‌পফ্‌ এই জন্য যে, এ কাজ বিনাযুদ্ধে সম্ভবপর নয়।

বিগত মহাযুদ্ধে বিসমার্কের নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত সম্রাট ভিল্‌হেল্‌ম্‌ যে

Kultur Kampf চালিয়েছিলেন, সেকথা কারো অজ্ঞাত নেই এবং জার্মানীর পরাজয়ে যে এই অপূর্ব সংস্কৃতিকে বিশ্বজনের পাতে দেওয়ার সুযোগ ঘটলো না, সেই দুঃখে সমগ্র জার্মান জাতি বিশ বছর ধরে গুমরে গুমরে মরেছে। হিটলারের প্রসাদে তার সে দুঃখ ঘুচলো। মাইন কাম্‌পফ্‌-এর প্লান মাফিক প্রায় সমগ্র ইউরোপে কুলটুর কাম্‌পফ্‌ চালু হলো।''

নাৎসি কবলিত পোল্যাণ্ডে আটমাস থেকে তারও প্রথম অধ্যায়টিই শুধু দেখেছেন লেখক। যেমন — (১) জার্মানদের জন্য কলোনি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলের পোলদের কয়েকঘণ্টার নোটিশে ভিটে ছাড়া করার ফলে ভারশৌ-এর পথে হাজার হাজার ছিন্নবাস, শীর্ণ দেহ গ্রামীণ নরনারী শিশু বৃদ্ধের ভিড়, জার্মান সান্ত্রীরা যাদের উপহাস করে বলে 'ডিজেন শ্বাইনে' (ভিখিরীর জাত)। (২) বৃদ্ধ, প্রাক্তন পোল সৈনিক কর্তৃক স্মৃতিজড়িত তলোয়ার খানা লুকিয়ে রাখা, জার্মান সেনার অভব্যতায় উত্যক্ত পোল ছাত্রী কর্তৃক তার প্রতি মামুলি কটূক্তি ('কুকুরের রক্ত') বর্ষণ, মাতাল অবস্থায় পোল চাষী কর্তৃক হিটলারের নাম নিয়ে দেয়ালে ছুরি নিক্ষেপ ইত্যাকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে পোলদের প্রতি নাৎসিদের নৈমিত্তিক প্রাণদণ্ড, এবং জনমানসে ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে সেগুলি বিজ্ঞাপিত করা। (৩) অলস প্রতারক পোল জাতিকে শ্রমের মহিমা শেখাতে 'আনএমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো' খুলে বেকার খোঁজা, এবং তাদের চিহ্নিত করতে না পেরে, বেকার স-কার নির্বিশেষে স্বাস্থ্যবান পোলযুবকদের ধরে ধরে জার্মানিতে চালান করা। (৪) ডাকঘরের সামনে ইহুদিদের প্রবেশ নিষেধ বিজ্ঞপ্তি সাঁটা, তাদের পরিবার পিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য দু'হাজার জ্লাতির মধ্যে সীমিত রাখা, জামার হাতায় জিওনের পাঁচ তারা লাগানো বাধ্যতামূলক করা, তাদের পাড়া ঘিরে প্রাচীর তোলা, রেশনের মাথাপিছু এক পো রুটি তাদের জন্য আড়াই ছটাক ধার্য করে অ-ইহুদির দোকানে তার বিক্রি বন্ধ করা। (৫) শিক্ষকদের জেলে পুরে, লাইব্রেরির বহু বই নষ্ট করে, নির্বাচিত বই ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি লরিতে চাপিয়ে জার্মানিতে পাচার। (৬) ট্রেনে আর্য-অনার্য পৃথকীকরণ, যার ফলে পোল্যাণ্ড ছাড়ার প্রাক্কালে হিরন্ময়কে বিবেকের বিরুদ্ধেই ভারতীয় আর্যত্বের দোহাই পাড়তে হয়েছিল। (৭) ইংরাজি-ফরাসি ভাষা শিক্ষা শেখানো নিষিদ্ধ করা। ("সেদিন ছাত্র খুঁজতে বেরিয়ে সেই প্রথম জানতে পারলাম, ওদেশে আমার একমাত্র মূলধন ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা পড়ানো বা অন্য কোনো উপায়ে বিস্তার করা শাস্তি বিধেয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে'' (পৃঃ ২৭৭)। দেশের পরাধীনতা মননশীল মানুষদের যে কতটা আঘাত করতে পারে, তার

প্রমাণ কবি তেতমায়ার, ঔপন্যাসিক গঁস্যরভস্কি, সমালোচক লরেন্তভিচ প্রমুখের আপাত-স্বাভাবিক মৃত্যু। যা ছিল দিদির স্বামী ক্লাসিক্স্-এর পণ্ডিত, অধ্যাপক আদামের ভাগ্যেও। নানা বয়সী মানুষদের সঙ্গে নাৎসিরা একদিন তাঁকে গুঁতো মারতে মারতে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ৬ ঘণ্টা আটকে রেখেছিল মানুষ ঠাসা একটা ঘরে, সেখানে বসারও জায়গা মেলেনি। 'আলেয়া সুখা' — রাস্তার উপরে জার্মান গুপ্ত পুলিশ গেস্তাপো'র সদর দপ্তর, একবার যারা ওই বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়ে ফিরে এসেছে, তারা হয় উন্মাদ, নয়ত জীবন্মৃত, যেমন প্রখ্যাত অভিনেতা ভেঙ্গখীন্, শেষ পর্যন্ত যাঁকে ডাণ্ডাপেটা করে হত্যা করা হয়, অতীতে হিটলার-বিরোধী নাটক করার দায়ে। পোল্যাণ্ডের আত্মা তবু অবিজিত। ১১ নভেম্বর জাতীয় দিবসে তারা নিশ্ছিদ্র হরতাল পালন করেছে, আগের দিনের হাজার হাজার ধরপাকড়ের পরেও। ২ নভেম্বর ভূত-চতুর্দশীর সন্ধ্যায় শ্মশানপুরী ভারশৌ-এ অদ্ভুত এক বিষণ্ণ দেয়ালী। প্রতিটি কবরে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে পোলরা সাতটার আগেই বাড়ি ফিরে গেছে। তারই মধ্যে অন্য এক একান্ত পোল্যাণ্ড, হিরন্ময়ের জন্য, — দিদি য়াদভিগা আর তাঁদের মামুস্যা (মা-মণি)র স্নেহে, পরিচর্যায়, গৃহিনীপনায় অন্তরঙ্গ। বিদায়ের দিনে, হিরন্ময় লিখছেন, "সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি, সব তৈরি, আমার শার্ট দুটো কাচা, ইস্তিরী করা, পেন্টলুন রিপু করা, জিনিসপত্র গোছানো। কবে দিদির কাছে আব্দার করেছিলাম একটা মানিব্যাগে .. .. ছোট্ট পেতলের ক্ষুর সেল্'ই করে বসিয়ে দিতে। সেটিও বাদ যায়নি।" (পৃঃ ৩১১) সেদিন ২৬ এপ্রিল, ১৯৪০, বাগদত্তা হালিনাকে নিয়ে সীমান্তগামী ট্রেনে চড়লেন হিরন্ময়।

।। ৩ ।।

হিরন্ময় সুস্পষ্টভাবে ফ্যাসিবাদের বিরোধী। ১৯৩৬-এ চেকোশ্লোভাক রাজধানী প্রাহায় (প্রাগ) বেড়াতে গিয়ে সেখানে নাৎসি অনুগামী দুই ভারতীয় গুপ্তচরের গ্রেপ্তার তাঁকে লজ্জা দিয়েছে। যুদ্ধের ঠিক আগে জনৈকা পোল লেখিকার গান্ধীজী বিষয়ক এক বই-এর ভূমিকায় হিরন্ময় গান্ধী-নীতির সঙ্গে হিটলার বাদের বৈসাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে শেষোক্তের প্রভূত সমালোচনা করেছিলেন। (কুলটুর, পৃঃ ২৬৫ দ্রঃ)। জার্মান বোমায় বই-এর গুদাম ধ্বংস হয়েছিল বলে বাঁচোয়া। ১৯৪০-এ পাসপোর্ট প্রত্যাশী হিরন্ময়কে জার্মান অফিসার প্রশ্ন করেন, ...“ভবিষ্যতে জীবন ধারণের উপায় কি ঠিক করেছেন?” প্রশ্নের

মর্ম, হিরন্ময় জানাচ্ছেন, — "আমি ওদের তাঁবেয় মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডার কাজে যোগ দিতে রাজি আছি কি না। যদি সম্মত থাকি তো অবশ্য আমায় বার্লিনে চালান করে তারই পরিধির মধ্যে এক অপূর্ব আজাদ হিন্দুস্থানে স্থান দিয়ে আমারই দেশের কাজে মুখ এবং কলম দুই-ই ছোটাতে অনুরোধ করা হবে।"

জার্মান অফিসারের পরবর্তী সওয়াল, — "আপনার মনে হয়না কি, এই সুবর্ণ সুযোগের ক্ষণে আপনার দেশের জন্য কাজ করা উচিত? এবং সে সুযোগ আপনি এখানে বসে যেরকম পাবেন, তা ইংরেজের কাছে ফিরে গেলে আপনার পাবার আশা নেই।" হিরন্ময়ের উত্তর — "আপনি যে ধরনের দেশের কাজের কথা বলছেন, সে কাজের জন্য আমি নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করি। তা ছাড়া আমার বিদ্যার দৌড় শুধু ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য পর্যন্ত।......অর্থাৎ আপনি রাজি নন?"

সত্যিই রাজি হন নি হিরন্ময়। এমন কোনো সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে তিনি আস্থাশীল ছিলেন না, যার জন্য নাৎসি-প্রচার যন্ত্রের সামিল হওয়াকেও দেশপ্রেম বলে ভুল করতে হয়। জার্মানদের ফাঁদে পা না দিয়ে তিনি ভারতে ফিরে এসেছিলেন, এবং যোগ দিয়েছিলেন ফ্যাসিবিরোধী প্রচার যুদ্ধে। পরাধীনতার বেদনা ভারত এবং পোল্যাণ্ডকে অভিন্ন করে তুলেছিল হিরন্ময়ের অনুভূতিতে। কুলটুর-এ বর্ণিত একটি ছোট্ট ঘটনা।

— ভাস্? ডের য়ুডে-ডা? ঐ ইহুদীটা? ডু, কম হীর — এই, এদিকে আয়।

— হাত ও পিঠের বোঝা নিয়ে আবার ফিরে আসি। সান্ত্রী বন্দুকের বাঁটটা উঁচিয়ে শাসায় --

-- চালাকি করলে মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব। বল তুই ইহুদী কিনা?

— পকেটে ব্রিতানী পাসপর্ত, তাই সংক্ষেপে বলতে হয় -- না ইহুদী নই!

তবে কী?

পোল। — একটু ইতস্তত করে উত্তর দিই।" (কুলটুর পৃঃ ৬)

সংলাপটি প্রতীকী। সুদূর ভারতের এক অখ্যাত মেহ্‌মান পোলজাতির সেই পরম দুঃখের অভিজ্ঞতাকে নিজ উপলব্ধিতে যে কতটা অনুভব করেছিলেন, তারই দলিল আলোচ্য বই দুখানি যাদের ভাষা এবং রচনাশৈলী বিস্ময়কর। ট্র্যাজিক গাম্ভীর্য এবং হিউমারের সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটেছে সেখানে। পড়তে বসে ভুলে যেতে হয়, বই দু-খানা পঞ্চাশ বছর আগের লেখা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত ঃ-

(১) "সমস্ত ভারশৌ সহরটাকে কোনো প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পীর

আলোছায়ার ছবি বলে ভুল হয়। অন্য কোনো রং চোখে পড়েনা, শুধু আলো আর অন্ধকার — Lux et omlera — জ্যোতি ঃ ও তমস্। আলোকে প্রতিহত করে পৃথিবীর বুকে এই যে ছায়াপাত করছি, এতে আমি বেঁচে আছি একথাটা যেন সেদিন নূতন করে উপলব্ধি করলাম।" মহত্তর, পৃঃ ১৩২

(২) "প্রকৃতির কোলে স্রষ্টার সৃষ্টির আবেগে এই যে জীবলোকের উৎপত্তি, তা যদি সত্যিই এই মহত্তর বা মহত্তম যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে বিধাতার কাছে নতমস্তকে শাস্তির প্রতীক্ষায় দাঁড়াবে একটি মানুষ এবং একটি জাতি — হিটলার এবং "হাইল হিটলার" মন্ত্রে দীক্ষিত জার্মানী।" (মহত্তর, পৃঃ ১৩৩)

(৩) ঘরখানার একটি প্রচ্ছন্ন কৌতুকবোধ আছে। ......চাকী বেলুনের ওপর ভেনুস দ্য মিলোর প্রতিমূর্তি, বইয়ের গাদার ওপর জুতো ভরা থলে ......সেজান ও গোগ্যাঁর ছবিগুলোর ওপর বালটি ভরা জ্বালানি কাঠ. ....। জীবন যেন নিজের হাতে একটি সম্পূর্ণ ব্যাঙ্গচিত্র রচনা করেছে। তারই পটভূমিতে বাস করা পরম সৌভাগ্য মনে হল। (কুলটুর. পৃঃ ২৩৭-৩৮)

হিরন্ময়ের পোল কাহিনীতে ঐতিহাসিক ট্রাজেডির একটি পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রিয়ার পর চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসে উদ্যত হয়ে পোল পররাষ্ট্রমন্ত্রী য়ুজেফ বেক্-কে জার্মানরা ভজাল যে, চেক অধিকার থেকে আলসা নদীর অপর তীরস্থ পোল অধ্যুষিত জেলা দুটিকে ছিনিয়ে নেওয়া পোলদের অবশ্য কর্তব্য। বেক সাহেব এই ফাঁদে পা দিলেন। পোল জার্মান অশোভন আঁতাআঁতির (Entente শব্দের হিরন্ময় কৃত ব্যঙ্গরূপ) মধ্যেই জার্মানির চাপে চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ শুরু হল। পোল সেনা বীর দর্পে বিতর্কিত জেলা দুটির দখল নিল। এর অল্প দিনের মধ্যেই পোল্যাণ্ডের নিজের উপরেই ক্রমশঃ মূর্ত হতে থাকল জার্মান আগ্রাসনের যাবতীয় পরিচিত লক্ষণগুলি। এর পাশাপাশি লেখক রেখেছেন জাতিগত মৈত্রী ও বৈরিতার জন্য একটা চিত্র। চেকোশ্লোভাকিয়ার তৎকালীন দেড় কোটি মানুষের জাতিগত অনুপাত ছিল নিম্নরূপ ঃ চেক = ৭০ লাখ; শ্লোভাক = ৩০ লাখ; রুশিন উক্রানী = ৭ লাখ; জার্মান = ৩২ লাখ ৫০ হাজার। এই জাতিগোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক মৈত্রীর ভিত্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে সুখ ও সমৃদ্ধি, তার পরিচয় লেখক পেয়েছেন প্রাহায় বেড়াতে গিয়ে। কিন্তু তাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত অসূয়া-বিদ্বেষ অবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলার রাজনীতিকে সক্রিয় করা হচ্ছিল। এরই পরিণতি জার্মানির চাপে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিভাজন এবং কার্যত জার্মান রাষ্ট্রভুক্তি। সর্বোপরি, মধ্য ও পূর্ব ইওরোপের শ্লাভ গোষ্ঠীর

মানুষদের প্রতি নাৎসি জার্মানির নর্ডিক কৌলিন্য সম্ভূত অবজ্ঞা বিদ্বেষ তো ছিলই। সর্বনিম্নে ছিল অনার্য সেমিটিক ইহুদিদের স্থান। বিজিত পোলদের মধ্যেও শ্লাভ-ইহুদি ভেদ নীতি চালু করেছিল নাৎসিরা। মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়টি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এইভাবে গড়ে ওঠা জাতিদ্বেষের পটভূমিকায়।

মধ্য পূর্ব ইওরোপের (প্রাচী ইওরোপের) এই বৈশিষ্ট্যটি ভারতের সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যমুক্ত। সুরাহা-সম্প্রীতির আজকের আসরে হিরন্ময় ঘোষাল এ কারণেও প্রাসঙ্গিক যে, আমাদের অন্যতম আদর্শ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তাঁর লেখা আলোচিত বই দুখানিতে নতুন মাত্রা পেয়েছে। ভারতীয় আমরা সমস্যাটির যে প্রকরণের সঙ্গে পরিচিত, তাকে বিশ্বায়িত করে দেখার, বোঝার কাজে বই দুখানি পড়ে আমরা ফিরে দেখি বিভীষিকার সেই দীর্ঘ রাত্রিকে, খোদ ইওরোপ যখন সভ্যতার স্বস্তিকা-লাঞ্ছিত কবর ভূমিতে রূপায়িত হয়েছিল। হিরন্ময়ের মতো আমরাও বিশ্বাস করি, ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়েই বিশ্বমানবতার ঐক্য সাধনার ধারাটি সমৃদ্ধ হয়। অন্যদিকে আবার ইত্যাকার পরিচয়-স্বাতন্ত্র্যকে ঘিরেই মাঝে মধ্যে যে সব বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে, তাদেরই বৃহত্তর প্রকরণ জাতিদাঙ্গা আর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে হিরন্ময়ের মনে এসেছে ভারতের তৎকালীন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-দাঙ্গার কথাও। প্রথাগত যুদ্ধ ঘোষণা না করেই জার্মানির পোল্যাণ্ড আক্রমণকে 'পোলে-জার্মানে দাঙ্গা' আখ্যা দিয়ে হিরন্ময় লিখেছেন, — 'বিনা ঘোষণার যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি কুরুক্ষেত্রের দেশ ভারতবর্ষে — ঢাকায়, বোম্বাই-এ, আমেদাবাদে।'' (মহত্তর পৃঃ ১০০)

সেই বিনা ঘোষণার যুদ্ধে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার কিছু অংশে গোরস্থানের সংখ্যা সম্প্রতিকালে মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। আবার ভেঙে গেছে চেকোশ্লোভাকিয়া। ভারতবর্ষও ভূ-ভারতের বাইরে নয়। পক্ষান্তরে আমরা বিশ্বাস করি সংঘাতের মানবিক সুরাহায়, যা সম্ভবপর হয় সম্প্রীতির ধৈর্যশীল অনুশীলনে। হিরন্ময় ঘোষাল এ কারণেও আমাদের সহযাত্রী।

মূল বই দু'খানি ছাড়া, হিরন্ময় ঘোষাল সম্বন্ধীয় তথ্যাদির জন্য ঋণ — 'জিজ্ঞাসা' (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৮) এবং 'ঐতিহাসিক' (বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪০৩) পত্রিকায় প্রকাশিত ড. মানসী দাশগুপ্তর লেখা দুটি প্রবন্ধ।

[ডিসেম্বর ৭, ১৯৯৭ সালে মৌলালী যুবকেন্দ্রের হলঘরে প্রদত্ত। বক্তা ছিলেন কেন্দ্রিয় সরকারের অডিট বিভাগে কর্মরত উর্ধ্বতন কর্মচারী।]

হৃতদরিদ্র জনজীবনের ভাষা-রূপকার আফসারুন্নেসা

সুমিতা চক্রবর্তী

প্রথমেই বলি আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে প্রকাশনা ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার কথা। আজকের অনুষ্ঠানের ক'দিন আগে দুটি গল্প সংকলন হাতে পেয়েছিলাম। নাম 'কক্ষচ্যুতা' এবং 'সেই প্রলয়ের রাতে'। দুটি বই প্রথম প্রকাশের সাল ও তারিখ ১ বৈশাখ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ। দুটি গ্রন্থেরই প্রকাশক জাহান জেব্ আখতার এবং প্রকাশনা সংস্থার নাম 'লাবনী প্রকাশনী' ঠিকানা ধানমন্ডি, ঢাকা-৯। সংকলন দুটিতে আছে যথাক্রমে আটটি ও নয়টি — মোট সতেরোটি গল্প। যেকোন পাশ্চাত্য প্রকাশনার বইয়ে, কয়েক ছত্রে হলেও লেখকের পরিচিতি প্রদত্ত থাকে, থাকে লেখকের জন্ম সালের উল্লেখ। অধিকাংশ বাংলা বইয়ে, এখনও সেই পদ্ধতির কোনো প্রয়োগ দেখিনা। সবিশেষ খ্যাতনামা কয়েকটি সংস্থামাত্র এই নীতি অনুসরন করে থাকে। অথচ এটুকুর জন্যই অনেক লেখককে ঠিকমতো বুঝে নেবার পথে কত অস্পষ্টতার জায়গা রেখে দিতে হয়।

স্বীকার করি, একালের সমালোচকেরা বলবেন — ভাষার মাধ্যম ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে যে শিল্পমূর্তি — বিচার হবে কেবল তাই দিয়েই। কে তার নির্মাতা এবং কবে, কোথায়, কীভাবে তিনি তা সৃষ্টি করলেন — সে তথ্য সন্ধান নিষ্প্রয়োজন। তাতে শিল্প-বিচারে এসে পড়ে পক্ষপাত। এই অভিমতও একদিক থেকে যথার্থ। তবু অন্তত, কোন্ সময়ে লেখাগুলি আলো দেখেছিল — তার সময়-প্রেক্ষিত একটু না জানলে রচনার সামাজিক অবস্থান ঠিকমতো যে বোঝা যায় না — এটা একটা অসুবিধা বলেই মনে হয়। লেখকের পরিচয় সামান্য একটু জানলেও লেখার অন্তরকে স্পর্শ করা যায় একটু অন্যভাবে। সব সময়েই গম্ভীর মুখে নৈর্ব্যক্তিক শিল্প-বিচারের প্রয়াসে মন তৃপ্তি পায় না। লেখক আর লেখা মিলিয়ে নিলে একটি রচনাকর্মের রক্তমাংস আর হৃদস্পন্দন যেন একটু বেশি করে অনুভূত হয়।

'কক্ষচ্যুতা' এবং 'সেই প্রলয়ের রাতে' — বই দুটি লিখেছিলেন আফসারুন্নেসা। শিক্ষিত পরিবারের কন্যা। গ্রন্থ প্রারম্ভে তাঁরই লেখা কয়েকটি

আত্ম-পরিচিতিজ্ঞাপক ছত্রে একটু তাঁকে চিনে নিতে পারি।

"আমার নানী বেগম বদরুন্নেসা খানমকে — যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলিম সামন্ত পরিবারের অন্ধকার হেরেমে জন্মগ্রহণ করেও ছিলেন গভীর বিদ্যানুরাগী - স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত। কৈশোরে হারালেও যাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা, প্রখর ব্যক্তিত্ব, সরল উদার জীবনযাত্রা, স্বাভাবিক নীতিবোধ, সর্বোপরি গৃহকর্মে অসাধারণ কলাকুশলতার স্মৃতি আমার মনে চিরতরে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে।" (প্রাক্‌কথন স্বরূপ কয়েকটি ছত্র, 'সেই প্রলয়ের রাতে')

'কক্ষচ্যুতা' সংকলনের উৎসর্গ পত্রে লেখিকার বাবা ও আম্মার উল্লেখ আছে। তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়নি যদিও — তবু তাঁদের পরিচয়ে লেখা হয়েছে — "যাঁরা সমাজের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে আমাকে উচশিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।"

পুনশ্চ এই সংকলনে বলা হয়েছে — লেখিকা জীবনের প্রথম থেকেই তৎকালীন অভিজাত 'সাপ্তাহিক বেগম' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে তাঁর অধিকাংশ গল্প। 'কক্ষচ্যুতা'-র ভূমিকা থেকে আরও জানা যায় যে — স্বামীর চাকরি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করবার ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ঘটেছে আফসারুন্নেসার। মনে হয় তাঁর স্বামী বাংলাদেশের সরকারি দপ্তরের প্রতিষ্ঠিত কোনো পদাধিকারী। এবং তিনি স্ত্রীর সাহিত্যচর্চায় বাধা সৃষ্টি না করে সহায়তাই করেছেন।

'সেই প্রলয়ের রাতে'র ভূমিকায় লেখিকা তাঁর স্নেহভাজন অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী র নাম করেছেন - যিনি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁকে।

এইসব লিখন থেকে লেখিকার কিছুটা পরিচয় পেয়ে যাই। উনিশ শতকের ভূম্যধিকারী পরিবারে প্রবেশ করেছিল কিছুটা নবজাগরণের আলো। সেই পরিবারের দৌহিত্রী আফসারুন্নেসা শিক্ষিত পিতা-মাতা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এতটাই শিক্ষিত ছিলেন তাঁরা যে, কন্যাকেও পৌঁছে দিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষার দরজায়। আফসারুন্নেসার বিবাহিত জীবনে মোটের উপর সুখ সচ্ছলতা ছিল। স্বামী পত্নীর সাহিত্যচর্চায় অনাগ্রহী ছিলেন না। কাজেই খোলা মনে, নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে ভাষারূপ দিতে পেরেছেন লেখিকা। কী তিনি লিখেছেন ও লিখতে চেয়েছেন তা-ও স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন 'কক্ষচ্যুতা'-র ভূমিকায় —

"স্বামীর চাকরী উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকালে দেশের

সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয় আমার। তাদের ব্যথা, বেদনা ও সমস্যাই আমার লেখার প্রেরণা। বস্তুতঃ আমার গল্পগুলি এই দুর্ভাগা দেশের নরনারীর প্রতিকারহীন বেদনার ইতিহাস। সমালোচকের দৃষ্টিতে হয়তো এগুলিতে অনেক অপূর্ণতা ধরা পড়বে। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। কারণ, আমি আপনার কথা আপনজনকে শোনাতে চেয়েছি।"

এর পরে মনে হয়। আফসারুন্নেসার গল্প সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলার থাকে না। যা বলবার সবই বলে দিয়েছেন তিনি নিজেই। এমনকি সমালোচকের কাজও করে রেখেছেন আগাম। এখান থেকে একটি কথা উঠে আসে — লেখিকার দৃষ্টি আগাগোড়াই স্বচ্ছ। তিনি জানেন কী লিখছেন এবং কেন লিখছেন। এবং সমালোচকের এই উপলব্ধি এখান থেকেই জেগে ওঠে — লেখিকা তাঁর অভিজ্ঞতার সত্যরূপই বিবৃত করেছেন কারণ সেই সত্যকে তুলে ধরবার জন্যই তাঁর লেখার প্রয়াস। সাহিত্য প্রতিযোগিতার দৌড়ে তিনি সামিল হননি। পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হওয়া, সমালোচকের কাছে বাহবা পাওয়া, প্রকাশকের কাছে লাভজনক কোনো লেখক হয়ে ওঠবার কথা মনে হয়নি তাঁর। তাই তাঁর চোখ দিয়ে ১৯৭০ থেকে ১৯৮৫ — এই কালপর্বের বাংলাদেশের জনজীবনকে আমরা দেখে নিতে পারি। এই দেখাটুকুই তাঁর এই দুটি গল্প-সংকলন থেকে পাঠকের প্রাপ্তি।

বাংলাদেশের বৃহত্তর অবলোকনে ভারতীয় উপমহাদেশের বহু অঞ্চল সম্পর্কেই লেখিকার পর্যবেক্ষণে যে সত্যটি উঠে আসে তা আমাদের কষ্ট দেয়, নিরাশ করে। অধিকাংশ গল্পের অবলম্বন দরিদ্র কৃষিজীবী ও দিনমজুর শ্রেণি। সেই কৃষকদের নিজের জমি নেই। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কথাও কিছু কিছু লিখেছেন আফসারুন্নেসা। সেইসব পরিবারে নিরন্তর খাদ্যাভাব। পেটের খিদে মানুষকে অ-মানুষ করে দেয়। সন্তানকে ফেলে রেখে যায় জননী। কিশোর পরিচারিকাকে নিরন্তর অত্যাচারে ও খেতে না দিয়ে পীড়ন করে গৃহকর্ত্রী, উপরন্তু গৃহকর্তা তার শরীরও চায়। নিত্যক্ষুধায় অস্বাভাবিক হয়ে যেতে থাকে মানুষ।

এই অভাবের মূল হিসেবে মন্বন্তব, খরা, বন্যা, জাতীয় কোনো সাময়িক ঘটনা নির্দেশ করা হয়নি। দেশের সমগ্র অর্থনীতির প্যাটার্ন-এর মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে এইসব ক্ষুধার্ত গহ্বর।

আবার শোষিতদের মধ্যেও শোষিত — নারী। সর্বদাই বাবা-মার 'বোঝা', কোনোক্রমে বিয়ে দেওয়া — বয়সের অনেক পার্থক্যসহ, অনেক সময়েই স্বামীর

দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বিবি হয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসা। গ্রামবাংলার মুসলমান সমাজের গল্পই প্রধানতঃ আমাদের শুনিয়েছেন আফসারুন্নেসা। শ্বশুরবাড়িতে বিরামবিহীন শারীরিক শ্রম দিয়ে যাওয়া। পুষ্টিবিহীন, আধপেটা খেয়ে প্রাণ ধারণ এবং লাগাতার সন্তান ধারণ। ঘরে ভাত নেই। কিন্তু সন্তান আসে — আসতেই থাকে। প্রায়শই সন্তান হতে গিয়ে মরে যাওয়া শিশুর ও জননীর অথবা 'তালাক' 'তালাক' 'তালাক' শুনে পথে নেমে আসতে বাধ্য হওয়া নারীর। তার যৌবন নেই — বয়স তার পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ — যাই হোক না কেন। যৌবন নিঃশেষিত হয়ে গেছে স্বামীর ভোগে আর সংসারের পেষণে। যৌবন নেই বলে ঘরহারা মেয়েটির বারাঙ্গনা হওয়াও সম্ভব হয় না। রাস্তায় পড়ে মরাই তার জীবনোত্তর চিত্র। সেই চিত্রই বারবার এঁকে দিয়েছেন আফসারুন্নেসা। তা দেখতে আমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক।

নারীর প্রতি এই অত্যাচারে পীড়কের ভূমিকা নেয় নারীও — শাশুড়ি. ননদ, নানী কিংবা মা-ও বাদ যায় না। তালাকপ্রাপ্ত কন্যার সামনে দরজা বন্ধ করে দেয় মা; নাতনির নিকাহ্ করাবার পর তার শিশুদুটিকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় অনাকাঙ্ক্ষিত বি-পিতার সংসারে। কিন্তু দুই বাড়িই পথে বার করে দেয় শিশুগুলিকে। নারী ক্ষমতায়নের কথা আজ বারবার ওঠে। কিন্তু 'শিশুর ক্ষমতায়ন' — এই বাক্যবন্ধ বোধ হয় আমরা এক শতাব্দী উচ্চারণ করতে পারব না। দারিদ্র্য, পিতৃতন্ত্র আর মোল্লাতন্ত্র একত্রে মিলে যে সমাজ তৈরি হয় — তাকে 'নরক' বললে নরকেরই সম্মান।

আফসারুন্নেসা সাদা-কালো ভাগে ভাগ করা মানুষকে দেখাননি। 'বোঝা' (কক্ষচ্যুতা') গল্পের সুলেমানকে ভোলা যায় না। যতক্ষণ ঘরে একমুঠোও চাল আছে ততক্ষণ সে নিকাহ্ করা স্ত্রীর আগের পক্ষের সন্তানদের ভাত দিতেও অস্বীকার করেনি। যদিও বিবাহের শর্ত তা ছিল না। তারপর যখন ভাত নেই, তখনই পথ, তখনই মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে যাওয়া।

বিত্তবান সম্প্রদায়ের প্রতি, মোল্লা-মৌলবিদের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখাননি লেখিকা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাৎপটে লেখা হয়েছে তিন-চারটি গল্প। সেখানেও নিরবচ্ছিন্ন অভাব আর অত্যাচার রক্তে-রেখায় দাগানো। স্বাধীনতার উদ্দীপনার অনুভব তুচ্ছ। যার পেটে এক কণা খাদ্য নেই, সত্যিই তো তার কাছে সব আজাদি-ই ঝুঠা।

গল্পগুলি পড়লে মন খারাপ হয়ে যায়। সেখানেই লেখিকার সাফল্য। সরল বিবৃতিতে লেখা গল্পগুলিতে স্বতন্ত্র কোনো শিল্পগুণ সন্ধান নিরর্থক। কিন্তু

হতদরিদ্রের সংসারযাত্রার যে সত্যতা লেখিকা অনায়াসে জীবন্ত করে তুলেছেন — কোনো সমালোচকের সাধ্য হবে না তাকে তুচ্ছ করবার। সত্যগুণই আফসারুন্নেসার রচনার শিল্পগুণ। ব্যক্তিমানুষ আফসারুন্নেসা নয়, আমরা আজ মহাপ্রাণা রোকেয়া স্মরণ উপলক্ষে কঠোর বাস্তবের অসামান্য রূপকার শিল্পী আফসারুন্নেসাকে জেনে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে সমৃদ্ধ হলাম। তার জন্য সুরাহা সম্প্রীতিকে ধন্যবাদ।

[ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৯৮ সালে কার্জন পার্কের লালন মঞ্চে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার। বক্তা ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।]

আফসারুন্নেসা সম্পর্কে দু'চার কথা

জাহানারা নওশিন

সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টির পর বর্ষণক্লান্ত প্রগাঢ় একটি সন্ধ্যা। দর্দুর ও ঝিল্লি নিনাদিত রাঢ়বাংলার একটি গ্রাম। ভারি আকাশ নেমে এসেছে বাড়ির উঠোনে। কিছু কিছু গ্রামীণ গন্ধমাখা ভেজা বাতাস — মৃদুমন্দ হয়ত তখনও বৃষ্টির ফিনকি লেগে আছে তার গায়ে। প্রকৃতি গভীর ও মেদুর। একটি ঘরের বারান্দায় বসে দুই ভাইবোন কথা বলছিলাম। সদ্য প্রকাশিত 'বেগম' (বেগম তখন খুব ছিমছাম বেশে কলকাতা থেকে বেরুতো) পত্রিকায় একটি গল্প পড়ে সেদিন একজন অসহায় মা ও ছেলের জন্য আমাদের দু'জনেরই মনে কষ্ট। সেজন্য আমরাও গম্ভীর। আমি তখন কেবলই কিশোরী, ভাইটি বালকই বলা চলে। সম্ভবত চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের বয়সের তুলনায় গল্পটির বিষয়বস্তু বেশ ভারি তবু গল্পটি পড়ে আমরা কিছু একটা বুঝেছি যা আমাদের কাছে অমানবিক মনে হয়েছে — অন্যায়, খুব অন্যায়।

গল্পটির নাম 'তরফেসানি'। লেখিকা আফসারুন্নেসা। সেদিন আমরা যে শুধু মা ও ছেলের দুঃখে দুঃখিত তা নয়। আমাদের দুঃখের সঙ্গে একটা বিস্ময়ও যুক্ত হয়েছে। কারণ আমরা ঐ বয়সে তখনও কোন মুসলিম মহিলার লেখা গল্প পড়িনি। আমরা বেশ বুঝতে পারি বড়ঘরের কিছু নিষিদ্ধ কথা এই গল্পে বলা হয়েছে। গল্পটি এই রকম — খানদানি বংশের একজন মুসলিম জমিদার বাড়ির ঝির গর্ভে তাঁর ঔরসজাত জ্যেষ্ঠপুত্রকে স্বীকার করবেন না বলে সেই ঝি-সরিফন কোর্টে দাঁড়িয়ে জবানবন্দী দিয়ে আসতে বাধ্য হলো যে ছেলেটি (রমজান) তার জারজ সন্তান। গল্পের মধ্যেই আভাসে বিধৃত থাকে যে তৎকালীন সমাজে প্রজা কন্যা বা দরিদ্র পিতামাতার সুন্দরী কন্যা থাকলে তা জমিদারের ভোগ্য হবে। তবে জমিদার তাকে বিয়ে করবে কিন্তু স্ত্রীর সম্মান বা অধিকার দেবে না। সে ক্রীতদাসী হয়ে সংসারে থাকবে এবং জমিদার ও তার পরিবারের হুকুম তামিল করবে কারণ ইসলাম ধর্মের বিধি মোতাবেক তাকে বিবাহ করা হয়েছে। কিন্তু তার গর্ভের সন্তানরা কখনই পিতা হিসাবে জমিদারের পরিচয় দিতে পারবে না এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারও অর্জন করতে পারবে না। সে রকম সম্ভাবনা যাতে পরবর্তীকালে দেখা না দেয় সেজন্য সরিফন কোর্টে দাঁড়িয়ে জবানবন্দী

দিতে বাধ্য হয় — রমজান তার জারজপুত্র। তারপর গ্রামে ফিরে এসে সরিফন বিষপান করে আত্মহত্যা করে লজ্জায় এবং রমজানকে চিরকালের মতো উধাও হয়ে যেতে হয় গ্রাম থেকে। এই ছিল গল্পটির মোটামুটি বিষয়। আমাদের কচি মনে গল্পটি ভীষণভাবে দাগ কাটে। ধর্মীয় মতে বিয়ে করবে কিন্তু স্ত্রীর সম্মান দেবে না বা অধিকার দেবে না আবার তার আপন ঔরসজাত সন্তানকেও স্বীকার করবে না উপরন্তু জারজ বলে জবানবন্দী দেওয়াবে কোর্টে। আমরা কিছুতেই কি যেন একটা বিষয় মানতে পারছিলাম না। ভাই বোনে এইসব কথাই বলছিলাম। তখন বুঝিনি কিন্তু এখন বুঝি ধর্মের আড়ালে সমাজ ব্যবস্থার এই অসঙ্গতিটাকে আমরা মানতে পারছিলাম না। গল্পটি পড়ে সমাজের আঠাকাঠিতে আটকানো মা ও ছেলের অসহায় অবস্থাটা আমাদেরকে সেদিন বেশ ভাবিয়েছিল। সেই সন্ধ্যাটি আমরা যে ভুলিনি তা পরবর্তী সময়ে প্রমাণ হয়। এরপর বহুদিন কেটে গেছে। আমি তখন ইডেন কলেজে অধ্যাপনা করছি। বন্ধুত্ব হয়েছে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক কাজী সালেমা আখতারের সঙ্গে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মুসলিম মহিলা লেখকদের কথা বলতে গিয়ে বেগম আফসারুন্নেসার নাম বলি। এই নামটি আমি ভুলিনি। মাত্র একটি গল্প পড়ে এভাবে মনে থাকার কথাও নয়। কিন্তু একটি অজপাড়াগাঁয়ে বসে কৈশোর বেলায় পৃথিবীকে জানবার সেই আকাঙ্ক্ষায় তাঁর গল্পটি নিশ্চয়ই আমার মনে অমোচনীয় ছাপ ফেলেছিল। কাজী সালেমার বিনম্র হাসি — তিনি আমার মা। আমি ঔৎসুক্যে লাফিয়ে উঠি। এই মানুষটিকে কোনদিন আমি দেখতে পাব ভাবিনি। কথায় কথায় দিনে দিনে জানতে পারি আফসারুন্নেসা ছবি আঁকেন, সেতার বাজান, অসাধারণ রন্ধন পটিয়সী — দেশী বিদেশী খাবার তৈরিতে সিদ্ধহস্ত, সূচীশিল্পে তাঁর পারদর্শিতা মানুষকে ডেকে দেখানোর মতো। আর দরিদ্র সেবা? তাঁর বাড়িতে গেলেই দেখতে পেতেন। একটি দরিদ্র বালককে মানুষ করে তার বিয়ে দিয়ে তার স্ত্রী ও তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে আনন্দে তিনি সংসার করতেন। বাড়ির একটি অংশে তাদের পাকা ঘর করে দিয়েছেন যাতে তারা ইচ্ছামতো আলাদা থাকতে পারে। অথচ এসব কিছু করার তাঁর প্রয়োজন ছিল না। কারণ তাঁর তিন মেয়ে ঢাকাতেই (কাজী সালেমা তো তাঁর পাশেই থাকেন বলা চলে) অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। জামাতারা সকলেই বড় চাকুরে। সুতরাং তিনি আপন প্রয়োজনে এই ছেলেটিকে ঐভাবে কাছে রেখেছেন এমন নয়। আরও জানি নিঃশব্দে দান ধ্যান করাটা তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্যেই পড়ে।

সালেমার কাছে তাঁকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করি। সেদিন আমার সেই ভাই

হাসান আজিজুল হক ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। তাকে বলতেই দেখি সেও নামটি ভোলেনি এবং সেও আমার সঙ্গী হয়। ঠিকানা অনুযায়ী আমরা দু'জন তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হই। সম্ভ্রান্ত চেহারার গোলগাল ফর্সা মানুষটি হাসিমুখে এসে বসেন। পরনে সাদা শাড়ি, মাথায় আচল। আমাদের জন্মস্থান বর্ধমান শুনে তিনি কাটোয়ার গল্প করতে থাকেন। স্বামী ব্রিটিশ আমলে কাটোয়ার এসডিও ছিলেন। অনেক কথার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, তিনি খুব নিষ্ঠাবান ধার্মিক মানুষ। তাঁর কণ্ঠস্বরটি একটু কাঁপা কাঁপা যে জন্য তাঁকে খুব কোমলস্বভাবী মানুষ বলে মনে হয়। ফেরবার পথে রিক্সায় উঠে হাসান বলে — এই রকম ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ধর্মের অসঙ্গতিগুলো নিয়ে ঐরকম শ্লেষাত্মক গল্প লিখতে পারে বলে মনে হয়? এরপর তাঁর প্রকাশিত দু'খানি গল্পের বইয়ের ওপর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একটি দীর্ঘ আলোচনা লিখি এবং বাংলা একাডেমীর একজন কর্মকর্তাকে লেখাটি পড়তে দিয়ে জিজ্ঞেস করি — এই নাম তার পরিচিত কিনা। না, পরিচিত নয়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এঁর অনেক আগেই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু লেখিকা এখন আর লেখেন না জেনে তিনি বললেন, যাঁরা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন তাঁদের পুরস্কৃত করা বাংলা একাডেমীর নীতিতে নেই। এই নীতিটা ভাল না মন্দ সে বিচারে না গিয়েও বলা যায়, প্রতিভার স্বীকৃতির ব্যাপারটি কি সমসাময়িক? তা কি হতে পারে? তাহলে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয় কেন ? বেগম আফসারুন্নেসার দু'খানি গল্পের বই আছে। অপ্রকাশিত লেখাও আছে। সেই সমস্ত লেখা পড়লেই বোঝা যায় তৎকালীন আপন সমাজকে দেখবার স্বচ্ছদৃষ্টিভঙ্গি — বিশেষ করে ধনী ও দরিদ্রের সামঞ্জস্যহীন অবস্থান বিবরণে ধর্মীয় অনুশাসনের নামে পয়সাওয়ালা মানুষদের ও ধর্মীয় নেতা — মওলানাদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণে তাঁকে তাঁর গল্প একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করে। জেনেছি তিনি ব্রিটিশ আমলের এক মন্ত্রীর কন্যা, পরবর্তীকালে একজন আমলার ঘরনী কিন্তু কি আশ্চর্য, তিনি তাঁর আপন পায়ের তলার মাটিকেই খুঁড়েছেন সবচেয়ে বেশি। তিনি যে সময়ে গল্পগুলো লেখেন সে সময়ে বাঙালী মুসলিম পরিবার নিয়ে গল্প তেমন লেখা হয়নি। ফলে পূর্ববঙ্গের ধনী বা দরিদ্র গ্রামীণ জীবনের মুসলিম পারিবারিক চিত্র তখন অনুদ্ঘাটিতই ছিল। আর গল্পগুলো তথাকথিত নয়, খুব কাছ থেকে দেখা তাঁর আপন পায়ের তলার মাটিকেই নিয়ে লেখা। ধর্মীয় অপব্যাখা, অসঙ্গতি, হিল্লেসরা বিয়ে, রোজা রাখার ব্যাপারে গ্রামের মৌলভীর গরিবদের ওপর হুকুম জারি, ঘরের দাসী বাঁদি বা চাকরদের প্রতি অমানবিক ব্যবহার বিবৃত করে যে

গল্প তিনি লিখেছিলেন তা তৎকালীন বিচারে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মতই মনে হয় আমার। তাঁর কিছু গল্প এ কালেও সরাসরি মৌলবাদীদের আঘাত হানতে পারে। তবু এই মানুষটিকে আমরা জানলাম না। এই লেখিকা উনআশি বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন।

আশ্চর্য আতিশয্যবিহীন অনাড়ম্বর জীবনের মতই ছিল তাঁর লেখা সহজ, সরল। কিন্তু বিদ্রূপে শ্লেষে সেই লেখাই ছিল এতটাই অমোচনীয় যে আমাদের কৈশোর কালের একটি সন্ধ্যা স্মৃতিতে জেগে রইলো।

[পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানের জন্য প্রেরিত। লেখক ছিলেন ঢাকা ইডেন কলেজের অধ্যাপক।]

জনার্দন চক্রবর্তী ঃ আদর্শ শিক্ষক ও মানুষ

অমূল্যভূষণ গুপ্ত

মাননীয় সভাপতি, মাননীয়া বিশিষ্ট অতিথি,
সুরাহা-সম্প্রীতির শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী,

আজ ফাল্গুনের এই অপরাহ্নবেলায় আমার প্রথম কথা হল ধন্যবাদজ্ঞাপন, ধন্যবাদ দিই সুরাহা-সম্প্রীতির কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে অধ্যাপিকা ডঃ মীরাতুন নাহারকে যাঁর আগ্রহাতিশয্যে 'রোকেয়া স্মারক বক্তৃতা' দেওয়ার এই সুযোগ পেয়েছি। বক্তৃতার মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে স্মরণ করি বাংলার সেই মহীয়সী মহিলা বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে যিনি এক অন্ধকারময় যুগে নারীশিক্ষা, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে, একাকিনী অসীম সাহসে সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও আলোকবর্তিকারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন — প্রকৃত অর্থেই যিনি ছিলেন lady with thc lamp আলোকনন্দিনী। এই সুযোগে তাঁর উদ্দেশ্যে রেখে যাই আমাদের শ্রদ্ধাবিনম্র প্রাণের প্রণতি।

যাঁর স্মরণে এই বক্তৃতার আয়োজন তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে তা হল — জনার্দন চক্রবর্তী ঃ আদর্শ শিক্ষক ও মানুষ। এক আকস্মিক যোগাযোগে এ বছর বিস্মৃতপ্রায় এই মহৎপ্রাণ শিক্ষাগুরুর জন্মশতবার্ষিকীও বটে। কাজেই এ আমার গুরুর স্মৃতিতর্পণ। কিন্তু কে এই জনার্দন চক্রবর্তী?

বহিরঙ্গের পরিচয় ব্যক্তির মানসজগতকে উন্মুক্ত করে না বটে, তবে পরিচয়ের সূত্রপাত বহিরঙ্গ দিয়েই শুরু হয়। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি সে আজ অর্ধশতবর্ষের আগেকার কথা। পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। জনার্দনবাবু ছিলেন তখন ঐ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, একই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগেরও অধ্যাপক। বি.এস্-সি অনার্স ক্লাশের ছাত্রদের, বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্লাশ করার প্রশ্ন ওঠে না। সে বিচারে অধ্যাপক চক্রবর্তী আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন না। কিন্তু আমি তাঁকে পেয়েছিলাম অন্য এক ভূমিকায়, আরও অনেক কাছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবস্থায় থাকতাম ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। আর অধ্যাপক চক্রবর্তী ছিলেন হস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, থাকতেন সপরিবারে হস্টেল ক্যাম্পাসেই, সুপারিনটেণ্ডেণ্টের নির্দিষ্ট কোয়ার্টার্সে। ফলে দীর্ঘ প্রায় দু'বছর খুব কাছ থেকে প্রত্যহ তাঁকে দেখতাম, অহরহ সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছিলাম। কথায় বলে, Familiarity breeds contempt অর্থাৎ সান্নিধ্য নাকি ঘৃণার জন্ম দেয়। কিন্তু, এক্ষেত্রে ব্যাপারটি হয়েছিল ঠিক উল্টো, যত সান্নিধ্য পেয়েছি ততই আকৃষ্ট হয়েছি। যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নেই। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি কলকাতা মুরলীধর গার্লস্ কলেজের অধ্যক্ষপদে বৃত হন। পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। আর প্রেসিডেন্সীতে বদলি হওয়ার আগে তিনি চট্টলভূমির সরকারী কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।

যতদূর মনে পড়ে, তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ১৯৬৫-তো। তখন উনি থাকতেন উত্তর কলকাতার গড়পাড়ের কাছে CIT ফ্ল্যাটে। একদিন সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে ঐ ফ্লাটে গিয়েছিলাম। তখন ওঁর জীবনের অপরাহ্ন বেলা। পরে জেনেছি, ১৯৮৭-তে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কেমন দেখতে ছিলেন অধ্যাপকপ্রবর? প্রায় ছ'ফুট লম্বা, দীর্ঘদেহী, অনিন্দ্যকান্তি, স্বর্ণাভ গাত্রবর্ণ - যেন আকাশের বিদ্যুৎকে বেটে সর্বাঙ্গে প্রলেপ দেয়া হয়েছে — লম্বিত বাহু, উজ্জ্বল দুই চোখ — বেশভূষা সাধারণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি, ভাবে স্থিতধী, যখন হাঁটেন তখন গতিতে থাকে একটা ছন্দোময়তা — সুস্পষ্ট উচ্চারণ, সুরেলা কণ্ঠের বাগ্‌বিন্যাস শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। প্রথম দর্শনে আমার তরুণমনে মোটামুটি এই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ। অধ্যাপকপ্রবরের বয়স তখন ঠিক পঞ্চাশ।

আজ অর্ধশত বৎসরের ব্যবধানে স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে স্থূল-সূক্ষ্ম অনেক ঘটনার কথাই মনে পড়ছে — সেসব ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেয়ার এখানে কোন অবকাশ নেই। বোধ করি. কোন প্রয়োজনও নেই। স্মৃতি রোমন্থন করে গুটিকয়েক পরিবেশন করব যা থেকে বহিরঙ্গের বেড়া ডিঙ্গিয়ে আপনারা তাঁর অন্তর্জগতের এক ঝলক পরিচয় পেতে পারবেন।

স্নেহময়ী মায়ের স্নেহাঞ্চল ও কলবর মুখরিত গৃহের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আমি তখন সদ্য ইডেন হিন্দু হস্টেলে আবাসিকরূপে যোগ দিয়েছি। শয্যাতাগের পর সযত্ন প্রচেষ্টায় বিছানা-মশারি পরিপাটি করে রাখা ব্যাপারটি তখনও তেমন

রপ্ত হয় নি। এমন সময় একদিন হঠাৎ আমাদের হস্টেল সুপার অধ্যাপক চক্রবর্তী আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। চেয়ারে বসে পড়ছিলাম, সন্ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়াতেই দেখি, ঐ প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব আমার বিছানার অবিন্যস্ত চাদর ও মশারিটি ঠিক করে দিতে দিতে বলছেন — 'তোমাদের কতো কষ্ট, স্নেহরূপা মা নেই এখানে। আমি ত ঠিক মায়ের ভূমিকা পালন করতে পারব না।' লজ্জায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এ আমি কাকে দেখছি -- জ্ঞানঋদ্ধ অধ্যাপকপ্রবর আমার কাছে তখন মায়ের বিকল্প হয়ে 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতঃ', যেন বাৎসল্যের এক প্রতিমূর্তি। জীবনশিক্ষার প্রথম পাঠটি তিনি সেদিন আমায় দিয়ে গেলেন যার সন্ধান কোন সিলেবাসে বা পুঁথির পাতায় মিলবে না। মনে মনে শ্রদ্ধায় শিক্ষাগুরুর কাছে আনতশির হলাম। কালস্য কুটিলা গতি। পরবর্তীজীবনের একটি অধ্যায়ে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকরূপে আমাকে দীর্ঘকাল ইনস্টিটিউটের হস্টেল সুপারের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে এবং গুরুপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে যথেষ্ট ফলও পেয়েছি।

দ্বিতীয় ঘটনাটিরও আমি নায়ক। বি.এ-বি.এস-সির টেস্ট পরীক্ষা আসন্ন। স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার্থী আবাসিকদের মধ্যে পড়াশোনার ধুম পড়ে গেছে। আমিও এর ব্যতিক্রম নই। রাতের আহার শেষে পড়তে পড়তে রাত কখন গভীর হয়ে প্রত্যূষের পানে ছুটে চলেছে খেয়াল নেই — নিশুতি রাতে হঠাৎ জানালার পাশের গাছটির ডাল নড়ে ওঠার শব্দে সম্বিৎ ফিরতেই দেখি বৃক্ষশাখায় একটি মানুষ, ঘড়িতে তখন রাত তিনটে। নিজেকে আড়াল করে ওঁৎ পেতে রইলাম, দেখি লোকটি কি করে। বৃক্ষশাখা থেকে রেইনওয়াটার পাইপ, রেইনওয়াটার পাইপ থেকে সটান হস্টেলের দোতলার ভেতরের বারান্দায়। প্রায় সব আবাসিকের কক্ষই হাট করে খোলা। কাজেই, আর দেরী নয়, হয়েছে সময়। ঘর থেকে বেরিয়ে বিদ্যুৎগতিতে জাপটে ধরলাম লোকটিকে, সঙ্গে 'চোর চোর' চীৎকার। মুহূর্তে ওকে ঘিরে আবাসিকদের একটা জটলা শুরু হয়ে গেল। লোকটি সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ যুবক, শীর্ণকায়, চোখেমুখে দারিদ্র্যের ছাপ, ছিন্ন-মলিন বেশ। আমাদের জেরায় জেরায় জেরবার হয়ে সে কি বলেছিল আজ আর তা মনে নেই, দু-চারটে চড়চাপড় তার ভাগ্যে জুটেছিল কি না তা-ও স্মরণে নেই। ওকে নিয়ে কি করা উচিত — এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। এদিকে রাত ফর্সা হয়ে এসেছে। সাব্যস্ত হল, ওকে জনার্দনবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তা-ই হল। কয়েকজন মিলে ওকে নিয়ে চললাম সুপারের কোয়ার্টার্সে — আগে আগে অর্বাচীন এই বক্তা। সুপার বেরিয়ে এলেন, আমাদের কথা শুনে যা বোঝার

বুঝলেন এবং দ্রুত লোকটিকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে আমাদের বললেন 'তোমরা যাও'। নিরীহ এই 'যাও' কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা নির্দেশের ছাপ ছিল। তাই কৌতূহল চেপে বাধ্য হয়ে সবাই ফিরে এলাম। পড়াশোনা শিকেয় উঠল। ডজনখানেক জোড়া চোখ অর্জুনের লক্ষ্যভেদকেও যেন হার মানিয়ে সুপারের কোয়ার্টার্সের দিকে নিবদ্ধ। দশ মিনিট গেল, পনের মিনিট, আধঘণ্টা। দু'-একজন অতি উৎসাহী কোয়ার্টার্সের চারপাশে উঁকিঝুঁকি মারছে। হঠাৎ দেখা গেল, সুপার লোকটিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, তার হাতে নাতিবৃহৎ একটি পুঁটুলি, চোখ মুছতে মুছতে সে গেটপথে বেরিয়ে গেল।

গৃহাভ্যন্তরে চোরের সঙ্গে অধ্যাপকের কি কথা হয়েছিল তা আমাদের শ্রুতির আড়ালে। বুঝলাম চোরের কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে, পুঁটুলিই তার প্রমাণ। কিন্তু পুঁটুলির অভ্যন্তরভাগ আমাদের কাছে অদৃশ্য। জানা গেল না, তাতে কি কি ছিল। যেটুকু দেখা গেল, তা হল চোরের অশ্রুপাত — নিঃসন্দেহে আনন্দাশ্রু। অধ্যাপকের হৃদয়ের উষ্ণ পরশে বিগলিত চোরের হৃদয়ের মুক্তাবিন্দু। কেউ হয়তো বলবেন, হৃদয়ের এ পরিবর্তন সাময়িক। মানুষের জীবনের সব কিছুই তো সাময়িক — জীবনটাও কি সাময়িক নয়? ছোটবেলায় পড়েছিলাম পুণ্যশ্লোক হাজি মহম্মদ মহসীন ও এক চোরের কাহিনী। প্রত্যক্ষ করলাম, মহসীন আজও জীবন্ত।

হস্টেলে থাকাকালীন আমার হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ বলতে কিছুই থাকত না। কষ্টেসৃষ্টে, কোনরকমে হস্টেলের খরচ জোটাতাম। কিন্তু অধিকাংশ আবাসিকের হাতেই যথেষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ থাকতো। তারা তা নিরাপদে রাখার জন্য জনার্দনবাবুর কাছে জমা রাখতো এবং প্রয়োজনে চেয়ে নিত। আমার এক সহপাঠী তথা সহ-আবাসিকও তা-ই করতো। তার কাছে শুনেছি, যখনই কেউ টাকা চাইতে যেত তখনি সামনের ঘর থেকে অধ্যাপক 'অমুকের টাকাটা দাও তো' বলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতেন এবং মুহূর্তে অন্দরমহল থেকে টাকা এসে যেত। মজার কথা, পনের দিন পরেই হোক বা একমাস, এমন কি এক বছর পরে হলেও দেখা যেত, যে নোটগুলো জমা রাখা হয়েছিল, অবিকল সেই নোটগুলোই প্রত্যর্পিত হচ্ছে। কখনও এর ব্যত্যয় ঘটত না, অর্থাৎ প্রয়োজনের চরমতম মুহূর্তেও, এমনকি বড় নোট ভাঙ্গিয়ে প্রয়োজনে ছোট করার তাগিদেও, গচ্ছিত অর্থে অধ্যাপক তাঁর হস্তের স্পর্শ ঘটাতেন না।

তথাকথিত Pragmatist বা প্রয়োগবাদীদের কাছে মনে হতে পারে যে, গচ্ছিত অর্থ ঠিকঠাক থাকলেই ত হলো, অর্থহীন এই বাড়াবাড়ির কি প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে অধ্যাপকের দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, ঐ গচ্ছিত অর্থ তাঁর নয়, তিনি ওটির trust বা অছি মাত্র। সর্বান্তঃকরণে ওর শুদ্ধতা রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য। কেননা, ঐ রন্ধ্রপথেই দুর্নীতির শনি প্রবেশ করে। অসংখ্য ভ্রষ্টাচার ও ঘোটালার ঘটনায় কলুষিত বর্তমান সমাজ তথা রাষ্ট্রজীবনকে দেখলে আজ বুঝতে পারি যে, অধ্যাপকপ্রবরের দর্শনটি কতো তাৎপর্যময় ও মূল্যবোধে ভরপুর ছিল।

প্রায় শতাধিক তরুণ আবাসিক মাসের পর মাস একসঙ্গে ওঠাবসা, লেখাপড়া, আহারশয়ন করে। স্বভাবত মনোমালিন্য, পারস্পরিক অভিযোগ-দোষারোপ ইত্যাদি ঘটনা একেবারে বিরল ছিল না। নিজেরা মীমাংসায় অপারগ হলে বিষয়টি সুপার অবধি গড়াতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করে তিনি মীমাংসা করে দিতেন। কিন্তু, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। একবার একজনের অভিযোগ এতটা গুরুতর ছিল যে, অভিযোগ শুনেই তিনি তিরস্কারের ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষকে বলে দেন যে, কাজটি সে অন্যায় করেছে। আত্মপক্ষ সমর্থনে সে কিছু বলেছিল বটে, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। ঘটনার কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপকের কি মনে হয়েছে কে জানে? একদিন অভিযুক্ত ছেলেটির কাছে এসে বললেন, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে, অভিযুক্তের কথাই ঠিক, তাঁরই ভুল হয়েছিল। অনর্থক তিরস্কার করা তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি। সে যেন এতে কিছু মনে না করে। ছেলেটি তো থ। কে আর কবে তার কৃতকর্মের ভুল স্বীকার করে! তা-ও আবার সম্পর্ক যেখানে ছাত্র-শিক্ষকের! নিজের কাজের ত্রুটি স্বীকার করা মহত্বের লক্ষণ — যে মহত্ত্ব আজ সমাজজীবন থেকে দ্রুত অপসৃয়মান। আজ আমরা সবাই অপরের চরিত্র সংশোধনে ব্যস্ত, শুধু নিজেকে বাদ দিয়ে। কিন্তু নমন্তি ফলিনঃ বৃক্ষাঃ — ফলভারে বৃক্ষ অবনত, নমন্তি গুণিনঃ জনাঃ — গুণের ভারে গুণিজনও নত হন। একমাত্র শুকনো কাঠ আব মূর্খ ব্যক্তি ভাঙ্গে তবু নোয়ায় না — শুষ্কং কাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে। অধ্যাপক ছিলেন প্রকৃতই একজন গুণী।

শিক্ষক হিসাবে জনার্দনবাবু কেমন ছিলেন? এ কথার সরাসরি উত্তর দেয়া আমার পক্ষে কঠিন, কেননা আমি তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু তাঁর পদপ্রান্তে শিক্ষালাভের দুলর্ভ সুযোগ যাদের ঘটেছিল তাদের কাছে যা শুনেছি তা-ই আমার সম্বল। ছাত্রদের তিনি 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' পাঠ দিতেন. হাতের আঙ্গুলের মুদ্রায় এবং অবিস্মরণীয় সুস্পষ্ট উচ্চারণে পাঠদানকালে যেসব কথা বলতেন ছাত্রদের মানসপটে তা চিরতরে মুদ্রিত হয়ে যেত। বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যের অধ্যাপনায় তাঁর খ্যাতি শ্রেণীকক্ষের বাইরের জগতেও পরিব্যাপ্ত

হয়েছিল। জীবদ্দশায় তিনি বৈষ্ণবসাহিত্যের একজন authority বলে গণ্য হতেন। তাঁর রচিত 'শ্রীরাধাতত্ত্ব', 'চৈতন্য সংস্কৃতি' গ্রন্থগুলো শুনেছি আজও সমাদৃত। ইংরাজী, বাংলা, মৈথিল, সংস্কৃত ও গুজরাতি ভাষায় পারঙ্গম স্বনামধন্য এই অধ্যাপকের বাংলা সাহিত্যের ক্লাশগুলো কার্যত রূপ নিত তুলনামূলক সাহিত্যের ক্লাশে, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য থেকে সমান্তরাল ভাবের দীপ্তিমান সব উদ্ধৃতি যে ভাবাবেগে তিনি অনায়াসে উৎসারিত করতেন তা সবাইকে আপ্লুত করে পৌঁছে দিত এক অনাস্বাদিতপূর্ণ ভাবরাজ্যে, যে ভাবলোকের তিনিই তখন রাজাধিরাজ। কখন-সখন পাশ-ক্লাস পালিয়ে সে সুধারস আমিও আকণ্ঠ পান করেছি। সারস্বতসভায় তাঁর অনুপম সব বক্তৃতা শুনেও একই অভিজ্ঞতায় প্রাপ্তির থলিটি ভর্তি করেছি। এমন শিক্ষক সহজেই ছাত্রহৃদয়ে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও প্রীতির আসনটি বিছিয়ে ফেলেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জনার্দনবাবু ছিলেন 'সদা ছাত্রানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।'

আর হবে নাই বা কেন? তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে যেমন পঞ্চ 'ম'-কারের উপকরণ চাই, শিক্ষকতায় সিদ্ধির বন্দরে উত্তীর্ণ হতে হলেও তেমনি চাই পঞ্চ 'ব'-কারের উপকরণ। এই পাঁচটি ব-হল বিদ্যা, বিনয়, বাকপটুতা, বপু ও ব্যক্তিত্ব। ঈশ্বর জনার্দনবাবুকে এ সব কটিই অকাতরে দান করেছিলেন এবং প্রাপকও তাঁর সাধনায় সেগুলোর সম্যক প্রয়োগে কার্পণ্য করেন নি। অঙ্গুলিমেয় কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে, আজ শিক্ষাজগতের দিকে তাকিয়ে গুরু শব্দটির অর্থকে সচেতনভাবে প্রণিধান করা, বোধ করি, অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গুরু শব্দের অর্থ ভারি অর্থাৎ loaded - loaded with wisdom and knowledge। এ হল লঘুত্বের বিপরীত সাধনা। সদা প্রসন্নমুখ জনার্দনবাবু গুরুত্বের গরিমায় উদ্ভাসিত থাকতেন। 'গুরু' শব্দের দ্বিতীয় একটি অর্থ আছে। সেটি আরও ব্যঞ্জনাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। 'গু'-কার অর্থে অন্ধকারকে এবং 'রু'-কার অর্থে তার নিরোধককে বোঝায়। গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ, রুকারস্তন্নিরোধকঃ। আমার জীবন-অঙ্গনের অনেক অন্ধকারকে তিনি দূর করেছেন তাঁর প্রজ্ঞার উদ্ভাসে। আমি তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও এই অর্থে তিনি আমার শিক্ষাগুরু, শুধু আমার নয়, সমাজেরও শিক্ষাগুরু।

মানুষের জীবনে তিনটি এষণা বা আকাঙ্ক্ষা থাকে। এগুলো হল বিত্তৈষণা - বিত্তের আকাঙ্ক্ষা, যশৈষণা - যশোলিপ্সা এবং পুত্রৈষণা - অর্থাৎ বংশলতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার আকাঙ্ক্ষা। হয়তো বা জনার্দনবাবুরও ছিল, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তিনি কখনও সচেতন যশাকাঙ্ক্ষী বলে প্রতিভাত হননি, বরং তাঁকে প্রচারবিমুখ

ও যশে উদাসীন বলেই মনে হয়েছে। আমি ওঁর মধ্যে চতুর্থ আর একটি এষণাকে দেখেছি। সেটি হল শিষ্যৈষণা — শুধু পুত্রের মধ্যে নয়, শিষ্যের মধ্যেও বেঁচে থাকার আকুতি। শিষ্যদের তিনি পুত্রবৎ মনে করতেন। পুত্রের গৌরবে পিতা যেমন গৌরববোধ করেন, শিষ্যগৌরবে উনিও তেমনি গৌরববোধ করতেন। মানুষ সর্বত্র জয়লাভ করতে চায়, একমাত্র পুত্র ও শিষ্যের কাছে সে পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করে। 'সর্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ. পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।' শিক্ষাগুরু জনার্দনবাবুরও এই ছিল আন্তরিক বাসনা।

জনার্দন চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর সমদর্শিতা। কথায় বলে, পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ অর্থাৎ পণ্ডিতেরা সমদর্শী হন। কিন্তু এ অর্থে আমার মন সায় দেয় না। মনে হয়, শ্লোককার সমদর্শিতাকে পণ্ডিতের অন্যতম লক্ষণ বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ যতই ডিগ্রি বা উপাধিধারী হোন না কেন, যাঁর সমদর্শিতা নেই তিনি পণ্ডিত নন। এই বিচারে আমাদের আচার্যদেব একজন যথার্থ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন এবং তরুণ অধ্যাপকরূপেই তাঁর সমদর্শিতার খ্যাতি সারস্বত সমাজ ছাড়িয়ে সাধারণ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সংক্ষেপে একটি কাহিনীর উল্লেখ করি।

জনার্দনবাবু তখন চট্টগ্রাম কলেজে বাংলার অধ্যাপক। ইংরেজ আমল। অবিভক্ত বাংলা। লীগ মন্ত্রিসভা। শের-ই বঙ্গাল ফজলুল হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী। তিনি কয়েকদিনের সফরে চট্টগ্রাম আসছেন। মহামান্য অতিথিকে সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করছেন নানা প্রতিষ্ঠান। একটি সংবর্ধনার ব্যাপারে জনার্দনবাবু সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। মানপত্র লেখার দায় বর্তায় তাঁর উপরে। সংবর্ধনার স্থান শহর থেকে তিন চার মাইল দূরে এক গ্রামে। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ও শহরের গণ্যমান্যেরা সভামঞ্চ আলোকিত করে রয়েছেন। সম্ভবত মানপত্রের রচয়িতা বলে ধনমানহীন তরুণ শিক্ষক জনার্দনবাবুরও স্থান হয়েছিল তাঁদের পাশে। সভার নির্ধারিত সময় বিকেল চারটা। বিপুল জনতা সর্বজনবরেণ্য জননায়কের জন্য উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় অধীর।

নির্ধারিত সময় এল, চলেও গেল। কিন্তু প্রত্যাশিত অতিথি এলেন না। জানা গেল, কক্সবাজার থেকে আসার পথে চড়ায় স্টীমার আটকে গেছে। শুনে জনতার মধ্যে প্রচণ্ড কোলাহল। তাদের শান্ত করতে উদ্যোক্তাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। মঞ্চে ম্যাজিস্ট্রেট, কমিশনার, মহকুমা হাকিম, সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। কিন্তু জনতাকে শান্ত করা গেল না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। এমন সময় দেখা গেল, এক বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় অন্ধ মুসলমান যুবক মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। শিক্ষিত না হলেও সে সভাসমিতিতে যেত। অনেকে তাকে

রুখতে চাইলেও প্রবীণেরা তাকে মঞ্চের পুরোভাগে দাঁড় করিয়ে দিতেই সে জনতাকে শান্ত করতে খাস্ চাঁটগার চলতি ভাষায় ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিল যার সারমর্ম ঃ

"ভাই সকলেরা, তোমরা হামলা করছ কেন? .. বড় মিঞা সাহেব আসবেন বলে? দেশের মানুষ তাঁকে ভালবাসেন। তিনিও সকলকে ভালবাসেন। তিনি যখনই আসুন, আসলে পরে তাঁকে দেখবেন আপনারা। আর না-ই যদি বা আসতে পারেন, না-ই বা দেখলেন এবার তাঁকে। মনে-মনে তাঁর ভালবাসার কথা ভেবে যে যার কাম-কাজ ঠিকমতো ইমান মতো করে গেলেই তাঁকে ভালবাসা হবে।

"তাঁর কথা শুনবার বড় হাউস ছিল আপনাদের, কেমন? এ সভায় অনেক মানুষ এসেছেন যাঁরা খুব ভাল কথা বলতে জানেন যা শুনলে আপনাদের দিলে জোর আসবে।" "এই জমায়েতে হাজির আছেন, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের জোনার্দন-পর্‌ফেসার যিনি হিন্দু-মুসলমান ছালিয়াদের একচোখে দেখেন।"

জনার্দনবাবুর সমদর্শিতার কথা অন্ধেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। যুবকটিরও তারিফ করতে হয়। "হিন্দু-মুসলমানকে একচোখে দেখা যায় এমন একটি জীবনাদর্শে বাংলার মুসলিম-গরিষ্ঠ অঞ্চলের অধিবাসী শিক্ষালোকবঞ্চিত একটি অন্ধ মুসলমান যুবকের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল এবং নিজস্ব প্রাণের ভাষায় তার বেঁচে থাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণাটিকে সে যেন কেমন করে ধরতে পেরেছিল। এ যেন পাঁচশো বছর আগে বাংলার আদি গীতিকবির সেই শাশ্বত সঙ্গীত —

"শোনরে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

জনার্দনবাবুর সমদর্শিতার স্বীকৃতি বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুলের কথায়ও পাওয়া যায়। একবার চট্টলভূমিতে কবি কিছুদিন কাটিয়েছিলেন এবং তখন একাধিকবার জনার্দনবাবুর বাসায় তিনি এসেছেন। প্রথমবার অসময়ের অতিথি হয়ে দুপুর রাতে দলবল নিয়ে। বললেন — জানেন তো, আমি বাউল, ভবঘুরে। সফরে বেরিয়েছি। ইসলাম ও হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গম এই চাটগাঁ শহরে সব সম্প্রদায়ের যুবকদের সঙ্গে মিশে বুঝলাম, বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তারা ভালবাসে। মানুষও উদার সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। কলেজের পড়ুয়ারা দরদ দিয়ে বাংলা পড়ে এবং তাদের ওস্তাদ আপনাকে তারা ভালবাসে। আপনার হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীস্টান অনেক সাক্‌রেতের সঙ্গে চেনাশুনা ও ভাব বিনিময় হল। ভাবলাম, ওস্তাদজীই বা বাদ যাবেন কেন? ...একটা কথা

বলে যাই, ভাই। যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার হাওয়া দেশময় বইছে তাকে রুখতে হলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে তার প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে হবে। আপনি নিষ্ঠা দিয়ে তা শুরু করেছেন দেখে খুশীতে প্রাণ ভরে গেল। আপনি রইলেন বাংলার এই প্রত্যন্তসীমায় আমাদের একজন ঘাটিয়াল — আমাদের ভাবের ভাবুক, একই রসের রসিক।"

মধুমাসে পল্লবিত না হলে নাকি নিদাঘে ফলপ্রসব করা যায় না। আমি জনার্দন-জীবনের নিদাঘোত্তর পর্বে, ফলভারে অবনত বৃক্ষরূপেই তাঁকে দেখেছি, পল্লবিত হওয়ার মধুমাসগুলোর সন্ধান রাখিনি, রাখা সম্ভবও ছিল না। এতোক্ষণ আমরা সেই জনার্দনবৃক্ষের অমৃতফলের কথঞ্চিৎ আস্বাদন করলাম। এবার উৎস-সন্ধানের পালা।

ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে আমরা যেমন শেষ অবধি পৌঁছে যাই উত্তুঙ্গ হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহে, তেমনি জনার্দন জীবননদীর ধারাটি অনুসরণ করলে গিয়ে পৌঁছবো শিখরচারী মনুষ্যরূপী একাধিক হিমবাহে যাঁদের কথা ও চরিত্র অনুপম দক্ষতায় ও জীবন্ত ভাষায় তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর 'স্মৃতিভারে' নামের এক অসামান্য গ্রন্থে যেখানে স্মৃতিলোকের দুর্বার ঘটনাবলী সব লিপিবদ্ধ আছে। আমার সাধ্য কি তার সবগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরি। সেই সব শিখরচারী মানুষগুলোর মধ্যে যেমন আছেন তাঁর মহাপ্রাণ পিতৃদেব লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী, বাঁশঝাড়ে-চাপা একখানামাত্র খড়ের ঘরের মালিক দরিদ্র কাশেম মৌলভী, স্বগ্রাম সেনহাটির পাঠশালার পরমতসহিষ্ণু, উদার ছাত্রবৎসল মুসলমান গুরুমশাই, পিতৃ-মামলার প্রতিপক্ষ প্রতাপশালী গাঁতিদার বড় মোল্লা, সেনহাটি স্কুলের হেডপণ্ডিতমশাই, সচল মূর্তমহিমা হেডমাস্টার নেপালবাবু এবং দৌলতপুর কলেজের শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, তেমনি আছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিস্মরণীয় সব সারস্বতসাধক — 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র ইতিহাসখ্যাত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন, ইংরেজি ভাষার কিংবদন্তী অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রখ্যাতনামা বহুভাষাবিদ্ অধ্যাপক ডঃ তারপুরওয়ালা এবং আরো অনেকে। সেসব কাহিনী কান পেতে শুনতে হয়, মন পেতে ভাবতে হয়। সেগুলো মানুষের মনুষ্যত্বে উত্তরণের কাহিনী, এক-একটি নিটোল মুক্তাবিন্দু, মনকে কলুষমুক্ত ক'রে পবিত্র করে, চেতনাকে সজোরে নাড়া দেয়। এই সব মনুষ্যরূপী হিমবাহের গলিত নীহারেই জনার্দন জীবননদীটি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তৃষিত ছাত্রসমাজের ঘাটে ঘাটে প্রাণবারি বয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁদের গততৃষ্ণ করে তুলেছিল।

এবারে কাহিনীগুলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। একদিকে সময়ের সংক্ষিপ্ততা, অন্যদিকে ধৈর্যের সীমাবদ্ধতা। আমরা তাই পাঠশালার গুরুমশায়ের কাহিনী দিয়ে শুরু করে ভাটির টানে সরাসরি চলে যাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুমশায়ের কাহিনীতে, মধ্যবর্তী কাহিনীগুলো অনুক্তই থাকবে। আশা করব, উৎসাহী গৌড়জন 'স্মৃতিভারে' পড়ে নিয়ে 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

প্রথমটি গত শতাব্দীর প্রথম দশকের ঘটনা। সেনহাটির হিন্দুপল্লীর চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসে। পাঠশালার গুরুমশাই ছাত্রবৃত্তি-পাশ গৌরকান্তি প্রৌঢ় মুসলমান। জনার্দনবাবু তখন ঐ পাঠশালার ছাত্র, তবে তখনও কাগজ ধরেন নি, অর্থাৎ তালপাতা পর্ব চলছে। হঠাৎ একদিন গুরুমশাই ঘোষণা করলেন, পরদিন তাঁর কাগজ-ধরা।

সুধীমণ্ডলী, সঞ্জয়রূপী আমি এখন সরে দাঁড়াব। কথা বলবেন স্বয় জনার্দন —

সারাদিন ধরে আসন্ন উৎসবের আয়োজন চলল। এল এক পয়সায় তিনটি লাল বেলে কাগজ, দু পয়সায় একটা কাঁচের বোচনো দোয়াত — যা উপুড় করলেও কালি পড়ে না, এক পয়সায় পাখির পালকের পেন কলম, এক পয়সায় তিনটি JBD কালির বড়ি। সারস্বতসাধনার উপাদান কিনতে সাকুল্যে পাঁচটি নগদ পয়সা খরচ হয়ে গেল।

সংগৃহীত হল গুরুবরণের যৎকিঞ্চিৎ উপচার। মোটা থানের ধুতি একখানি, এক টাকা মূল্যের। সাদা চাদর একটি, দশবারো আনা দাম। এই হল গুরুবরণের জোড়, ধুতি-চাদর! গুরুদক্ষিণা, মহারাণী ভিক্টোরিয়া-মুদ্রাঙ্কিত চাঁদির গোটা টাকা একটি, পূর্ণ রজতখণ্ড। তিন-চার আনা মূল্যের পেতলের রেকাবি একখানি। তাতে গুরুর নৈবেদ্য। এক টাকার সন্দেশ বত্রিশটি, ফাউ একটি।

ভালো ঘুম হল না আমার আগের রাতে। ঔৎসুক্যে অর্ধনিদ্রায় অনিদ্রায় রাত কেটে গেল। বাবা, সকাল যে হয়ে এল। আজ যে আমার কাগজ-ধরার...। তা তো ধরবি, সকাল হোক, এখনও তো বাইরে আঁধার। অনুনয়ের সুরে বললাম, গুরুমশাই আজ যদি পাঠশালায় না আসেন।

বাবা শয্যাত্যাগ করলেন কিছু আগেই। তাঁর অভ্যস্ত আবৃত্তি শুরু হল — প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রাম্ অনুবর্তয়িষ্যে ইত্যাদি। ধারণাগম্য না হলেও পিতৃচিত্তের একটি আকুতি আমার অন্তর স্পর্শ করল। বললেন, — চল্, তোকে নিয়ে একেবারে গুরুমশায়ের বাড়ি গিয়ে কাগজ ধরিয়ে আনি।

পিতাপুত্র যাত্রা করলাম গুরুগৃহের অভিমুখে, ব্রাহ্মমুহূর্তের আলো-আঁধারে।

...দেখতে দেখতে গ্রামের প্রত্যন্তভাগে মুসলমান পল্লীতে এসে পড়া গেল। গুরুমশাইয়ের পুকুরের পাড়ে এসে একটা উদাত্ত-গম্ভীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। সর্বনাশ, এ-যে গুরুমশাইয়ের কণ্ঠ। কিন্তু এমন মধুর আবৃত্তি নামতাপাঠের সময়ও তাঁর কণ্ঠে শুনি নি। সরল বিশ্বাসে বাবাকে প্রশ্ন করলাম, — গুরুমশাই কি চণ্ডীপাঠ করছেন? বাবা হেসে বললেন, — ঠিক চণ্ডী নয়, তবে ওঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানশরীফ্ পাঠ করে আজান দিচ্ছেন। 'আল্লাহ্ আকবর' — আমার প্রথম শ্রুত সেই আজানের ধ্বনি সেদিন বড়ো মধুর মনে হয়েছিল।

আজানের সুর থেমে গেলে কিছুকাল ইতস্তত করে বাবা গলায় খাঁকার দিলেন, কতকটা নগর সভ্যতায় দর্শনার্থীর কার্ড পাঠানোর মতো। পরিচিত কণ্ঠের খাঁকার শুনে গুরুমশাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। সম্ভ্রম ও আন্তরিকতায় ভরা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, — কি সমাচার, ছোটবাবু? আমাকে এবং আমার হাতের দ্রব্যসম্ভার দেখে সব অনুমান করে নিলেন আমার ছাত্রবৎসল গুরুদেব। সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, — বাবাকে একেবারে ধরে নিয়ে এসেছ গুরুমশাইয়ের বাড়ীতে? তা বেশ করছ, বাবাজী।

বাবা বললেন, — 'গুরুমশাই, তোমার ছাত্রের হাত থেকে এই সামান্য গুরুদক্ষিণা গ্রহণ কর। এখানেই তাকে আশীর্বাদ করে কাগজ ধরিয়ে দাও।' গুরুমশাই প্রসন্নমুখে হাসিমুখে হাত পেতে ধুতিচাদর ও টাকাটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু সন্দেশের আধারটি আধেয় সহ পাঠশালায় নিয়ে যাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। বাবা দু'একবার পীড়াপীড়ি করে বললেন, এগুলি তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য এনেছি, গুরুমশাই। তাদের দিয়ে দাও। গুরুমশাই তাঁর ছাত্রকে-দেওয়া পূর্বনির্দেশ বহাল রাখলেন। কেন, তখন তা বুঝতে পারিনি।

তিনজনের একটি ছোট শোভাযাত্রা গুরুমশাইয়ের বাড়ি থেকে পাঠশালা অভিমুখে চলল। অগ্রে পশ্চাতে আমার পিতৃযুগল, মাঝখানে উপকরণ-পাণি আমি। একের আত্মজ, অপরের জ্ঞানজ সন্তান। একজন হিন্দু, অপরজন মুসলমান। ত্রয়ী-মূর্তি যখন পাঠশালা গৃহে উপনীত হলাম তখন আমাদের তাৎপর্যপূর্ণ আবির্ভাবে অকস্মাৎ সারস্বত-কাকলীর ঐকতান স্তব্ধ হল।

গুরুমশাই নির্দেশ দিলেন আমাকে, রেকাব থেকে নিজহাতে সাথীসঙ্গীদের মধ্যে সন্দেশ বিতরণ করতে। বুঝতে পারলাম, আমাদের ত্যাগী নির্লোভ গুরুদেব কেন নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য এই উপচার গ্রহণ না করে পাঠশালায় ফিরিয়ে আনতে বলেছিলেন। বিতরণের আনন্দ আমাকে অভিভূত করেছিল। পরিতৃপ্ত

পাঠার্থি-বন্ধুদের প্রীতি ও সদিচ্ছা নিশ্চয়ই আমার আত্মিক কল্যাণসাধন করেছিল, আমার সারস্বত জীবনের সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তে যা ছিল গুরুমশাইয়ের অভিপ্রেত। আমিও শিক্ষণব্রতী। প্রশ্ন জাগে, এই গুরুমশাইয়ের উত্তরাধিকার কি আমাদের মধ্যে বর্তেছে? আচার্য আমরা, আচরণ দিয়ে সত্যকে কি তুলে ধরতে পেরেছি একালে?

এইবার আসল উৎসব — আমার কাগজ-ধরা। গুরুমশাইয়ের আদেশে বাবাকে এবং বাবার আদেশে গুরুমশাইকে যথাক্রমে প্রণাম ও আদাব জানালাম। দুই গুরুই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বেলে কাগজটি গুরুমশাই সমান্তরাল করে ভাঁজ করলেন। তারপরে নতুন কলমটি ছুরি দিয়ে নাতিসূক্ষ্মাগ্র করে কেটে নিলেন। নতুন দোয়াতের নতুন কালিতে নতুন কলম চুবিয়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। পরে কাগজের শিরোদেশে ধীরে ধীরে লিখলেন, এলাহি ভরসা। তাঁর নিজের প্রাণের কথা লিখে একটু মাথা নোয়ালেন।

তারপরে সেই পংক্তি মুড়িয়ে মুক্তার পাঁতির মতো পরিষ্কার নির্ভুল করে লিখলেন, শ্রীদুর্গা শরণম্। লিখে সস্নেহে মুষ্টিতে আমার হাত ধরে শ্রীদুর্গা শরণম্-এর সমস্তটার উপর একবার আমার কলম ঘুরিয়ে আনলেন। স্নেহপূত সেই স্পর্শ আমার অঙ্গে রোমাঞ্চের সঞ্চার করল। তারপর আরও অতিরিক্ত পাঠ লিখেছিলেন। জীবনসায়াহ্নে সে কথাগুলি আর মনে নেই। তবে গুরুমশাইয়ের অবিস্মরণীয় কটি কথা সেদিন বুকের পাঁজরা কেটে লেখা হয়ে গিয়েছিল। সেই কথাগুলি এই —

বাবাজী, প্রথমে আমি যা লিখেছি, এলাহি ভরসা, ও-টি আমার কথা। ও-টি তুমি লিখবে না! পরে যেটা লিখেছি, শ্রীদুর্গা শরণম্, ঐটিই তুমি লিখবে। সব-কিছু লেখার আগে ঐ-কথা দিয়ে আরম্ভ করবে। তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তাঁদের ইষ্ট ঐ মন্ত্রে। প্রথম কথাটি অর্থাৎ এলাহি ভরসা আমার। দ্বিতীয় কথাটি অর্থাৎ শ্রীদুর্গা শরণম্ তোমার। কিন্তু বাবাজী মনে রেখো, দুটি কথাই এক। অর্থাৎ গুরুমশাইয়ের সেদিনকার প্রতিপাদ্য ছিল,

এলাহি ভরসা = শ্রীদুর্গা শরণম্

সারস্বতসাধনায় আর একটু অগ্রসর হলে বীজগণিতের সমীকরণ শিখেছিলাম। কিন্তু আমার ইসলামধর্মাবলম্বী, পরমতসহিষ্ণু, রুচিমান, উদার, ছাত্রবৎসল গুরুমশাইয়ের শেখানো প্রথমতম সমীকরণ তাঁর মতো করে আজ কে শেখাবেন এই দেশে? স্বাধীন ভারতে বসে ভাবছি আজ, আমার মুসলমান গুরু আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক দেশেরই মানুষ। সেই ভারত কোথায়? সে মানুষই

বা কোথায় গেল?

* * *

দ্বিতীয় কাহিনীটির নায়ক হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গুরুমশাই। জনার্দনবাবু তখন স্নাতকোত্তর এম. এ ক্লাশের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন স্বর্ণযুগ, স্যর আশুতোষ যুগ। বাংলার বাঘ, বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রে বিদ্যার সারথি, স্যর আশুতোষ দেশ বিদেশের সব সারস্বত সাধকদের ড. সি. ভি. রামন, ড. সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ড. হীরালাল হালদার, ড. গণেশপ্রসাদ, ড. জাহাঙ্গীরজী সোরাবজী তারাপুরওয়ালা প্রমুখ মনীষীর দল। প্রখ্যাতনামা বহু ভাষাবিদ্ এই তারাপুরওয়ালাই আমাদের আলোচ্য গুরুমশাই।

জনার্দনবাবু ভর্তি হয়েছিলেন ইংরেজি এম. এ ক্লাশে। কিন্তু ঘটনাচক্রে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের অনুরোধে যোগ দিলেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে। বাংলার এম. এ-তে তখন আর একটি ভারতীয় ভাষাও নিতে হত, দুটি পত্র, দুশো নম্বর। হিন্দি, উর্দু, মৈথিল, উড়িয়া, অসমী, গুজরাতি, সিংহলী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালি ও কানাড়ি থেকে ভাষাটি নির্বাচন করতে হত। বিদ্যাভূষণ মশাই-ই জনার্দনবাবুর জন্য গুজরাতি ভাষা ঠিক করে নিয়ে গেলেন দ্বারভাঙ্গা সৌধের একতলার পিছনের বারান্দায়। সেখানে ঈজিচেয়ারে অর্ধশয়ান অধ্যয়নরত গৌরবর্ণ রাশভারি দীর্ঘাকৃতি এক অবাঙালী অধ্যাপক। ইনিই ড. তারাপুরওয়ালা — বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান। সস্মিতমুখে তিনি জনার্দনবাবুকে গুজরাতি ক্লাশের একতম ছাত্ররূপে অঙ্গীকার করে নিলেন।

ড. তারাপুরওয়ালা প্রসঙ্গে একটি পার্শ্বকাহিনীর উল্লেখ করে আসল ঘটনায় যাব। পার্শ্বকাহিনীটি এইরকম — আটশোর মধ্যে ছ'শো ষোল নম্বর পেয়ে এম.এ পরীক্ষায় জনার্দনবাবু প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। গুজরাতির একটি পত্র স্বয়ং তারাপুরওয়ালা পরীক্ষা করেন, অপরটি বাইরের কোন প্রখ্যাতনামা গুজরাতি সাহিত্যিক-পরীক্ষককে দিয়ে পরীক্ষা করান, পাছে ছাত্রবাৎসল্য জনিত পক্ষপাতের কথা ওঠে। সেবার অনেক ভাল ছাত্র বাংলায় এম.এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন — এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'কাব্যলোক' গ্রন্থখ্যাত অধ্যাপক ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। জনার্দনবাবু ও সুধীরবাবুর মধ্যে মাত্র চারটি নম্বরের ব্যবধান। পরীক্ষক -সভায় তাই দু'জনকে ব্রাকেটে ফার্স্ট করে দেওয়ার কথা উঠেছিল। প্রস্তাবটি যখন প্রায় সমর্থিত হয়ে যায় এমন সময় ড. তারাপুরওয়ালা জানতে চাইলেন 'Who is leading in the larger number

of papers ?' অধিকসংখ্যক পত্রে কে উপরে রয়েছে? দেখা গেল, আটটি পত্রের মধ্যে ছ'টিতে জনার্দনবাবু বেশি। বাংলার সব পত্রেই তিনি শীর্ষে। ড. তারাপুরওয়ালা শুনে বললেন, 'It will be unfair to equalise the difference.'। তফাৎটা তুলে দিয়ে এক-করে দেয়া অন্যায় হবে।

ন্যায়নিষ্ঠ শিক্ষকের হস্তক্ষেপে এম.এ পরীক্ষার ফলে জনার্দনবাবুর এই যে সামান্য বৈশিষ্ট্যটুকু রক্ষিত হয়েছিল তা-ই তাঁকে জীবনসংগ্রামে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে, কার্যব্যপদেশে তিনি দূরে সরে গেছেন। উনিশ বছর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা বিভাগ গড়ার কাজ নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং বারো বছর কাটিয়ে ১৯৫৫-য় সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন। এবারে আসল কাহিনী।

সুধীবৃন্দ, এখন আবারও আমি সরে দাঁড়াব। জনার্দনবাবু কথা বলবেন —

"কর্মজীবনের হিসাব-নিকাশ, দেনাপাওনা চুকাতে গিয়ে পুরনো ডাইরিতে নজর পড়ল। ১৯২৬ সালের ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়ে যাবার সময়ে কোলকাতায় পঠদ্দশার কতকগুলি ঋণ পরিশোধ করে যেতে হয়েছিল। একসঙ্গে প্রায় দু'তিনশো টাকার দরকার হয়। কে ধার দেবেন? পাঁচ-ছ'টি সুবর্ণপদক ছিল। ব্যাঙ্কে বাঁধা দিয়ে দ্রব্যমূল্যের অনুপাতে ধার পাওয়া যায়, শুনলাম। কিন্তু একজন মান্যগণ্য ব্যক্তির সুপারিশ না হ'লে ব্যাঙ্ক ধার দিতে চান না। ধরলাম অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা'কে। ক্লাইভ স্ট্রীটের যে ব্যাঙ্কে তাঁর নিজের টাকা-পয়সা থাকে সেখানেই চিঠি দিয়ে পাঠালেন। সুবর্ণপদকগুলি বন্ধক দিয়ে ধার পেলাম। কিছু কিছু সুদ ও অল্প কিস্তি মাঝে মাঝে ব্যাঙ্ক-কে দিয়ে চলেছি। অল্প মাইনে। শীঘ্রই সংসারী হয়ে পড়ি, টাকাটা সব শোধ হয়ে ওঠেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির অবসানে সরকারি চাকরি নিয়ে চাঁটগায় চলে যাই। হঠাৎ শুনলাম ড. তারাপুরওয়ালা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে বোম্বে চলে যাচ্ছেন।

"হঠাৎ একটি ইনসিওর পার্সেলযোগে কোলকাতার ব্যাঙ্ক থেকে আমার সুবর্ণপদকগুলি ফিরে এল। ব্যাঙ্ক জানিয়েছেন, ঋণের প্রস্তাবক এবং সুপারিশকারী অধ্যাপক তারাপুরওয়ালা বাকি টাকাটা নিজ থেকে দিয়ে পদকগুলি আমার ঠিকানায় ফেরৎ পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আমার ব্যক্তিগত ঋণ। তিনি অনুগ্রহ করে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তো কোন দায়িত্ব ছিল না। তথাপি বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে জীবন-সংগ্রাম জর্জর বাঙালী ছাত্রের পদকগুলি উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়ে সব কাজ চুকিয়ে চলে যাচ্ছেন। ডায়েরি-বইতে লেখা

রয়েছে, ব্যাঙ্কের সেই টাকার পঁয়ষট্টিটি টাকা শেষ পর্যন্ত বাকি রয়ে গিয়েছিল। সেই টাকা শোধ করে দিয়ে তিনি চলে গেছেন।

"দিই-দিই করে সে টাকাটা এতদিন দেয়া হয়ে ওঠেনি। অনেকবার বন্ধুবর ড. সুকুমার সেনের কাছ থেকে ডা তারাপুরওয়ালার ঠিকানা নিয়েছি। কিন্তু ঋণশোধ করা হ'য়ে ওঠেনি। এবার আর দেরি করা নয়। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার ঠিক পূর্বে টাকা ক'টি মণিঅর্ডার যোগে বোম্বের ঠিকানায় পাঠিয়ে আচার্যদেবকে একটি চিঠি লিখি। তাতে এতদিনকার কর্মজীবনের খবর দিয়ে তাঁর সংবাদ-জিজ্ঞাসু হয়ে অপরাধ-স্বীকার ও প্রণাম-কৃতজ্ঞতা নিবেদন পাঠালেন। সঙ্গে একখানি চিঠি, তার মর্ম এই।

"অশীতিপর বৃদ্ধ হয়েছি। তোমার কোনও ঋণের কথা কিছুই মনে করতে পারছি নে। অনেকদিন চলে গেছে। অস্পষ্টভাবে তোমার কথা মনে পড়ছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তুমি যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছ তারও কিছু কিছু মনে পড়ছে। কিন্তু তোমার ঋণের টাকা কিছুতেই মনে পড়ছে না। এ অবস্থায় অর্থ গ্রহণ করি আমি কিরূপে? তাই তোমার প্রেরিত টাকা ক'টি ফেরত পাঠালাম। দুঃখ ক'রোনা যদি সত্যই সামান্য ঋণ তোমার অপরিশোধ্য থেকেই থাকে। আমি বলছি, এই ক'টি টাকা দেওয়ার আগেই তা শোধ হয়ে গেছে। এইমাত্র আমার ছেলে ও মেয়ে-জামাইদের কাছে বলছিলাম, আমার বাংলাদেশের এক সন্তান — তোমাদেরই মতো। দেখ, আমাকে স্মরণ করে কেমন চিঠি দিয়েছে! আমার দাদুরা আছেন, তোমার ছেলেরা! তাদের এই টাকা ক'টি দিয়ে কিছু বইপত্র ও ভালো খাবার কিনে দিও। ব'লো, তোমাদের শুভার্থী এক বৃদ্ধ দাদু আছেন বোম্বে-শহরে।

"এমন গুরুর অপরিশোধ্য ঋণ আমি শোধ করতে চেয়েছিলাম? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে হয়ত কৃতঘ্নতার পরিচয় দিতে গিয়েছিলাম? সে পাতকের স্পর্শ হতে তিনিই আমাকে রক্ষা করলেন। চিঠি লেখার অল্পদিন পরেই ড. তারাপুরওয়ালা ইহলোক ত্যাগ করেন। আমাকে তিনি অভয় দিয়ে গিয়েছিলেন, আমার ঋণ পরিশোধিত হয়েছে। কিন্তু আমার প্রাণ বলে. তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। অপরপক্ষের তর্পণকালে যখন উচ্চারণ করি, "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতমহাদয়ঃ", তখন সেই প্রজ্ঞাদীপ্ত উন্নতদেহধারী শ্রৌত-পণ্ডিতের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যমূর্তিটি মানসনেত্রের সমক্ষে ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে।"

* * *

হে সজ্জনমণ্ডলী, আমার শিক্ষাগুরুর অশ্রুসিক্ত কাহিনী দুটির এখানেই শেষ। বাঙ্‌ময় হয়ে তারা যেন বলতে চাইছে — 'Behold the man। এই দেখ মানুষ।' এ দু'জন মানুষের কাউকেই আমি দেখিনি, আবার দেখেছিও বটে। কেননা, আমি জনার্দনবাবুকে দেখেছি। এই কারণেই হয়তো খ্রিস্টিয় ধর্মে বলা হয়, যে তাঁর পুত্রকে অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে। কাহিনী দুটির ভিতর দিয়ে যেন লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে মনুষ্যত্বের উৎসার। ফুল নাকি আপনার জন্য ফোটে না, এঁরা পরের জন্য তাঁদের হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করেছিলেন। আর দক্ষ ও পরিশ্রমী মধুকরের মতো এই সব ফুলের মধু সযত্নে সংগ্রহ করে জনার্দনবাবু নিজের জীবনকে মধুময় করে বিকশিত করেন। তাঁদের উত্তরাধিকার পূর্ণভাবে জনার্দনবাবুতে বর্তেছিল একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়। বিশেষ কোন সৌধতলে জীবন-ক্যালেণ্ডারের কয়েকটি বর্ষ কাটিয়ে দিয়ে গুটিকয়েক পার্চমেন্ট কাগজ সংগ্রহ করাকে জনার্দনবাবু বিদ্যার সারাৎসার বলে গ্রহণ করেননি। তিনি মনে করতেন, 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। অর্থাৎ বিদ্যা হল তা-ই যা আমাদের মুক্তি দেয় — কায়িক, মানসিক ও বাচিক সমস্ত মালিন্য ও কুশ্রীতা থেকে মুক্তি, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি, যা কিছু মানুষকে অমানুষ করে তোলে তা থেকে মুক্তি, এক কথায় সমস্ত অন্ধকার থেকে মুক্তি। যা কিছু মহৎ, যা কিছু শোভন ও সুন্দর, আমার দৃষ্টিতে, জনার্দনবাবু ছিলেন তারই পরিপূর্ণতা। তাঁকে দেখেই শিখেছিলাম, মানুষের মনুষ্যত্ব, তার বিত্তে নয়, চিত্তে। স্বনামধন্য এই সারস্বতসাধক আজ হয়তো বিস্মৃতপ্রায়, কিন্তু মহৎ প্রাণের 'ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' ভবিষ্যত প্রজন্মের ক্ষুধা মেটাতে জাতির প্রাণভাণ্ডারে যাঁরা নীরবে নিভৃতে সকল লোকচক্ষুর অন্তরালে অকৃপণ ঔদার্যে প্রাণশস্য সঞ্চয় করে রেখে যান জনার্দনবাবু ছিলেন তাঁদেরই একজন। আজ তাঁর জন্মশতবর্ষের এই স্মৃতিতর্পণ আমাদের মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত করুক, আমাদের সকলের চৈতন্য হোক।

রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা — ১১

মুহম্মদ আবদুল হাই ঃ ভাষা ও সাহিত্য-শিল্পী

স্বরাজ সেনগুপ্ত

বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১১-৬১) একটি স্মরণীয় নাম। স্মরণীয় এই কারণে, মুহম্মদ আবদুল হাই একাধারে সাহিত্যের শিক্ষক, গবেষক, সাহিত্যসংগঠক এবং ভাষা-বিজ্ঞানী। এসব গুণাবলী পরস্পর বিরোধী না হলেও তাদের সমন্বয় যে ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়, তা যেমন দুর্লভ, তেমনি আকর্ষণীয়। শিল্পী এবং ব্যক্তি মুহম্মদ আবদুল হাই এমনই একজন আকর্ষণীয় পুরুষ।

মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য অধ্যাপক। এ ধরণের পরিস্থিতিতে শিক্ষা ও শিক্ষণের তাড়না যে কোনো সাহিত্যের অধ্যাপককে যে ধরণের ভাষাবিদ্ ও লেখক ক'রে তোলে, আবদুল হাই সেই পর্যায়ের ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বভাব-শিল্পী। প্রতিভার সহজাত স্পর্শে তিনি ভাষা ও সাহিত্য-শিল্পী। প্রসঙ্গটি একটু স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

লেখক-মাত্রই শিল্পী নন। লেখন-বিষয় এবং লিপি-কৌশল কিছুটা অধিগত হলেই এদেশের পাঠক-সমাজে যে সহজ ছাড়পত্র মেলে, তাতে কেউ লেখকরূপে চিহ্নিত হলেই শিল্পী হয়ে ওঠেন না। শিল্পীর আয়ত্তে থাকে কিছু অধিকতর সম্পদ, সে হলো সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য-সৃজন ক্ষমতা। এ ধরনের সম্মিলন দুর্লভ বলেই আমাদের দেশে সাহিত্যের লেখক অজস্র হলেও সাহিত্য-শিল্পী বিরল।

আবদুল হাই শিল্পী। সৌন্দর্যবোধ ও সৃজন তাঁর প্রতিভায় অনায়াস। ভাষার মূলগত সৌন্দর্য তিনি অনুধাবন করেছেন একজন ধ্বনিবিজ্ঞানীর নিরপেক্ষতায় এবং তা রূপায়িত করেছেন একজন সাহিত্য-শিল্পীর শোভনতায়। তাঁর হাতে স্থূল এবং অপটু গদ্য হয়েছে আবেগের মেদবর্জিত ক্ষীণাঙ্গ সুন্দর, যাবতীয় বিষয় ধারণক্ষম, মনন-তীক্ষ্ণ তাঁর এই সহজ গদ্যভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার গদ্যভঙ্গিরই সময়োপযোগী সম্প্রসারণ। এ গদ্যভঙ্গির মাধ্যমে তাঁর অনুসন্ধানী, সৌন্দর্য-রসিক, প্রীতি-প্রবণ, বিনয়-নমনীয়, সংহত আবেগ, ব্যক্তিত্বের সামাজিক প্রকাশসম্মত হয়েছে বলে তিনি একাধারে ভাষা-শিল্পী ও সাহিত্য-শিল্পী।

আবদুল হাই-এর জীবন মাত্র পঞ্চাশ বছরের। এর মধ্যে প্রায় তিরিশ বছর ধরে চলেছে তাঁর নিরলস সাহিত্য সাধনা। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত, প্রায় বিশ বছরে তাঁর উনিশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বছরে কমপক্ষে একটি প্রকাশিত গ্রন্থের অনুবাদ, মৌলিক গবেষণাধর্মী ও সম্পাদিত রচনা রয়েছে। সেদিক দিয়ে হাই-এর রচনায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং সৃজন-ধর্মের অজস্রতা লক্ষণীয় সম্পদ। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সূচনা হয়েছে 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান', বিপ্লবী রাজনীতিবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'The Historical Role of Islam' গ্রন্থের অনুবাদ দিয়ে। এই অনুবাদটি ১৯৪৯ সালে হাই-এর প্রকাশিত গ্রন্থের সূচনায় অবস্থান করে কতকগুলো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবদুল হাই এমন একজন ব্যক্তির রচনাকে এই অনুবাদ-কর্মে প্রাধান্য দিয়ে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, যিনি রাজনৈতিক ভাবুক হিসেবে বিতর্কিত এবং স্বতন্ত্র। মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পূর্ণ উদার দৃষ্টিতে ইসলামের বিপ্লবাত্মক এবং বৈজ্ঞানিক ভূমিকার যে স্বরূপ উদ্ধার করেছেন, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে আবদুল হাই এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন; সে হলো তাঁর বিজ্ঞান চেতনাসমন্বিত উদার ও মুক্তদৃষ্টির পরিপোষণ এবং অসাম্প্রদায়িক গুণগ্রাহিতার বিমুগ্ধ উৎসারণ।

মানবেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ শুনে আবদুল হাই একদিন অনাহারে ছিলেন এবং দুর্বল শরীর নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণ সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বলেছিলেন — 'মানবেন্দ্রনাথ আমার চিন্তা ও চেতনার প্রধান উৎস।'

অতঃপর প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ১৯৫৪ সালে। গ্রন্থটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিচিত্রধর্মী প্রবন্ধ সংকলন। আবদুল হাই-এর অনুসন্ধানের পরিধি এখানে বিদ্যাপতি থেকে শুরু করে সৈয়দ সুলতান, আলাওল, লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও শাহাদাৎ হোসেন পর্যন্ত বিস্তৃত। একদিকে সনেট ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকরণ যেমন তাঁর দৃষ্টি কেড়েছে, তেমনি আকর্ষণ করেছে হিন্দু-বাংলায় ধর্মান্দোলন, ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা, মুসলিম-ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় ও সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ। বিষয়বস্তুর এই বৈচিত্র্য যে একক ব্যক্তিত্বকে উদ্‌ভাসিত করে, তিনি হলেন মানবতাবাদী, সৌন্দর্যরসিক, নীতিপ্রবণ, প্রগতিশীল, মার্জিত-রুচি শিল্পী মুহম্মদ আবদুল হাই। এ জন্যে আলাওলকে তিনি পূর্ণ পরীক্ষা করেন তাঁর অসামান্য মানব-প্রেমের আলোকে, বিদ্যাপতিকে আবিষ্কার করেন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ

একজন আত্মসমর্পিত, কবিকর্মী হিসেবে, লালন শাহ্ ফকির প্রতিষ্ঠিত হন সর্বধর্মসমন্বয়কারী একজন উদার পুরুষরূপে এবং রবীন্দ্রনাথ কবি ও ভাষাতাত্ত্বিকরূপে আবদুল হাই-এর প্রধান প্রেরণার কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত হন। এ ছাড়াও তিনি নজরুলকে খুঁজে বেড়ান বাংলা কাব্যের নতুন ধারার উৎসমুখে এবং প্রতিষ্ঠিত করেন অবজ্ঞাত কবি শাহাদাৎ হোসেনকে তাঁর নিজস্ব আসনে। এই শ্রেণীর আলোচনায় পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের যে রীতি তিনি প্রবর্তন করেন, বাংলা সাহিত্যের সার্থক ইতিহাস রচনায় ও তথ্যনিষ্ঠ গবেষণায় তা পরবর্তীকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের আধুনিক যুগ অংশে এই প্রকরণটি অত্যন্ত উদ্দেশ্যসাধক হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর অমলেন্দু বসু বলেন, "শিল্প মূল্যায়নে যে তথ্যভিত্তি আজ বাংলা সাহিত্যে আলোচনায় সর্বাধিক প্রয়োজন সেই তথ্যভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন অধ্যাপক আবদুল হাই।" আজহার উদ্দীন খান তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ আবদুল হাই' গ্রন্থে আরও বিশদ করে বলেন, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে রয়েছে একটি নিরপেক্ষ এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক তথ্যগুলির বিচার এবং সহজ সরল উপস্থাপনা।"

প্রকৃতপক্ষে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে অনুশীলিত তথ্যভিত্তি এবং নিরপেক্ষ বাস্তবদৃষ্টির প্রশিক্ষণ আবদুল হাই-এর অনেক গুণমুগ্ধ ছাত্রের সাহিত্য গবেষণার আদর্শরূপে নিরূপিত হয়ে দেশ-বিদেশে তাঁদের প্রতিষ্ঠাকে সুনিশ্চিত করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান-এর 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', ডক্টর আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', মুনীর চৌধুরীর 'মীর মানস', আনোয়ার পাশার 'রবীন্দ্র ছোট গল্প সমীক্ষা' এবং ডক্টর মুহম্মদ আবদুল আউয়াল-এর 'মীর মশাররফ হোসেনের গদ্য রচনা' গ্রন্থের পদ্ধতি ও প্রকরণের বৈশিষ্ট্য স্মরণীয়। এ ক্ষেত্রে আবদুল হাই-এর যে নেপথ্য পরিচয় মুদ্রিত, তা শুধু সাহিত্য-শিল্পীর নয়, গবেষণা-প্রশিক্ষক ও সাহিত্যসংগঠকেরও।

কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতিচর্চার যুগে ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কাজী আবদুল ওদুদ, জসীমউদ্‌দীন, মোহিতলাল প্রমুখের প্রয়াসে ঢাকাকেন্দ্রিক অপর সংস্কৃতি কেন্দ্রের যে উদ্বোধন ঘটে, আবদুল হাই তার প্রথম সার্থক ফসল। এ জন্য তাঁর মানসিক প্রস্তুতিও ছিল অনলস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে পাঠের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা পরিহার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন শুধু এই পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার নিঃস্বার্থ

অভিপ্রায়ে। এজন্যে তিনি অত্যন্ত পরিকল্পিত পদক্ষেপে অগ্রসর হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা, লণ্ডনে ধ্বনিতত্ত্বে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ, এ সবই সে পরিকল্পনার অন্তর্গত। তাঁর সংগঠন প্রতিভায় তাঁর পরিকল্পনা অচিরেই ফলপ্রসূ হয়। বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর সংগঠন বুদ্ধি এবং পরিচালন-কৌশলে শীঘ্রই এ বিভাগটি সাহিত্যের প্রশিক্ষক সৃজনে অগ্রণী ভূমিকা লাভ করে। তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর স্বীকৃতি নিম্নরূপ ঃ ''তাঁরই সুযোগ্য পরিচালনা এবং উদ্দীপনায় বাংলা বিভাগ আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন, সারা উপমহাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ বিভাগরূপে মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়েছে।''

এভাবে আবদুল হাই শুধু সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারূপে অবিস্মরণীয় হন না, হয়ে যান নিজেই গৌরবজনক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা' গ্রন্থে সাহিত্য-স্রষ্টা আবদুল হাই-এর আর এক পরিচয় প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। 'সামনের মাস' এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধটিতে হাল্কাচালে তিনি মধ্যবিত্ত চাকুরের নিয়মিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রেক্ষিতে এই শ্রেণীর মানুষের আর্থিক দুরবস্থার যে মর্মান্তিক চিত্র উপস্থাপিত করেন, তার 'সিরিওকমিক' আবেদন পাঠকের কাছে আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে। আবার 'সুন্দরের নিমন্ত্রণ' ও 'সুন্দরলোকের উপজীব্য' হয়ে ওঠে চিরকালের শিল্পীর অন্বিষ্ট সেই সুন্দর — যার উৎসের অন্বেষণে ক্লান্ত শিল্পী মুহম্মদ আ'বদুল হাই কবির মত এক অপরূপ অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ লাভ করেন। অস্তগামী সূর্যের রক্তরাগে রঞ্জিত একদল ভেড়া এবং তাদের মালিক হাটুরেটির প্রতিনিধিত্বে, এক আবিষ্কারকের মতো তাঁর উপলব্ধি ঘটে —- ''অনুসন্ধানে এ সুন্দরকে পাওয়া যায় না, তবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধীরে ধীরে মনের স্তর তৈরি হতে থাকে এবং আমাদের অজ্ঞাতে, সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে। অন্তরে গড়ে উঠতে থাকে রসদৃষ্টি, তাতেই সকলের প্রতি প্রীতিতে মন অভিষিক্ত হয়ে যায়।''

'ওস্তাদজী' এবং 'বেসুরো' নামক দুটি গল্পের প্রথমটি গল্‌সওয়ার্দির গল্পের ভাবানুবাদ, দ্বিতীয়টি মৌলিক রচনা। উভয় গল্পেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে গাল্পিক আবদুল হাই-এর একাত্মতা সৃষ্টি হয়। 'ওস্তাদজী' গল্পের বৃদ্ধ ওস্তাদজী শিশু ও পশুপ্রিয় 'বেসুরো' গল্পের সাহিত্যের অধ্যাপকটি অসবর্ণ প্রেমে উন্মাতাল, উভয়ই ভ্রমণ রসিক, উভয়েরই রয়েছে প্রসারিত হৃদয় যা প্রবঞ্চিত হলেও প্রীতিবঞ্চিত নয়। প্রথম গল্পে নায়কের করুণা নিজেকে সর্বস্বান্ত ক'রে মানুষ এমন কি পশু ও পাখিতে প্রসারিত হয়। দ্বিতীয় গল্পে নায়কের হৃদয় ধর্মের অন্তরায় অতিক্রম করে

আপন শক্তি পরীক্ষা করে। উভয় গল্পেই আত্মবিস্তারধর্মী হৃদয়ের প্রতিকূলতা করেছে বৈরী সমাজশক্তি। প্রথম গল্পে ঐ সমাজশক্তির প্রতীক বিমুখ বাড়িওয়ালী এবং দ্বিতীয় গল্পের বিরূপ নায়িকা লাবণ্যলতা। উভয় ক্ষেত্রেই বৈরী প্রত্যাখ্যানে ক্ষত-বিক্ষত নায়ক-হৃদয় অপার তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়। তাই মৃত বৃদ্ধের সঙ্গে সহমৃত হয় পালিত তোতাটি এবং প্রত্যাখ্যাত অধ্যাপক, আশ্বস্ত হন প্রেমিকার কল্পিত বিচলিত ভঙ্গিতে, বাস্তবত তার অভাবই নায়কের মৃদু উষ্মার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এছাড়া আলোচ্য গ্রন্থে যেসব প্রবন্ধ স্থান পায় তার অধিকাংশেরই উপজীব্য নিসর্গ চেতনা এবং রবীন্দ্র অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথের নামে এখানে একটিও প্রবন্ধ লিখিত না হলেও সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করেন লেখকের নিসর্গ দৃষ্টিতে, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ ব্যবহারে এবং রবীন্দ্র উদ্ধৃতি চয়নে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কাব্যবাণী ভেঙে গদ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আবদুল হাই-এর রবীন্দ্রপ্রীতির উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায়।

এ ছাড়া আছে 'তোষামোদের ভাষা' ও 'রাজনীতির ভাষা' নামে দুটি প্রবন্ধ। 'তোষামোদের ভাষা' অচিরে হয়ে ওঠে প্রশস্তির ভাষা এবং আন্তরিকতার স্পর্শে সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়ে আবদুল হাই-এর অভিনন্দন লাভ করে এবং তিনি তার মধ্যে খুঁজে পান চিরন্তন আনন্দ নির্ঝর। অপরদিকে রাজনীতিবিদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহৃত রাজনীতির ভাষা কিভাবে কলুষিত, অলীক এবং বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে, তার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত করে আবদুল হাই প্রকাশ করেন রাজনীতির প্রতি উষ্মা। সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রচলিত রাজনীতির কূটনীতির দিকটি অনৈতিক বলে নিন্দিত হয়েছে, এবং তাঁর প্রশাসনিক জীবনেও কূটনীতির অভাবে সম্পূর্ণ সদাচার সত্ত্বেও তিনি কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষের শত্রুতে পরিণত হয়েছেন যার ফলে হয়েছে ভয়াবহ।

তাঁর অপর সৃজনশীল রচনা 'বিলেতে সাড়ে সাত শত দিন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫০ সালে তিনি ধ্বনিবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য ইংলণ্ডে যান। সেখানে দু বছর তাঁকে অবস্থান করতে হয় এবং এ সময়ে যেমন তিনি ধ্বনিবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত হয়ে দেশের প্রয়োজন মেটান, তেমনি তাঁর অভিনব অভিজ্ঞতার সৌন্দর্য ও সম্পদ সংরক্ষিত করেন উল্লেখিত গ্রন্থে উত্তরসূরীর জন্য। গ্রন্থটিতে ইংলণ্ডের নিসর্গ এবং মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তাঁর ভাষাতেই দেখা যাক, (এক) 'তার নিচে বহু বিচিত্র শস্য খেত। অপরূপ শ্যামলে সবুজে বেগুনে হলুদে নীলে লালে আর বিচিত্র আভায় প্রভায় গায়ে

গায়ে লেগে থেকে সৌন্দর্যের সে কি প্লাবন বইয়ে দিচ্ছে।' (দুই) 'এদের মত দায়িত্বশীল জাত পৃথিবীতে দুটো নেই, যার যতটুকু কাজ সুদে আসলে তার সবটুকু সুন্দর করে নিজের মনেই সে করে যাবে, কাউকে কিছু বলতে হবে না।' এই যে সুন্দর স্বাস্থ্যবান নিসর্গের পটভূমিতে দায়িত্বশীল কর্মঠ পেশীবহুল মানুষের দেশ ইংলণ্ড, তার এই অভিনবরূপ এদেশের পাঠকের জন্য আবদুল হাই অপরূপ ভাষায় উদ্‌ভাসিত করেন। ভ্রমণ কাহিনির দিক দিয়ে বইটি অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে'র সমতুল্য মর্যাদা লাভ করে।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত 'ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটিতে ভাষা বিষয়ক আটটি প্রবন্ধে সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতনা প্রাধান্য লাভ করে। বাংলা ভাষার মর্যাদাহানির ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে আবদুল হাই উল্লেখিত প্রবন্ধসমূহে একাডেমির প্রতিরোধ সৃষ্টি করে জনমত সংগঠনের মহৎ ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া অন্যান্য একুশটি প্রবন্ধে নজরুল, মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, জসীমউদ্‌দীন, গিরিশ ঘোষ, ডি. এল. রায়, দীনবন্ধু মিত্র তাঁর পরিণত রস পিপাসা চরিতার্থ করে পাঠকেরও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

১৯৬৪ সালে তাঁর ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' নামে। এর আগে ইংরেজিতে প্রকাশিত অনুরূপ বিষয়ের গ্রন্থ দুটি দেশে বিদেশে সুধী সমাজে আদৃত হয়। বাংলায় প্রকাশিত বর্তমান গ্রন্থটি উদ্দিষ্ট বিষয়ে পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করে বিশেষজ্ঞ সমাজে প্রশংসা লাভ করে। বর্ণ ও ধ্বনিসংক্রান্ত তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলির জটিলতা ছেদ করে তাকে তিনি সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন। পাঠক মুহূর্তে রূপান্তরিত হয় তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্ররূপে। পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকে আবদুল হাই-এর অবিস্মরণীয় অধ্যাপনার সুরভিত স্মৃতি আজও সযত্নে লালন করে বেঁচে আছেন বহু ছাত্র।

আবদুল হাই-এর সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা সাত। প্রতিটি গ্রন্থে তিনি অনুজ-সহকর্মীর সঙ্গে সহযোগী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। গ্রন্থগুলিতে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও স্বীকৃতিতে যৌথ গবেষণার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, সেখানে আবদুল হাই উত্তরসূরীর কাছে অনুসরণীয় আদর্শ।

গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্য'-এর সম্পাদনাও এমনই যৌথ কর্মকাণ্ডের মহৎ নিদর্শন। পত্রিকাটির কেবল প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন না, পত্রিকাটি ছিল তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন। এই পত্রিকায় সমঝোতার ভিত্তিতে তিনি সৃষ্টি করেন একটি লেখক ও তত্ত্বাবধায়ক গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীকে তিনি আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন, যাতে পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত আস্থার

মাশুল তাঁকে দিতে হয়েছে হাতে হাতেই। অকালে নিভে গেছে তাঁর জীবন প্রদীপ।

মাত্র পঞ্চাশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। তাঁর সাহিত্য কর্মের সামগ্রিক আলো বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বিচ্ছুরিত হতে পারেনি। এর কারণ কি? তাঁর অকাল মৃত্যু? না যে পরিস্থিতি তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী, সমাজে বিরাজমান সেই অশুভ শক্তি?

আবদুল হাই রবীন্দ্র অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সাহিত্য বর্জন, রোমান ও আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব প্রভৃতি সরকারি উদ্যোগের বিরোধিতা করে তিনি জীবিতকালেই বিশেষ মহলের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলেন। তাই সমাজে ও রাজনীতিতে উক্ত অশুভ প্রচ্ছায়াটির রোষ তাঁর উপর প্রবলভাবে পড়েছিল।

১৯৬১ সালে ৩রা জুন ভোরে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রাক্তন ছাত্রের বাসার উদ্দেশ্যে। জানিয়ে গেলেন, ফিরে এসে চা পান করবেন। তিনি আর ফিরলেন না, ফিরল তাঁর মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাপ্লুত, ট্রেনের চাকায় নিষ্পিষ্ট। তাঁর মাথার পিছনে আঘাত ছিল, ট্রেনের চাকা দেহের ওপর দিয়ে চলে গেলেও পদদ্বয় অবিচ্ছিন্ন ছিল। মৃতদেহ বিনা পোস্টমর্টেমে সমাধিস্থ হলো। এসব ঘটনা তাঁর ট্রেন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর রিপোর্টের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। এ সন্দেহের আজও নিরসন হয়নি। আবদুল হাই-এর মৃত্যুর কোন নির্ভরযোগ্য তদন্ত হয়নি। ধরে নেওয়া হয়েছে, এটি তাঁর অন্যমনস্কতাজনিত অপঘাত মৃত্যু। যেন 'পান খেয়ে গান গেয়ে' এই 'অতি সুখী অতি খেয়ালী' মানুষটি ট্রেনের চাকায় গলা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কারো কিছু করার নেই, না সরকারের, না জনসাধারণের!

সেদিন পাকিস্তান সরকার তাই কিছু করেনি। করেনি জনসাধারণও। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতের এমন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব, অবজ্ঞাত চলে গেলেন। কোথাও কোনো আনুষ্ঠানিক শোকোচ্চারণ হয়নি, না অধ্যাপক মহলে, না সংস্কৃতিসেবী মহলে। কোনো পত্রিকা প্রকাশ করেনি কোন স্মরণ সংখ্যা। কেবল নিয়মিত হতে থাকল ৩রা জুনের পারিবারিক শোক প্রকাশ। অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার পর ১৯৭৪-এ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা সাহিত্যিকীর (১৩৮০-৮১) সংখ্যাটি নিবেদিত হয় আবদুল হাই এবং শহীদ আনোয়ার পাশার যৌথ স্মৃতির উদ্দেশ্যে। তাও অসহনীয় মনে হয় বিশেষ মহলে। আপত্তি ওঠে আবদুল হাই-এর একটি প্রবন্ধের

অংশবিশেষ নিয়ে। এই প্রবন্ধে তিনি ধর্মান্ধতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা লিপ্সাকে সহযোগী শক্তিরূপে নিন্দিত করেছিলেন। অবশ্য সেদিনের সাহিত্যিকী সম্পাদক অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান সৎসাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করতে সমর্থ হন।

মৃত্যুর দীর্ঘ এগার বছর পরে আবদুল হাই তাঁর পারিবারিক আবেষ্টনী অতিক্রম করে জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাজশাহীর 'বাংলাদেশ পরিষদ।' এজন্য তাদের সাধু প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। পরিশেষে একথা বলি, আমাদের এই বিশাল উপমহাদেশের সমাজে সৎসাহিত্য ও সংস্কৃতি সেবীর জন্যে প্রয়োজনীয় সম্মান এবং নিরাপত্তার যথেষ্ট প্রয়োজন। হত্যা অথবা আত্মহত্যা আবদুল হাই-এর অকাল মৃত্যুর পেছনে যে ঘটনাই থাকুক না কেন, উৎস কিন্তু একই, ঘাতক পরিস্থিতি। সমাজে বিরাজমান সেই অশুভ শক্তির উৎপাটন না ঘটলে আমাদের সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব নয়। আজ আমাদের সবার ঐকান্তিক কামনা, — 'অশুভ শক্তির হীন আক্রমণ থেকে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উজ্জল উদ্ধার' অবধারিত হক।

রোকেয়া-স্মারক বক্তৃতা - ১২

জ্যোতির্মালা দেবী ঃ একটি ব্যতিক্রমী নাম

সুদক্ষিণা ঘোষ

১.

কতকাল হল আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে কত পরিচিত নাম, কত পরিচিত গল্প-উপন্যাসের একদা-চেনা আখ্যান। আজ তাদের চিনতে হলে, তাদের সম্পর্কে জানতে হলে এবং তাদের কাছাকাছি পৌঁছতে হলে পুরোনো লাইব্রেরির তাকের ধুলো ঘাঁটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই নতুন কালের পাঠকের। তবু, এমন কোনো কোনো লেখকও হয়তো আছেন যাঁদের লেখালেখি আজ আর ওভাবেও উদ্ধার করা সম্ভব হয় না সবসময়। আর বাংলার পাঠক-সমাজের এই বিস্মৃতির প্রাবল্য বেশি মাত্রায় ধরা দেয় যেন নারী-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেই। তবে এখন, হারিয়ে-যাওয়া এই মুখগুলি চিনে নেওয়ার একটা নতুন আগ্রহ যেন দেখা দিয়েছে আজকের কালের পাঠানুরাগীদের মধ্যে, তাই হয়তো এখন আমরা সহজেই হাতের নাগালে পেয়ে যাচ্ছি জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী, স্বর্ণকুমারী দেবীর বেশ কিছু লেখালেখি, পাচ্ছি রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের রচনাসমগ্র, আশালতা সিংহের গল্প-উপন্যাসের কিছু কিছু, অনিন্দিতা দেবীর মতো বলিষ্ঠ প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধসংগ্রহও আজ মিলছে আগ্রহী পাঠকের হাতের নাগালেই।

তবু এখনও, মেয়েদের লেখালেখি সবই কি পাওয়া যায় খুব সহজে? অথচ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় উপস্থিতির অনুপাত যতই নগণ্য হোক, সত্যি সত্যি বাঙালী মেয়েদের লেখালেখির ইতিহাস তো খুব অর্বাচীনকালের নয়। যে বছরে বাংলার প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রূপ নিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে, সেই বছরেই --- সেই ১৮৬৫ সালেই হেমাঙ্গিনী দেবী নামে এক অচেনা অন্তঃপুরিকার কলমে লেখা হয়েছিল 'মনোরমা' নামে এক উপন্যাস (১২৭২ বঙ্গাব্দে), শেষ পর্যন্ত যে উপন্যাসটি প্রকাশ পেয়েছিল ১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৪ সালে); প্রকাশকালের হিসেবে তাঁর আগেই, ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল নবীনকালী দেবী নামে আর এক অবরোধবাসিনীর উপন্যাস, নাম তার --- 'কামিনীকলঙ্ক', কারো কারো মতে তাই তিনিই বাংলার প্রথম নারী-

ঔপন্যাসিক। তবে, বাংলার প্রথম সার্থক নারী-ঔপন্যাসিক বলে যাঁকে চিনি, সেই স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস রচনার এক দশক পরেই।

এর পরেও পাঠকমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা নিয়েই এসেছিলেন অনুরূপা দেবী বা নিরুপমা দেবী, সীতা দেবী এবং শান্তা দেবী, গিরিবালা দেবী অথবা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী; একটিমাত্র উপন্যাসের রচয়িত্রী হলেও কম ছিল না রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কলমের জোর। বিশ শতকের তিনের দশকের লেখিকাদের অগ্রগণ্যা ছিলেন শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং আশালতা সিংহ; তারও পরে এসেছিলেন সাবিত্রী রায়, সুলেখা সান্যাল এবং তাঁদেরই সমকালীন আজকের পাঠকের কাছে বহুল-পরিচিত দু'টি নাম — আশাপূর্ণা দেবী আর মহাশ্বেতা দেবী। এর মধ্যেও না-বলাই রয়ে গেল আমোদিনী ঘোষ, সুলেখা দাশগুপ্ত বা বিমলপ্রতিভা দেবীর মতো আরো কত হারিয়ে-যাওয়া নাম। নারী-ঔপন্যাসিকদের সেই ধারাই আজ প্রবাহিত হয়ে চলেছে বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অনিতা অগ্নিহোত্রী বা মন্দাক্রান্তা সেন আর তিলোত্তমা মজুমদারের লেখালেখিতে।

মেয়েদের লেখালেখির এই পরম্পরায় একটি ব্যতিক্রমী সংযোজনের নাম-জ্যোতির্মালা দেবী। শুধু সাহিত্যরচনাক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমী ছিলেন না জ্যোতির্মালা, ব্যতিক্রমী ছিলেন তিনি দিনযাপনের ছন্দেও। ১৯০৩ থেকে ১৯৮১ — প্রায় আট দশক দীর্ঘ জ্যোতির্মালার জীবন-পরিক্রমা উত্তরকালকে জানায় — অন্য যে-কোনো সেকালিনী বাঙালী মেয়ের তুলনায় কত স্বতন্ত্র ছিল তাঁর জীবনপ্রবাহ — তাঁর স্বেচ্ছানির্বাচনের বিয়ে এবং বিবাহবিচ্ছেদের অসমসাহসিকতা, আর শেষ পর্যন্ত চেশায়ার হোমে কাটানো তাঁর গৃহহীন শেষ জীবনের অসহায় নিঃসঙ্গতা — এই সব কিছু মিলিয়ে কেমন করে গড়ে ওঠে এক ব্যতিক্রমী জীবনকথা, যার প্রত্যেকটি পংক্তি থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সমকালীন যে-কোনো বাঙালী মেয়ের অভ্যস্ত জীবন-ছবির তুলনায় স্বতন্ত্র এক যাপিত জীবন।

২.

জ্যোতির্মালা নয়, ১৯০৩ সালে চট্টগ্রামে সাতবাড়িয়া গ্রামে এক বৌদ্ধ পরিবারে যে শিশুটির জন্ম হয়েছিল, তার নাম ছিল জ্যোতির্ময়ী। নগেন্দ্রলাল চৌধুরী ও বিরজাসুন্দরীর আট সন্তানের প্রথমা ছিল এই শিশুকন্যাটি। জ্যোৎস্নাময়ী দীপ্তিময়ী আলোকময়ী নামে তিন বোন আর সুধীর শিশির সুমন

সুপ্রকাশ আর সুনীল — এই পাঁচটি ভাইয়ের অগ্রজা জ্যোতির্ময়ী চৌধুরীর পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয়েছিল পিতামহ নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত 'সাতবাড়িয়া আদর্শ বিদ্যালয়ে।' তারপর চট্টগ্রামের প্রথম মেয়েদের ইংরেজি স্কুল 'ডাঃ খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ জ্যোতির্ময়ী কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন বেথুন কলেজে। বেথুন কলেজ থেকে আই. এ. পাশের পর ১৯২২ সালে জ্যোতির্মালা ফিরে আসেন রেঙ্গুনে, বি. এ. পাশ করেন সেখানকারই জাডসন কলেজ থেকে, ১৯২৪ সালে। বর্মার মধ্যে এবং বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েটই শুধু হন নি জ্যোতির্মালা, তিনটি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বরের কারণে পেয়েছিলেন তিন-তিনটি স্বর্ণপদকও।

এর পরেই উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত পাড়ি দিয়েছিলেন জ্যোতির্মালা, সময়টা ছিল ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাস। বিদেশে জ্যোতির্মালার গবেষণা-নিবন্ধের বিষয় ছিল 'A Comparative Study of Sree Aurobinda and Kant'। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্পন্ন সেই গবেষণা-কার্যের ফলাফল অবশ্য স্থগিত থেকে যায় তদানীন্তন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, স্বদেশী আন্দোলনের সেই যুগে শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে কোনো গবেষণা কেন সরকারী ছাড়পত্র পায় নি, তার কারণটি আজ সহজেই অনুমেয়। তবে, উত্তরকালের পরিতাপের বিষয় এইটাই যে, এদেশের সামাজিক ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেল এক মনস্বিনী ছাত্রীর অবদান, এই উপমহাদেশেরই প্রথম যুগের ডক্টরেট প্রাপকদের নামের তালিকায় স্থান পেল না তাঁর মতো মেধাবিনীর নাম।

প্রতিভা বসুর কলমে উঁকি দিয়ে যায় তাঁদের সেই সমকাল আর সেকালের পটে জ্যোতির্মালা দেবীর একটা ছবি — "তখন 'বিলেত ফেরত' শব্দটা একটা শব্দই বটে। লোকে দেখতে যেতো। চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে থাকতো, আবার সমাজে পতিতও করতো। ·· জ্যোতির্মালা দেবী সেই সময়েই, 'বিলেত ফেরত', তার উপরে আবার 'মেয়ে বিলেত ফেরত' এবং গরুর বিষ্ঠা প্রত্যাখ্যান করা 'বিলেত ফেরত'।"

বিলেতের পাঠ সাঙ্গ করে স্বদেশে ফিরে এসে জ্যোতির্মালা প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন কুমিল্লায় সহকারী স্কুল পরিদর্শকের কাজে, পরে পরিদর্শকের কাজে উন্নীত হয়ে বদলি হয়ে যান ঢাকা শহরে, এই সময়ই কিশোরী রানু সোম, পরবর্তীকালের প্রতিভা বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল তাঁর। পরিদর্শকের কাজ ছেড়ে দিয়ে ততদিনে অবশ্য তিনি যোগ দিয়েছিলেন ঢাকায় লীলা নাগ

প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় 'নারী শিক্ষা মন্দিরে'। বছর দেড়েক পরে বিদ্যালয়ের কাজও ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এসে এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ নিয়েছিলেন জ্যোতির্মালা; আর তারপরে সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে। এইখানেই শুরু হয়েছিল তাঁর সৃজনশীল জীবনের বিকাশ পর্ব।

অবশ্য শুধু শ্রীঅরবিন্দ-সান্নিধ্যেই বিকশিত হয়নি তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা, যোগাযোগ ছিল তাঁর কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যসমাজের সঙ্গেও, বিশেষত, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর পুরোধা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের সঙ্গে, ঘনিষ্ঠতা ছিল বুদ্ধদেব বসু বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো সেদিনের তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গেও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও স্নেহের যোগ গড়ে উঠেছিল জ্যোতির্মালা দেবীর, কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথের পত্নী প্রতিমা দেবীর কাছে ছিল তাঁর স্নেহেব দাবি, তাঁকে 'মা' বলেই সম্বোধন করতেন জ্যোতির্মালা।

এসবই ছিল জ্যোতির্মালার জীবনের মেধা আর মননের অর্জন, কিন্তু অনর্জনের দাহও কম ছিল না তাঁর সারা জীবন জুড়ে। প্রতিভায়, যোগ্যতায়, রূপে, গুণে-জীবন যেমন তাঁকে দিয়েছিল অনেক, তেমনি কেড়েও নিয়েছিল অনেক কিছুই — ভালোবেসে কোনোদিন শান্তি মেলে নি জ্যোতির্মালার, মেলে নি আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি, প্রত্যাশার ভরা পাত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তাঁর বারে বারে।

বিলেতে থাকার সময়েই এক উজ্জ্বল সাম্যবাদী যুবকের সঙ্গে পরিচয় এবং পরিণয় হয়েছিল তরুণী জ্যোতির্মালার, নাম তাঁর অজেয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আত্মীয়-পরিজনের সান্নিধ্য থেকে বহু দূরে, স্বাধীন সিদ্ধান্তে জীবনের প্রথম ভালোবাসাকে বিবাহে রূপ দিয়েছিলেন জ্যোতির্মালা, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নি সেই সম্পর্কের বন্ধন। শেষ পর্যন্ত বিলেতের আদালতে দাঁড়িয়ে বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন তিনি নিজেই, কিন্তু সংবেদনশীল মেয়েটি এ আঘাত সামলাতে পারেন নি সহজে — বিচ্ছেদের এই যন্ত্রণা সইতে সাময়িকভাবে লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি, এগিয়ে চলেছিলেন যেন কিছুটা 'মানসিক বিকৃতির' পথেই, নিজেকে আবার সুষম শৃঙ্খলায় গড়ে তুলতে অনেকটাই সময় লেগেছিল তাঁর।

দ্বিতীয়বারের আঘাত এল তীব্রতর মাত্রায়। তখন তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমে, সেখানেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার-পুত্র প্রখ্যাত বীণাবাদক বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে; শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ নিয়েই সম্পন্ন হয়েছিল বীরেন্দ্রকিশোর ও জ্যোতির্মালার বিবাহ, পরে কলকাতায়

মহাবোধি সোসাইটির প্রার্থনাকক্ষে বৌদ্ধ প্রথায় হয়েছিল আরেকটি অনুষ্ঠান। সুখী দাম্পত্যের কিছুদিন কাটল, 'বধূরাণী' নামে জ্যোতির্মালার কিছু লেখাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হল, কিন্তু প্রবঞ্চক পুরুষের রূপ আবারও চিনতে হল তাঁকে। প্রবঞ্চনার এ আঘাত আর সহ্য হয় নি তাঁর, এরপর থেকেই হারিয়ে গেছে তাঁর দিনযাপনের ছন্দ, অভ্যস্ত হয়েছেন তিনি এক ছন্নছাড়া জীবনে।

তবু, সৃষ্টিমাত্রেই তো যন্ত্রণাসম্ভব, তাই মনে হয়, এমনি করে জীবনভর আঘাতে-সংঘাতে বিন্দু-বিন্দু যত রক্ত ঝরেছে জ্যোতির্মালার বুকে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে গহন পথে যতই একলা চলেছেন তিনি — ততই বেদনার্ত সে-সমস্ত মুহূর্তের নিষ্পেষণে তাঁর কলমে ফুটে উঠেছে তাঁর সৃষ্টির রক্তগোলাপগুলি।

৩.

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ উইমেনস স্টাডিজ থেকে সালে প্রকাশ পেয়েছে জ্যোতির্মালা দেবীর গল্পসংকলন — 'বিলেত দেশটা মাটির ও অন্যান্য গল্প'; আটটি গল্পের এই সংকলনটির সহায়তায় আজ জ্যোতির্মালা দেবীর লেখালেখির একটা পরিচয় সহজেই পেতে পারেন একালের পাঠক, পারেন তাঁর রচনাভঙ্গির স্বাদ নিতে।

'বিলেত দেশটা মাটির' বইটি শুধু পুনর্মুদ্রিত হয়েছে বলেই যে আজ পরিচিত মনে হচ্ছে তাই নয়, জ্যোতির্মালা দেবীর এই গল্পগ্রন্থটির অন্তত নামটুকুর একটা ক্ষীণ স্মৃতিরেশ বোধহয় বহুদিন ধরে রয়েই গেছে বাঙালী পাঠকমহলে, সেই স্মৃতির দাবিতেই একথাটাও হয়তো কারো কারো মনে আছে যে, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে প্রথম প্রকাশের সময় ছ'টি গল্প ছিল 'বিলাতী' ও 'দেশী' — এই দুই পর্বে বিভক্ত ঐ গল্প-সংকলনটিতে। 'বিলাতী' পর্বে ছিল — 'সেটা সোনার রূপোর নয়', 'নীল রক্ত', 'রাশিয়ান ক্যাট' এবং 'অকারণ' নামে চারটি গল্প আর 'পরিচয়' ও 'ভাঙা-গড়া' নামে গল্প দুটি ছিল 'দেশী' পর্বে। এই ছ'টি গল্পের সঙ্গে 'পরিচয়' ও 'সওগাত' পত্রিকার মহিলা সংখ্যা থেকে সংকলিত আরো দুটি অগ্রন্থিত গল্প — 'হৃদয়ের রঙ' এবং 'সোনালি' এবারে সংযুক্ত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংগ্রহটিতে; তবে, এছাড়াও নানান পত্র-পত্রিকায় এখনও ছড়িয়ে আছে জ্যোতির্মালা দেবীর আরো বেশ কিছু অগ্রন্থিত গল্প — 'শ্রীলা' 'বহ্নিলতা' 'জোনাকি' 'তান্ত্রিক' 'মৃত্যু দ্বীপ' 'সরণী' 'তারার প্রপাত' 'রাজভিখারী' — এইরকমই তাঁর আরো কয়েকটি

ছোটগল্পের নাম।

কথাসাহিত্যিক জ্যোতির্মালা দেবীর আর একটা বড় পরিচয়ের ক্ষেত্র তাঁর উপন্যাসগুলি। 'সন্ধানে' আর 'রক্তগোলাপ' — জ্যোতির্মালার এ দু'টি উপন্যাস কিছুদিন আগেও পাওয়া যেত কলকাতার পুরোনো গ্রন্থাগারগুলিতে, এ দুটি ছাড়াও 'ইরাবতী' নামে আর একটি উপন্যাসও হয়তো লিখেছিলেন তিনি, যদিও নামটুকু ছাড়া তার কোনো সন্ধান আর মেলে না এখন।

'শকুন্তলার স্বপ্ন' — এই নামে তাঁর প্রথম কবিতা -গ্রন্থটি নিজেই প্রকাশ করেছিলেন জ্যোতির্মালা, যদিও প্রকাশক হিসেবে বইটিতে নাম ছিল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতাভবনে'র। দ্বিতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদের আঘাতে দিশাহারা এক উদ্‌ভ্রান্ত সময়ে প্রকাশ পেয়েছিল বইটি, কবিতাগুলি উৎসর্গ করেছিলেন তিনি সদ্য-ছেড়ে-আসা মানুষটিকেই-ভেঙে যাওয়া দাম্পত্যের অংশীদার তাঁর স্বামীকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন — "এই বইটির নাম আমার স্বামী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দেওয়া", কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশও পেয়েছিল জ্যোতির্মালা দেবী নয়, বিবাহোত্তর জীবনের জ্যোতির্ময়ী রায়চৌধুরী নামেই।

১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'শকুন্তলার স্বপ্ন'-কে ঘিরে তাঁদের অভিজ্ঞতার একটা বিবরণী এইভাবে ধরা আছে প্রতিভা বসুর কলমে — "... (জ্যোতির্মালা) এক সন্ধ্যায় হন্তদন্ত হয়ে এসে উপস্থিত। চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত, পোশাক অবিন্যস্ত, চুলে মনে হয় তিনদিনের মধ্যেও চিরুনি ছোঁয়ান নি। চেহারায় এমনিতেই সব সময় একটা অসহায় অসহায় ভাব, হারিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া ভাব। ... সেদিন সেই 'লস্ট' ভাবটাই এত বেশী পরিমাণে উপস্থিত ছিল যে একটু অস্বাভাবিকই লাগছিল। হাতে একগুচ্ছ চটি বই, তাঁর নিজের কবিতার। বললেন, 'পাব্লিশার হিসেবে আমি তোমাদের 'কবিতাভবনের' নাম দিয়েছি, কিন্তু ছাপানোর পয়সা-কড়ি সবই আমার। উৎসর্গ করেছি আমার স্বামীকে।'

'শকুন্তলার স্বপ্ন'-এর দীর্ঘদিন পরে, ১৯৮৬ সালে 'জ্যোতির্মালার কবিতা' এবং ১৯৯৯ সালে 'জ্যোতির্ময়ীর চতুর্দশপদী কবিতা' নামে আরো দুটি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর, দুটি সংকলনেরই সম্পাদনা করেছিলেন নীরদবরণ, দুটি বইয়ের সূচনাতেই ছাপা হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য।

কেমন কবিতা লিখতেন জ্যোতির্মালা? 'বাঞ্ছাপুষ্প' নামে তাঁর একটি সনেট পড়ে দেখা যেতে পারে —

"নিখিলের বাঞ্ছাপুষ্প দিবস সন্ধ্যার
উদয়াস্ততীরে, জ্বলেছিল অনির্বাণ

অগ্নিশিখা প্রায়; কোন্ আলোক-গন্ধার
জ্যোতির্ময় সৃষ্টিজালে সমর্পিয়া প্রাণ
সে এলো সুরভিস্নাত স্বর্গশ্বাস-সম
মোহান্ধ ধরণীবক্ষে উজ্জ্বল বিন্যাসে
ঝরাইয়া নন্দনের শান্তি-স্নিগ্ধ কম,
মূর্তি লভি অমূর্তের অপূর্ব উদ্ভাসে।

এঁকে গেল স্বপ্নরেখা অনন্ত তিমিরে;
তারে অনুসরি' শুভ্রস্রোত বলাকার
অফুরন্ত আনন্দের নিস্তব্ধ গভীরে
প্রবেশিল চিহ্ন রাখি সুদূর যাত্রার।
মুক্ত হল দীপ্ত পন্থা: সূর্য শশী তারা
ঢালি দিল অগম্যের দিব্য রশ্মিধারা।"

১৯২৬ সালে লেখা হয়েছিল জ্যোতির্মালার এ কবিতাটি। জ্যোতির্মালা তখন পণ্ডিচেরী আশ্রমে, তাঁর কবিতা নিয়ে সেখানে নিয়মিত আলোচনা করতেন শ্রীঅরবিন্দ ও নীরদবরণ; এ কবিতার 'বাঞ্ছাপুষ্প' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনে হয়েছিল — "বিশ্ব-কামনার বহ্নি-পুষ্প হতে পারে। সে আত্মসমর্পণ করেছে দিব্য সৃষ্টিকারী আলোর কাছে এবং অমূর্তকে মুর্ত করেছে।" 'বলাকার' 'শুভ্রস্রোত'কে তাঁর মনে হয়েছিল — 'আত্মার প্রতীক'। 'প্রকাশ-মরাল' নামে জ্যোতির্মালার আর একটি কবিতার আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছিলেন — "সে যেন ব্লেইক থেকে মালার্মের দিকে যাচ্ছে, যদিও এখনো সেখানে পৌঁছায় নি।"

জ্যোতির্মালার কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, কঠিন গম্ভীর অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা জ্যোতির্মালার কবিতার এক বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। সেজন্যই হয়তো সাধারণ কবিতা-পাঠকের জগতে তত সহজে প্রবেশ করতে পারে নি জ্যোতির্মালার কবিতা। তবু, কৃষ্ণিমা-লাঞ্ছন, উষসী-ম্লানিমা, সান্দ্রস্বপ্নসম, অঞ্জলি-উন্মন, উৎফুল্ল-সাগরোচ্ছল-কল্লোল-ঝঙ্কৃত, মানস-অম্বরতল এইরকম কিছু কিছু শব্দ চয়নের মাধুর্যে আজও চমৎকৃত করতে পারে তার পাঠককে।

ভারতবর্ষের সীমানার বাইরেই কেটেছিল জ্যোতির্মালার শিক্ষাজীবনের

অনেকটা সময়-কখনো রেঙ্গুনে, কখনো বা ইউরোপে। বিদেশবাসের এইসব অভিজ্ঞতা স্বভাবতই ছায়া ফেলেছিল তাঁর পরবর্তীকালের লেখালেখির জগতে, বিশেষত ছাপ রেখে গিয়েছিল তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পগুলিতে। জ্যোতির্মালার কথাসাহিত্য-জগতে অভিজ্ঞতার এই বিপুল ব্যাপ্ত বিস্তারই তাঁর সমকালীন যে-কোনো লেখকের তুলনায় অনেকখানি স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করে দেয় তাঁকে। যে যুগে 'বিলেত ফেরত' কথাটা সত্যিই একটা চেয়ে-দেখার মতো শব্দই ছিল, আর বড়লোকের ছেলে বা তাঁদের উচ্চাভিলাষী জামাই ছাড়া আর কেউ যে-পথে যেতও না বিশেষ, সে যুগে কোনো মহিলার কলমে বিলেতি অভিজ্ঞতার গল্প-উপন্যাস তাঁর পাঠকসমাজকে চমকে দেওয়ার মতো একটা ঘটনাই ছিল নিশ্চয়।

'বিলেত দেশটা মাটির' বইটির পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে তাঁর এমনই সব অভিজ্ঞতার ছবি-সভ্যতাগর্বী ইংরেজ পরিবারের নীল রক্তের ঠুনকো আভিজাত্য, তাদের অন্তঃসারশূন্য ভণ্ডামি আর নিপুণ প্রবঞ্চণারই ছবি সে-সব, আর সেই সব ছবিই রূপ নিয়েছে একটি দেশী মেয়ের চোখের আলোয়; 'বিলেত দেশটা মাটির' বইয়ের 'বিদেশী' পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে ধরা আছে তারই নানা কুশলী বিবরণী। মনে পড়ে এই বইয়ের ভূমিকায় দিলীপকুমার রায়ও লিখেছিলেন — "…ওদের দেশের বাইরের চাল-চলনের ছবির মধ্যে দিয়ে তিনি ফুটিয়েছেন কোথায় ওরা অসার, কোথায় ওদের ভড়ং, জীবনে কোন বস্তু গভীর কোন বস্তু সস্তা।" জ্যোতির্মালার এই ভঙ্গিকেই তিনি বলতে চেয়েছিলেন 'অন্তর্মুখী ভঙ্গি'।

গল্পসংকলনের 'দেশী' অংশটিতে সত্যিই স্বদেশেরই চিরকালীন ছবি এঁকেছিলেন জ্যোতির্মালা, 'পরিচয়' নামে প্রথম গল্পটি শুরুই হয়েছে এইভাবে — "মেয়ে হয়েছে বলে বাড়ির সবাই অসন্তুষ্ট — প্রসূতির অন্যায় নয়?

প্রথমটি মেয়ে, তারপর দুটি ছেলে, তারপর এই সদ্যোজাত শিশু — পর পর দুই ছেলের পরে এই মেয়ে। নীরজা ভাবে, তবু কেন লোকের কথা শুনতে হয়? বিধাতার নিজের কাছে যদি পুত্রকন্যার সমান দর, তবে বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েরই কপালে মানুষের কাছে তার এত অনাদর কেন? অন্তত, জন্মমুহূর্তেও কি কেউ সত্যিকার আনন্দ নিয়ে শিশুকে বরণ করতে পারে না? 'মেয়ে হয়েছে' — বাড়িশুদ্ধ সবাইকার মুখভার। প্রত্যেকের যেন কি একটা আশাভঙ্গ হল।" কতদিন আগে এ কথাগুলি লিখেছেন জ্যোতির্মালা? বাংলার অনেক ঘরেই কি আজও সেই ট্রাডিশনই সমানে চলছে না?

জ্যোতির্মালার গল্পগুলি পড়তে পড়তে অনুভব করি কী গভীর সংবেদন ধরা

আছে তাদের পংক্তিমালায়; তাঁর একটি অগ্রন্থিত গল্প 'রাজভিখারী', এ গল্পের নায়িকা পর্ণাকে ব্যাকুল আবেগে বলতে শুনি — "এমনি করে মাকে খুঁজতে শিখলাম, হাঁটু গেড়ে মেঝেয় মাটির উপর বসে পর্ণা বলল, ভূমি স্পর্শ করো। এই দেখো-মা। অনুভব করেছি এই মা-ই জন্ম নিলেন আমার মানবী মায়ের রূপে। আমি জন্ম নিলাম তাঁর থেকে। মাটি থেকে ফল, ফল থেকে আবার মাটি। মাটিতেই আমরা দেবীর প্রতিমা গড়ি। কিন্তু বিশেষ করে দুর্গা কেন? দুর্গা কী? এই যে মাটি — এর কি কোনো অনন্ত সত্য আছে, সুব্রত? যদি থাকে, দুর্গা তিনিই, দুর্গা সেই মায়ের চিন্ময় রূপ যিনি পায়ের নিচে মৃত্তিকা, চোখের সামনে সাগর তটিনী, পার্শ্বে ভূধর, মাথার উপরে অনন্ত আকাশ। আমার হৃদয়ে তিনিই মা, তিনিই মা —"

গল্পসংকলনের গল্পগুলি পার হয়ে জ্যোতির্মালার কলমের ঝরনা নদী হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাস দু'টিতে পৌঁছে। উপন্যাস লিখতে বসেও মেয়েদের লেখা উপন্যাসের ভৌগোলিক সীমানা অনেকদূরই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন জ্যোতির্মালা। আজকের ভারতবর্ষের সীমানার বাইরেই তাঁর দুটি উপন্যাসেরই পটভূমি — প্রথম উপন্যাসের অনেকখানি জুড়ে আছে বিলেতের মাটি আর দ্বিতীয়টির প্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন বর্মাকে। পটভূমির এই বৈচিত্র্যও নতুন এক স্বাদ এনেছিল তাঁর উপন্যাসে আর ছোটগল্পগুলিতে।

প্রেমের অন্তহীন তৃষ্ণা আর তৃষ্ণার অনির্বাণ দাহে নিজে সারাজীবন দগ্ধ হয়েছেন জ্যোতির্মালা, ভালোবাসার খেলায় কোনোদিন সুখ মেলে নি তাঁর। তবু প্রেমের সেই অপরূপ বর্ণবিভাতেই ভরিয়ে দিয়েছেন জ্যোতির্মালা তাঁর উপন্যাসের জগৎটিকেও।

ভালোবাসার অনিঃশেষ আকাঙ্ক্ষার, অফুরান দহনের এক কাব্যময় কাহিনী জ্যোতির্মালার উপন্যাস 'রক্তগোলাপ'। অমল, সুরেখা, প্রমিতা, মঞ্জিমা বা সুব্রত — যে-নামের আধারেই আঁকা হোক জ্যোতির্মালার এ উপন্যাসের দহনজ্বালার ছবি, এ উপন্যাস পড়তে বসে আজকের পাঠকের মনে হবেই, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র অমিত-লাবণ্য-শোভনলাল আর কেটি মিটাররাই যেন ধরা দিয়েছে নতুন রূপে, নতুন আভরণে। অমিতভাষণে, ভালোবাসার দ্বন্দ্বময়তায় সমানধর্মা অমিত রায় আর এ উপন্যাসের নায়ক অমল, প্রভেদ নেই নায়িকা মঞ্জিমার একনিষ্ঠ প্রেমিক সুব্রত আর লাবণ্যর নীরব প্রেমিক শোভনলালের স্বভাবে; উপন্যাসের পরিসমাপ্তিও রচনা করে নি ভিন্ন কোনো ছবি-সুব্রতর শান্ত সহিষ্ণু প্রেমই পেয়েছে মঞ্জিমার বরণমালা, অমলের জন্য অপেক্ষায় রয়ে গেছে

তার ভালোবাসার রক্তগোলাপ।

জ্যোতির্মালার কবিস্বভাবের ছায়াও পড়েছে ‘রক্তগোলাপ’ উপন্যাসের পাতায়, মঞ্জিমা আর অমলের একান্ত সংলাপের নিবিড়তা ভালোবাসার আহ্বানে ভরে উঠেছে কবিতারই ছন্দে; অমলের আবাহন —

"হে ধ্রুবা, তোমার অচপল ওই
গোধূলি-নভের পাখি
জানো কি আমার মনের আকাশে
চকিত আলোর অপরূপ রাসে
ছন্দ-দোলার সকরুণ ভাষে
চলেছে কাহারে ডাকি?"

— এ কবিতার উত্তরে ছন্দমুখর হয়ে উঠেছিল মঞ্জিমার কলমও।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল জ্যোতির্মালার উপন্যাস ‘সন্ধানে’। ‘রক্তগোলাপ’-এর মতো এ উপন্যাস জুড়েও আছে গভীর-বিধুর দ্বন্দ্বমথিত প্রেমের কাহিনী, তারই সঙ্গে এ উপন্যাসে ধরা আছে সমকালীন সমাজ, স্বদেশ, পৃথিবী ও মানুষ বিষয়ে স্রষ্টার গভীর ভাবনার পরিচয়, আছে ভারত আর ইংল্যাণ্ড — দু'দেশের সমাজেরই সঙ্কীর্ণতা আর উদারতার পরিচয়, আছে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের স্বদেশব্রতের সংকল্প আর বিশ্বমানবতাবোধের গভীরতার চিত্র।

তবু, এসবেরই গভীরে বয়ে চলেছে নিঃশব্দসঞ্চারী প্রেমের প্রবাহ। ‘রক্তগোলাপ’ উপন্যাসে মঞ্জিমার জীবনে যেমন প্রেমের ছোঁয়ায় বৈপরীত্য নিয়ে এসেছিল তার দুই প্রেমিক, তেমনিই অপ্রমিত রোমাণ্টিক আবেগের বৈভব আর শান্ত সংযত শ্রদ্ধাজড়িত ভালোবাসায় ঘেরা দুই পুরুষের মাঝে আকাঙ্ক্ষার দোলাচলে আন্দোলিত হয়েছে জ্যোতির্মালার ‘সন্ধানে’ উপন্যাসের নায়িকা সুপ্রিয়াও।

তবে শুধু সুপ্রিয়াই নয়, প্রায় চারশো পাতার সুবিশাল এই উপন্যাসে যতগুলি চরিত্র ভালোবেসে সুখ খুঁজেছে, মিলনের আকুতি নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে, তাদের কারো স্বপ্নই শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় নি পরিপূর্ণতার আনন্দসমাপনে, সব স্বপ্ন হারিয়ে গেছে আত্মহননে, আত্মক্ষয়ে, কিংবা নিঃসহায় একাকিত্বে; কিন্তু সংবেদী পাঠক অনুভব করতে পারেন তার মধ্যে দিয়েই পূর্ণতায় পৌঁছেছে পাঠকের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ভাণ্ডার, প্রেমের অনুভূতির অতলান্ত গভীরতা আর উৎসুক প্রেমের ব্যাকুল পিপাসার স্বাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে তারা।

জ্যোতির্মালা দেবীকে আজ হয়তো একেবারেই ভুলে গেছি আমরা। তবে কোনো যুগে কোনো মূল্যায়নই কখনো হয় নি তাঁর — ভুল হবে এমন কথা বললেও; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন জ্যোতির্মালার 'রাশিয়ান ক্যাট' গল্পটির, লিখেছিলেন — ও গল্পের বেদনা অল্প দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করবার নয়, উৎসাহিতও করেছিলেন তিনি নবীনা লেখিকাকে, অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে অল্পে সন্তুষ্ট না হতে, এমনকী, 'সে অল্পটুকু ভালো হলেও'।

'রাশিয়ান ক্যাট' গল্পটি বিষয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও, লিখেছিলেন — "যাঁর হাত দিয়ে এমন সুচারু আল্‌পনা বেরোয়, বিশেষ করে, যিনি 'রাশিয়ান ক্যাট'-এর মতন সুশ্রী গল্প লিখতে পারেন তাঁর শিল্প-প্রতিভা সম্বন্ধে আমি অন্তত নিঃসন্দেহ।"

অকুণ্ঠ প্রশস্তি করেছিলেন তাঁর সমকালীন আর এক কথাসাহিত্যিক প্রতিভা বসুও, লিখেছিলেন — " এই লেখিকার বইয়ের সংখ্যা সামান্য, কিন্তু ইনি নিজেও সামান্য ছিলেন না, এঁর বইও অসামান্য হিসেবেই অসামান্য ব্যক্তিদের কাছে সমাদৃত ছিলো। এতো সুললিত সুন্দর সুসম্বন্ধ গদ্য এঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে, যা তার হার্দ্য গুণে, মনস্তত্ত্বে, ঠাট্টায়, গল্প বলার মনোমুগ্ধকর ঢঙে — সবেতেই পয়লা নম্বর।"

জ্যোতির্মালার কবিতার মননের দীপ্তি ঘিরে নিয়ত ঔৎসুক্য ছিল শ্রীঅরবিন্দেরও।

প্রথম প্রকাশিত 'বিলেত দেশটা মাটির' গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন দিলীপকুমার রায় আর ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভূমিকায় জ্যোতির্মালার পরিচিতি প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় জানিয়েছিলেন 'লেখিকার সত্যসন্ধানী মনের, সুকুমার চিত্তের, ঋজু দৃষ্টির ও নারীসুলভ দরদের পরিচয়' তাঁকে কতখানি মুগ্ধ করেছে, জ্যোতির্মালার লেখার অন্তঃশীলা অন্তর্মুখীনতার দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের কথাও পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর, জ্যোতির্মালার লেখায় ধূর্জটিপ্রসাদ খুঁজে পেয়েছিলেন 'রমণীসুলভ কমনীয়তা, সহৃদয়তা ও পর্যবেক্ষণশীলতা'।

এই শতকে 'বিলেত দেশটা মাটির' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণেব সময় তার মুখবন্ধ লিখতে বসে জ্যোতির্মালার নিজেরই কয়েকটি কথা পাঠককে মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি মালিনী ভট্টাচার্য; কথাগুলি নিজেরই গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন জ্যোতির্মালা, লিখেছিলেন — "ওগুলো লিখে আমি কোনোদিনই

যথার্থ বা গভীর তৃপ্তি পাই নি, তাদের প্রতি দরদও তাই যৎসামান্য'', স্রষ্টার এ কথাটিকে ভিত্তি করে ভূমিকাকারেরও মনে হয়েছে — ''যা লিখেছেন এবং যা লিখতে চেয়েছেন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং তার শিল্পায়ন — এই দুয়ের মধ্যে অনপনেয় যে ফারাক একজন খাঁটি শিল্পীকে জর্জরিত করে, জ্যোতির্মালা হয়তো এখানে তারই কথা বলেছিলেন।''

জ্যোতির্মালা দেবীকে চিনে নেওয়ার একটু সুযোগ, সামান্য আয়োজনের সন্ধান হয়তো আগ্রহী অন্বেষকের মিলতে পারে আজ! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্মুদ্রণটি ছাড়াও, ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'জ্যোতির্মালা দেবী ঃ জীবন ও সাহিত্য' নামে সুস্নিগ্ধা বড়ুয়ার একটি মিতায়তন গ্রন্থ, 'Jyotirmala : A New Trend in Bengali Poetry' নামে প্রকাশ পেয়েছে অধ্যাপক গৌতম ঘোষাল রচিত জ্যোতির্মালার কবিতা-বিষয়ক একটি আলোচনা-পুস্তিকা, 'জ্যোতির্ময়ী জ্যোতির্মালা' নামে জ্যোতির্মালা দেবী জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিককালেই।

৫.

একজন হারিয়ে-যাওয়া লেখিকার জন্মশতবর্ষে তাঁকে স্মরণ করতে বসে পরবর্তী প্রজন্মের এক পাঠিকা হিসেবে আমার আজ মনে হয় — নারীজীবনের এক করুণ-রঙিন পথের গহন গভীর সঞ্চরণ দেখি যেন তাঁর জীবনজোড়া লেখালেখির মধ্যে। কখনো মনে হয় কত যুগ আগের সেই বৈষ্ণব কবির গান হতে পারত জ্যোতির্মালারও উচ্চারণ, তিনিও বলে উঠতে পারতেন — 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু / অনলে পুড়িয়া গেল / অমিয়াসাগরে সিনান করিতে / সকলি গরল ভেল।' একটুখানি সুখের আশায় যতবারই ঘর বাঁধতে চাইলেন জ্যোতির্মালা, ডুব দিতে চাইলেন ভালোবাসার অমৃতসাগরে, প্রত্যেকবারই অমৃতমন্থন করে বিষের পাত্রই ধরা দিল তাঁর উন্মুখ অঞ্জলিতে, জীবন শুধু প্রবঞ্চণাই করল তাঁর সঙ্গে। হয়তো বা আমাদের আধুনিক কবির উচ্চারণেও নিজের কণ্ঠস্বর মিশিয়ে দিতে পারতেন জ্যোতির্মালা, বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে হয়তো বলতে পারতেন — 'কে জানে গরল কি না প্রকৃত পানীয়, অমৃতই বিষ।' ভালোবাসার অমৃত পান করতে চেয়ে বারে বারেই তো এমন গরলই পান করতে হয়েছে তাঁকে — জীবনভর।

কিন্তু তবু, ভালোবাসার ওপর তো কখনো বিশ্বাস হারান নি জ্যোতির্মালা, জীবনে প্রথম বিচ্ছেদের আঘাতে ভেঙে পড়তে পড়তেও একদিন যিনি হাত

থেকে খুলে নেন নি একজোড়া শাঁখা — একদিন সে ভালোবেসে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল, সেকথা ভুলতে পারেন নি বলেই পারেন নি খুলে রাখতে; সেই মানুষটি আঘাতে-অপমানে-অবিচারে-অনাদরে অসময়েই হারিয়েছেন তাঁর স্মৃতি-স্বাস্থ্য-সৃজনশীলতা-সংবেদনময়তা, তবু ভুলে গেছেন কি তিনি জীবনকে, এমনকী, মানুষকেও, ভালোবাসতে? তাই, বোধহয় জ্ঞানদাস বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় নন, হয়তো রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলিতেই জ্যোতির্মালার উচ্চারণের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছতে পারি আমরা, তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারি আমাদেরও কথা—

" ...পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে — সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি — সবচেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।"

রোকেয়ার স্বপ্ন ও আজকের ভারতবর্ষ

মীরাতুন নাহার

ভারতবর্ষ নামক দেশটিতে আজ যথার্থ দেশ প্রেমিকের দেখা মেলে না। এদেশের সন্তানরা দেশের জল, বায়ু, আলো, মাটিতে প্রাণধারণ করে অধিকতর ভোগ-সমৃদ্ধি কামনায় ভিন্ন দেশে পাড়ি দেয়। 'এ দেশে থেকে কি লাভ?' — এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে পালায়। দুঃখভোগের অনিবার্যতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে বিদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে জীবন কাটানোর লজ্জা তারা বেমালুম ভুলে যায়। ভুলে যায় স্বদেশ এবং পরিজনদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ। এ সত্য নিতান্তই বাস্তব হয়েছে দেশের বর্তমান প্রতিভাবান সন্তানদের জীবননীতিতে। আজ তাই এ দেশের কৃতি সন্তানদের অভিভাবকদের নিঃসঙ্গতা এবং অসহায়তা পৃথকভাবে গবেষণার বিষয়। দেশ জননীরও কাঙালিনী দশা দুঃসহ বলা চলে।

বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার অখ্যাত পায়রাবন্দ গ্রামের একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারে জন্মেছিলেন রোকেয়া খাতুন যার বিবাহ পরবর্তী নাম হয়েছিল রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে জন্মেছিলেন এই নারী — ভারতের এক কন্যারত্ন। কলকাতায় তাঁর অমরকীর্তি-স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন এর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। নারীকল্যাণের স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ এই রমণীর দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের কথা অনেকের জানা। জানা নেই তাঁর দেশ-গঠনমূলক ভাবনাচিন্তার কথা। দেশোন্নতির যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং দেশবাসীকে যেভাবে সে চিন্তায় প্রাণিত করতে চেয়েছিলেন তার বহু নিদর্শন মেলে তাঁর রচিত প্রবন্ধ, কবিতা ও উপন্যাসে। তাঁর রচিত কল্পকাহিনী "সুলতানার স্বপ্ন" নামক রচনায় স্বদেশকে ঘিরে তার স্বপ্নের যে প্রকাশ ঘটতে আমরা দেখেছি দেশের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায় তার প্রাসঙ্গিকতাবোধে সেকথাই আজ বলতে চাই।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর "SULTANA'S DREAM" প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রাজের "Indian Ladies Magazine"-এ। সেই কাহিনীর বাংলা অনুবাদ ('সুলতানার স্বপ্ন') করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখিকা স্বয়ং রোকেয়া। ভারতীয় কন্যা সুলতানার স্বপ্ন

চিত্রিত হয়েছে গল্পের বুননে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সুলতানা উপস্থিত হয়েছে এক নারীরাজ্যে। সেই দেশ সম্পূর্ণভাবে নারী-পরিচালিত। সেখানে নারীরা স্বাধীন। পুরুষরা সব 'মর্দানা'তে বন্দীদশা কাটায়। তারা পথে বেরোতে লজ্জা পায়। দেশের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালায় মেয়েরা। ভারতীয় মেয়ে সুলতানা সে দেশের রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে চলতে গিয়ে তাজ্জব। পুরুষদের দেখা যাচ্ছে না কোথাও। অথচ তাদেরই ভয় সে জড়সড়! পথ চলতে দ্বিধাবোধ করছে। সে দেশের একটি মেয়ে তার সঙ্গী হয়েছে। তাদের দেশের রীতিনীতির কথা শোনাচ্ছে সুলতানাকে। পুরুষের ভয়ের কোনও কারণ নেই সেখানে। তাদের সুকৌশলে গৃহবন্দী করা সম্ভব হয়েছে। করেছে মেয়েরাই। বুদ্ধিবলে। সে কাহিনী কৌতুকপ্রদ। শুনে সুলতানা হতবাক। মেয়েরা সেদেশে নিরাপদে নিশ্চিন্তে বুদ্ধি দ্বারা দেশ চালায়। নারী-পুরুষ বৈষম্যের ফলে যে অত্যাচার অনাচার অবিচারের শিকার ভারতীয় মেয়েরা হয় তার কোনও চিহ্নমাত্র সেদেশে নেই। কেননা, যারা সেসব করে তারাই তো সেখানে ক্ষমতাহারা।

তাকিয়ে দেখুন, দেশের বর্তমান দুর্দশার দিকে। ভারতবর্ষের মেয়েদের ঘরে বাইরে নিরপত্তা নষ্ট হওয়ার ঘটনা আজ নিত্য হয়ে উঠেছে। কাদের হাতে? পুরুষদের। সে কারণে বহুদিনের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েও ভারতীয় মেয়েরা আজ সংকটাপন্ন। সত্যি দেশ এগিয়েছে কি? এমন ভাবনা উঁকি দিচ্ছে মানুষের মনে। সুলতানাকে বলেছিলেন নারীরাজ্যের মেয়ে — আশ্চর্য! তোমাদের দেশে যারা অত্যাচার করে তারা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায় আর বন্দী হয়ে থাকে নিরীহ মেয়েরা। এ কেমন অদ্ভুত নিয়ম? সুলতানা অভ্যস্ত তার দেশের নিয়মকে স্বাভাবিক বলে মনে নিতে। সে অবাক হয় সেই মেয়ের বিস্ময় দেখে। দেশটির নাম "নারীস্থান।" সেখানে 'স্বয়ং পূণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন'।

কী সুন্দর সেই দেশ। সুলতানা মুগ্ধ। তার প্রশংসা শুনে সঙ্গীকন্যা বলে ওঠে 'ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে পারেন।' ফুলের বাগানের মতো সুন্দর নারীস্থানের কন্যার এই মন্তব্য পড়ে বোঝা যায় লেখিকার স্বপ্নসাধের কথা। আজ যারা কলকাতাকে স্বপ্ন সুন্দরী নগরী বলে কল্পনা করে তাদের সঙ্গে কত তফাৎ তাঁর স্বপ্নের। তিনি ভাবালুতাবশে স্বপ্ন দেখেননি। তিনি নগরের বাস্তব উন্নয়নের কথাই ভেবেছিলেন! তিনি স্পষ্ট ভাষায় কটাক্ষ করেছিলেন বাকসর্বস্ব অলসমতি ভারতবাসীর চরিত্রেব প্রতি। এই ভারতবাসী পুরুষশ্রেণীভুক্ত জীব। সঙ্গীর কাছে সুলতানা শুনলো প্রথম এবং অবাকই হলো শুনে যে, পুরুষেরা বাইরে থাকলে

মেয়েদের বিপদ বলে তাদেরই বন্দী থাকা ভালো। মেয়েদের বন্দী করে নিরাপত্তা দেওয়া উল্টো এবং উদ্ভট নিয়ম। একথা ভারতবাসী বুঝলো না। আজও তারা বহির্জগতে মেয়েদের অধিকার মেনে নিতে অকুণ্ঠ নয়।

অথচ, রোকেয়া সেকালে বসে ভাবতে পারলেন এমন কথা! তিনি পেরেছিলেন, কেননা তিনি দেশকে ভালোবেসেছিলেন। দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। কোন পথে তা সম্ভব তাও ভেবেছিলেন। পুরুষ-নারী বৈষম্যজনিত অবিচার দূর না হলে নারীশক্তির অপচয়ে দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে — দেশবাসীকে একথা তিনি সোচ্চারে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

যে শক্তিবলে পুরুষ আধিপত্য করে ভারতবর্ষে তা নির্ণয়ে তিনি ভুল করেননি এতটুকু। দৈহিক শক্তির আধিক্য নিয়ে পুরুষের প্রবল প্রতাপ। তিনি দেখালেন, বিজ্ঞানবলে সে পুরুষতাকে অগ্রাহ্য করা যায়। বুদ্ধি-কৌশলে বিবিধ যন্ত্র নির্মাণ করে পুরুষের কাজকর্ম অনায়াসে মেয়েরা সম্পন্ন করতে পারে। কি প্রবল আত্মবিশ্বাসে তিনি সুলতানার প্রশ্নের উত্তরে সারা (সুলতানার স্বপ্নসঙ্গী)কে দিয়ে বলিয়েছেন — জজ ম্যাজিস্ট্রেট-এর প্রয়োজন হয় না তাদের দেশে কারণ যারা অপরাধ করে তারাই তো বন্দী — তারা পুরুষরা! কৃষির জন্য মাঠের কাজ বা দেহশক্তি লাগে এমন কাজ তাদের মেয়েরা যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করে, বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগিয়ে করে। পুরুষের দৈহিক শক্তির অহঙ্কারকে তীব্র তাচ্ছিল্য করে সে বলে — দৈহিক শক্তিই যদি সব, বাঘ ভালুকদের 'তাহলে আরও বেশি প্রাধান্য থাকা জরুরি। কই তাতো নয়?

নারীস্থানের মেয়েরা সৌরতাপে রান্না করে। তারা সময় বাঁচাতে পারে তাতে। তারা ঘরের কাজে তাই স্বল্প সময় দিয়ে বহির্জগতের কাজ সম্পন্ন করে। তাদের দেশে সর্বত্র শান্তি বিরাজিত। হিংসা-বিদ্বেষ দ্বারা কোনও সুফল মেলে না। সে পথে তারা তাই পা বাড়ায় না। শিক্ষার পথ যথার্থ পথ। তাই শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাঁদের সজাগ দৃষ্টি। দেশের মেয়েরা যাতে যথার্থ শিক্ষা পায় সেদিকে যত্নবান হয়ে তাঁরা দেশকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। বহুকাল ধরে অবহেলিত মেয়েরা দেশ উন্নয়নে ব্রতী হয়ে আজ সফল হয়েছে। রোকেয়া এ গল্পে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, নারীশক্তি অবদমিত থাকার জন্য ভারতবর্ষের যাবতীয় হীনদশা। রোকেয়ার স্বপ্নই ছিল নারীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশ গঠন করা।

ভারতবাসী বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়ায়। কর্মে অলস। ঝগড়া-কলহ করে দিন কাটায়। দেশনেতারা হিংসা-বিভেদ জাগিয়ে মানুষের মনকে কলুষিত করে

দেশের মানুষের জীবনে শান্তি শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটায়। দেশের মানুষ হীন স্বার্থান্বেষী হয়ে ওঠে। ফলে দেশে অন্নাভাবে মানুষ কষ্ট পায়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দেয়। শিশুমৃত্যুর হার বাড়ে। এসব কথা তিনি সারার মাধ্যমে শুনিয়েছেন পাঠককে।

নারীস্থানে এসব নেই। এই দেশের মানুষ প্রেম ও সত্যকে ধর্ম বলে মানেন। সত্যকে আঁকড়ে জীবনধারণ করেন। প্রাণনাশ করেন না কারও। তাদের নৈতিক জীবন উন্নত। তারা যুদ্ধ করতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। রত্নখণ্ডের জন্যও যুদ্ধে তাদের অনীহা। তারা জ্ঞান-রত্ন আহরণে সদা উৎসুক। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে তারা উৎসাহী। আর কোনও সম্পদে তাদের লোভ নেই।। 'যে সব দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হয়ে পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে, দেশের কোনও কাজে করেনা।...' সেসব দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তাদের কোনও আগ্রহ নেই। তাদের দেশে ম্যালেরিয়া, প্লেগ ইত্যাদি ব্যাধির প্রকোপ নেই। ধনধান্যপূর্ণ তাদের দেশ এবং প্রধান কথা হলো, স্থিরবুদ্ধি নারী দ্বারা পরিচালিত হয়েই সে দেশ এমন সার্থক হয়েছে। দেশগঠনের কাজে নারীর ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ — তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কাহিনীর মাধ্যমে।

রোকেয়ার স্বপ্ন সুপরিস্ফুট তার কল্পকাহিনীতে। তার স্বকালে বিদেশী শাসক কবলিত পুরুষশাসিত স্বদেশের দুর্দশামোচন ভাবনা তাঁকে ভাবিয়েছে। তারই ফসল, "সুলতানার স্বপ্ন" যা আসলে এই মহান ভারত-কন্যার নিজেরই সারাজীবনের স্বপ্ন। তাঁর সমস্ত রচনায় এই স্বপ্নের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। আমৃত্যু গঠনমুলক স্বপ্নের বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতাতেই। দুঃখের বিষয় তাঁর স্বপ্ন আজও স্বপ্নই রয়ে গেল! বাইরে যত এগিয়ে চলেছে ভারতবর্ষ নামের বহু ধর্ম-বর্ণ-ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের এই দেশ ততই পিছিয়ে পড়ছে ভিতরে। আজ রোকেয়ার মতো গঠনমূলক ভাবনাচিন্তাকে রূপায়িত করার মানুষের বড় অভাব এদেশে।

আমার বয়স যখন মাত্র বছর দশেক তখন শামসুন নাহার, এম. এ. প্রণীত 'রোকেয়া জীবনী' পড়ে এই শিক্ষাপ্রাণা আদর্শব্রতী ভারতবাসী 'মানুষ'টির মহৎ ভাবনা ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলাম। ১৯৮৯ সাল থেকে 'সুরাহা-সম্প্রীতি'র মাধ্যমে তাঁর চিন্তা-চেতনা-কর্মাদর্শ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার কাজে ব্রতী হয়েছি। সে কাজে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন অনন্যব্যক্তিত্ব গৌরী আইয়ুব। আজ তিনি পাশে নেই। পেয়েছি কতিপয় কল্যাণমূলক কর্মসম্পাদনে আগ্রহী সাথী মানুষ। রোকেয়া আমাদের আলোর

পথযাত্রার দিশারী। সে আলোর বারতা আমরা শোনাতে চাই দেশের মানুষকে, বিশেষতঃ তরুণ প্রজন্মকে। সে আলো ছড়িয়ে পড়ুক তাদের প্রাণে-চেতনায়। তারা দেশকে ভালবাসুক রোকেয়ার মতো। দেশ পতনগামিতা থেকে রক্ষা পাক্ — সেই আমাদের স্বপ্ন। আমাদের আশা।

আর আল্-হিলাল মিশনের শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির নিবিড় পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সবুজ প্রাণে রোকেয়ার স্বপ্ন সাড়া জাগিয়ে তুলবে এবং তারা দেশ-গঠনের কাজে উদ্বুদ্ধ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে স্কুলের পাঠগ্রহণের সাথে সাথে বৃহত্তর জীবনের পাঠ নিতে শিখবে — এই আশা নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। রোকেয়ার আশিস ঝরে পড়ুক তাঁদের নবীন জীবনে। তারা যথার্থ দেশপ্রেমিক হয়ে উঠুক এই কামনা জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।